সেবা সিরিজ

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী

দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

বিবেকানন্দ

মনোমোহন লাইব্রেরী
১৯৮ ও ২০৩-২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
অগ্রহায়ণ ১৩৩২

মূল্য ১৷০ পাঁচ সিকা।

Published by
Sudhangsu Kumar Bhanja Chowdhury
The Manomohan Library,
Calcutta.

Printed by S. B. Bhattacharjee.
at the Model Litho & Printing Works.
93, Baitakhana Road, Calcutta.

উৎসর্গ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের যিনি অন্তরঙ্গ ও ত্যাগী শিষ্য ছিলেন,
যিনি উজ্জ্বল ও উচ্চ-আদর্শ জীবনে প্রতিফলিত করিবার
জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন, যাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি,
বিশাল হৃদয় ও ভালবাসায় সকলেই আকৃষ্ট
ও মোহিত হইয়াছিলেন, যিনি বর্ত্তমান
লেখকের পরম সুহৃৎ অভিভাবকের
ন্যায় ছিলেন, সেই মহাত্মা

যোগানন্দ স্বামীর

পবিত্র স্মৃতিকল্পে
এই গ্রন্থখানি
উৎসর্গীকৃত
হইল।

সেবা সিরিজের পুস্তকাবলী।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত ঃ—

Dissertation on Painting	3	4	0
Reflections on Woman	1	4	0
শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী			
(১ম খণ্ড)	1	4	0
ঐ ,, (২য় খণ্ড)	1	4	0
ঐ ,, (৩য় খণ্ড) (যন্ত্রস্থ)	1	4	0
৺কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ	0	12	0
লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ (১খণ্ড যন্ত্রস্থ)	1	4	0
স্বামিজীর স্বদেশ মন্ত্র	0	4	0

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ক্রমশঃ বাহির হইবে ঃ—

Works of Mohendranath Datta :—

System of Education. Energy.
Mentation. Triangle of Love. Devotion. Ego.
Mind. Ethics. Logic of Possibilities.
Natural Religion. Action.
Thoughts on Religion.
Metaphysics.
Dissertation On Poetry.
Principles of Sacred Architecture.
Nala and Damayanti (Epic). Kurukshetra (Epic) &c.

Works of Dr. Bhupendra Nath Datta M. A. Ph. D.

আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা (যন্ত্রস্থ), নৃ-তত্ত্বে জাতি নির্ণয়, জগতে পতিত শ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস, বঙ্গসাহিত্যে সমাজ-তত্ত্বীয় অনুসন্ধান ইত্যাদি।

পরিচয়

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলীর দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বহস্তে গঠিত সাধকের জীবন ও সাধনমার্গে উত্তরোত্তর মন কিরূপ পরিবর্দ্ধিত হয় তাহারই কিঞ্চিৎমাত্র আভাষ এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আদর্শ করিয়া তাঁহার আশ্রিত সাধক-মণ্ডলী কিরূপ কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং পরস্পরের প্রতি কিরূপ অকপট ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল তাহাই দেখান এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। বাদানুবাদ, মতামতি বা ঘটনার তারতম্যে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। সাধকই সাধকের জীবন উপলব্ধি করিতে পারেন। বিপরীত ভাবের ভিতর একভাব, অনন্তস্রোত আবাহমানকাল হইতে চলিতেছে। আদিকালের সাধক ও বর্ত্তমান কালের সাধক একই, কোনরূপ তারতম্য হয় না। সাধক জীবনী হইতেছে ধারাবাহি তপস্যাসূত্রের ভিন্ন ভিন্ন রুদ্রাক্ষগুলিকা। এই গ্রন্থ পাঠে যদি কোন সাধক বা গৃহীর কোন উপকার হয় তাহা হইলে এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য ও শ্রম সার্থক হইল মনে করিব। ইতি ঃ—

কলিকাতা,
১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৩২।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সূচিপত্র

আলমবাজার মঠ ঃ—

শুদ্ধিপত্র

পৃঃ	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৩	৬	বর্ষানায়	বৃন্দাবনে
৮৪		যোগানন্দ স্বারমী গ্রণীহ রোগ	যোগানন্দ স্বামীর গ্রহণী রোগ
১২০		নিরঞ্জন মহারাজ ও সত্যচরণ মিত্র	স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও সত্যচরণ
১২১		স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও সত্যচরণ মিত্র	স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও সত্যচরণ
১৪৪	১১	নারায়ণ তীর্থ	বদ্রীনারায়ণ তীর্থ



স্বামী যোগানন্দ।

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী

আলমবাজার মঠ

বরাহনগর মঠের পর আলমবাজারের মঠ হয়। বরাহনগর মঠের শেষ ভাগে অর্থাৎ ১৮৯১ সালে কালীকৃষ্ণ মহারাজ বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং পরে শরৎ মহারাজের সহিত শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করিবার জন্য উভয়ে জয়রামবাটীতে যাত্রা করিয়াছিলেন। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে উভয়ে আলমবাজারের মঠে আসিলেন এবং যে ঘরটী ঠাকুর-ঘর বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সেই ঘরটীতে শুইয়া রহিলেন। আলমবাজারের মঠে প্রথম দুই বা তিন সপ্তাহ শশী মহারাজের ঘর বলিয়া যাহা পরে পরিচিত হইয়াছিল, তথায় ঠাকুর-ঘর হইয়াছিল। উহার চারিদিকে রেড়ির তেলের কারখানা ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমের ঘরে সর্ব্বদা রেড়ির তেলের গন্ধ আসিত বলিয়া ঐ ঘরটী পরিত্যাগ করিয়া মাঝের ঘরটীতে ঠাকুরের দ্রব্য পরে আনা হইয়াছিল।

স্বামী সারদানন্দ

শরৎ মহারাজ ও কালীকৃষ্ণ মহারাজের খুব ম্যালেরিয়া জ্বর হইয়াছে। ঘরের মেজেতে কম্বল মুড়ি দিয়া হিঃ হিঃ করিয়া দুজনে কাঁপিতেছেন। শীতও একটু একটু আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমান লেখক বেলা ৫টার সময় প্রথম দিন আলমবাজারের মঠে গেলেন। সাত আট দিন হইল বরাহ-নগর হইতে আলমবাজারে মঠ উঠিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান লেখক গিয়া শরৎ মহারাজ ও কালীকৃষ্ণ মহারাজের নিকট বসিলেন। শরৎ মহারাজের জ্বর তখন সবে মাত্র ছাড়িবার উপক্রম হইতেছে। নূতন বাড়ী সবদিক্ জানাশুনাও নাই, অন্ধকার হয়ে এসেছে আলোর কোন বন্দোবস্ত নাই, সবই অনিশ্চিত। হঠাৎ শরৎ মহারাজের মনে কি এক ভাব উঠিল, তিনি কম্বলের উপর উঠিয়া বসিলেন। জ্বরটা সবে ছাড়িবে, কিন্তু শরীর বড় দুর্ব্বল, হাত পা ঠিক রাখিতে পারিতেছেন না, তখনও সমস্ত শরীরটা কাঁপিতেছে। অতি করুণ ও কাতরস্বরে তিনি বলিতে লাগিলেন,—"ভাই তোমায় একটু চা করে খাওয়াব, তুমি চা বড় ভালবাস—তোমায় একটু চা করে খাওয়াব।" বর্ত্তমান লেখক বলিলেন,—"আরে কি কর, জ্বরে কাঁপছো, পা টল্‌ছে, পড়ে যাবে যে, চা না হয় উনুন ধরলে হবে"। শরৎ মহারাজের মনে কি এক ভাব উঠেছে, তিনিই জানেন ; চা খাওয়াবার জন্য পুনঃপুনঃ জেদ করিতে লাগিলেন,—"না ভাই তোমায় একটু চা করে খাওয়াব, আমার প্রাণ কেমন কচ্ছে, আমার বড্ড ইচ্ছা হচ্ছে তোমায় একটু চা ক'রে

সারদানন্দ স্বামীর বর্ত্তমান লেখককে চা খাওয়াইবার ইচ্ছা

খাওয়াব"। তিনি এমন ভালবাসা ও স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিতে লাগিলেন যে, সেখানে প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ করা চলে না। অগত্যা বর্ত্তমান লেখক নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। শীতের বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, শরৎ মহারাজের সারাদিন জ্বরে ভুগে হাত পা কাঁপছে, সন্ধ্যার সময় অন্ধকার, তবুও তিনি উঠিয়া দেওয়াল ধ'রে ধ'রে সিঁড়ি দিয়ে নীচের রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন ও একটা কেরোসিন তেলের ডিবে যোগাড় ক'রে আলো জ্বাল্‌লেন। ঘুটে কয়লা যোগাড় করে রান্নাঘরের উনুনটা জ্বাল্‌লেন। তিনি নিজেই সব করিলেন, বর্ত্তমান লেখক্‌কে কোন কিছু করিতে দিলেন না। আগুনটা জ্বল্‌লে একটা বড় কেট্‌লি ক'রে জল চাপিয়ে দিলেন। পরে জলটা যখন খুব ফুটিয়াছে তখন সেই কেট্‌লিটা ডান হাতে লইয়া পুনরায় সেই সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া জ্বর গায়ে টল্‌তে টল্‌তে ফিরিতে লাগিলেন। দেওয়ালটা ডান হাতের দিকে পড়িয়াছিল, আর ডান হাতে গরম জলের কেট্‌লি, অগত্যা বাঁ হাতে দেওয়াল ধরিয়া এক পা এক পা করিয়া চলিয়া বাহিরের পশ্চিম দিকের বারান্দায় আসিলেন। বর্ত্তমান লেখক অতি কাতরভাবে তাঁহার ডান হাত হইতে কেট্‌লিটি লইবার চেষ্টা করিলেন, কারণ তিনি অতি কষ্টে আসিতেছিলেন। শরৎ মহারাজ অতি করুণস্বরে ও কাতর ভাবে বলিতে লাগিলেন,—"না ভাই তুমি কেট্‌লি নিও না ভাই, আমি তোমায় নিজে হাতে ক'রে চা খাওয়াব ভাই"। জোর করিয়া লইতে গেলে পাছে গরম জল

সারদানন্দ স্বামীর চা তৈয়ারি করিবার চেষ্টা

গায়ে পড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় বর্ত্তমান লেখক পাশে পাশে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু কেট্‌লিতে হাত দিলেন না। শরৎ মহারাজ উত্তর দিকে বড় হল ঘরটীতে গিয়া একটী সিঁড়ির নীচে ছোট কুট্‌রীর মত স্থান হইতে দুটো চায়ের বাটী ও একটা কাল রংয়ের চায়ের tea pot আনিলেন এবং tea potএ চা দিয়া গরম জল ঢালিলেন। চা তৈয়ারি হ'লে বাটীতে ঢালিয়া কি এক শান্তিপূর্ণ অনির্ব্বচনীয় মুখের ভাব করিয়া বর্ত্তমান লেখককে খাওয়াইলেন। অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও বর্ত্তমান লেখককে নিজে চা ঢালিয়া খাওয়াইয়া পরে নিজের বাটীতে চা ঢালিয়া খাইলেন। শরৎ মহারাজের সেদিন কি একটা ভাব এসেছিল তাহা বলা যায় না। সেদিন যেন তিনি দেবভাবে পরিপূর্ণ হ'য়েছিলেন। কথা-বার্ত্তা, চোখ মুখের ভাব, গলার স্বর, ভাবভঙ্গি সমস্তই যেন একটা উচ্চ অবস্থার চিহ্ন জ্ঞাপন করিতেছিল।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও যোগানন্দ-স্বামী

গরম কাল—একদিন বৈকাল বেলা যোগেন মহারাজের সহিত বর্ত্তমান লেখক গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে গেলেন। যোগেন মহারাজ সদর দোরের উপরে যে দুটী দরজা আছে, পশ্চিম দিকের দরজার মধ্যস্থলের দেওয়ালেতে ঠেস্ দিয়ে বসিলেন। গিরিশবাবু ঘরের মাঝখানটাতে বসিলেন এবং বর্ত্তমান লেখক দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের কাছে ঠেস্ দিয়া ঠিক যোগেন মহারাজের সম্মুখে বসিলেন। ঘরে বোধ হয় আরও কেহ কেহ ছিল, কিন্তু অনেক দিনের কথা ঠিক নাম স্মরণ হচ্ছে না, সম্ভবতঃ

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ছিলেন, কারণ তিনি তখন• গিরিশবাবুর কাছে কাজ করিতেন। সেই সময় থিয়েটারে মামলা মোকদ্দমা চলিতেছিল, বোধ হয় কোন সুখবর হইয়াছে তাই গিরিশবাবু সেদিন বেশ প্রফুল্ল ছিলেন। গিরিশবাবুর পাতলা অল্প অল্প দাড়ি, মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথে কাটিয়াছেন ও গা খালি ছিল। গিরিশবাবু মুখভঙ্গি করিয়া যোগেন মহারাজকে বলিলেন,—"হ্যাঁরে যোগে তো শ্যালার মনে আছে সে দিন কি করে বাতি নিয়ে গিয়েছিলি ?" যোগেন মহারাজ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"তুঃ শ্যালা, সেদিন আমার কি বিপদই গেছ্‌ল, তিনি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) কিনা এক পাঁড় মাতালের মুখে ফেলে দিয়েছিলেন।" গিরিশবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আরে যোগে বল্‌ দেখিনি তারপর কি হয়েছিল, সব ব্যাপারটা বল্‌ত একবার।" যোগেন মহারাজ বলিতে সুরু করিলেন,—"একদিন দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার ঘরের বাতি ফুরিয়ে গেছ্‌ল, আমাকে বল্‌লেন, যা গিরিশের কাছ থেকে একটা বাতি নিয়ে আয়, আর গিরিশের সঙ্গে দেখা করে আয়। আমি তখন কে গিরিশ কিছুই জানিনে, শুনেছি গিরিশ নামে থিয়েটারওয়ালা একটা পাঁড় মাতাল আছে। আমি ত বাড়ী খুঁজে খুঁজে এইখানে এসে বস্‌লুম। ছেলেমানুষ অত-শত বুঝি সুঝিনি।" গিরিশবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তারপর কি হ'ল যোগে বল্‌ত।" যোগেন মহারাজ

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের যোগানন্দ স্বামীকে উপাখ্যান বলিতে অনুরোধ করা

বলিলেন,—"দুঃ শ্যালা তখন তুই ত মাতাল হয়েছিলি—আমার কেবল ভয় হতে লাগলো পাছে তুই আমায় কামড়ে দিস্। আর মনে মনে কচ্ছি বাতি কি আর দোকানে পাওয়া যায় না, দু-পয়সা না হয় তিন পয়সা দাম হবে। একটা বাতির জন্য এক রাজ্যি থেকে আর এক রাজ্যি আসা আর এই শ্যালা পাঁড় মাতালের সাম্‌নে আসা।" পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া গিরিশবাবু আরও হাসিয়া বলিতে লাগিলেন যে,—"যোগেন আরও কি হয়েছিল বল দেখিনি, একবার শুনি।" যোগেন মহারাজ বলিতে লাগিলেন—"আরে আমি ছেলেমানুষ, আমার তখন অল্প বয়স, আমিত ঘরের ঐখানটাতে বসে রইলুম, তুই শ্যালা তখন চুর মাতাল হয়ে টল্‌তে টল্‌তেই ঘরে ঢুক্‌লি, তোর সেই চেহারা দেখেইত আমার আক্কেল গুড়ুম। আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লি, "কোত্থেকে এসেছ?" আমি বল্‌লুম, "দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস মশাই একটা বাতির জন্য আপনার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তুই বল্লি, একটা কেন একটা প্যাকেট নিয়ে যাও। তারপর থ্যাবড়ানি মেরে ঘরের মধ্যিখানে বস্‌লি। শ্যালা তখন মাল টেনেছিলি কিনা তোর মুখে যা আস্‌তে লাগলো তাই বলে তাঁকে গাল পাড়তে লাগলি। আর মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরের দিকে চেয়ে মনে মনে কি ভেবে মেজেতে ঢিপ ঢিপ করে তিনটী গড় কর্‌তে লাগলি। আবার গাল সুরু কল্লি; মুখের ত কোন আঁট ছিল না। আবার

যোগানন্দ স্বামীর উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করা

দক্ষিণেশ্বরের দিকে চেয়ে কি ভেবে আবার মেজেতে গড় করতে সুরু কল্লি। আমি যত উঠে পালাতে চাই, তুই শ্যালা তত আমাকে বসিয়ে রাখিস্। পালাতেও দিবিনি, আর বাতিও দিবিনি। তারপর সন্ধ্যার পর এক প্যাকেট বাতি আনিয়ে দিলি। আমি তো বাতি নিয়ে একেবারে চোঁ চাঁ দৌড়। দক্ষিণেশ্বরে তাঁকে বাতিটি দিয়ে বল্লুম, "কোথায় পাঠিয়েছিলেন আমায় একটা বাতির জন্য! কোথায় পাঠিয়েছিলেন মশায়, একটা ত্রেপণ্ড মাতাল, খালি গাল্, খেউর ওড়াতে লাগলো।" তিনি বল্লেন,—"হ্যাঁরে গাল্ত দিয়েছিল, আর কি করেছিল বল্ দেখিনি"। তখন আমি বল্লুম,—"মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরের দিকে মুখ করে কি বল্তে লাগলো আর মেজেতে টিপ টিপ করে তিনটি করে গড় কল্লে"।

তিনি আমার প্রতি একটু রাগ করে বল্লেন,—"তুই শ্যালা কেবল গালটা দেখলি, ভালটা দেখলিনি, কি ভক্তি, কি টান? ওরা এক থাকের ভক্ত, খুব উচুদরের ভক্ত তবে পথটা অন্য। আমি মনে মনে বল্লুম ভক্ত হয় হোগ্‌গে ও শ্যালা মাতালের কাছে আর আমি যাব না। গিরিশবাবু শুনিয়া আনন্দে টুবুটুবু হইয়া উঠিলেন। আর যেন আনন্দ রাখতে পারলেন না। গিরিশবাবু বলিতে লাগিলেন,—"ছাখ যোগে সেদিন ভূনির (সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার অমৃতলাল বসু) ঠাকুরমার শ্রাদ্ধ। গিয়ে ত খেতে বস্লুম। জ্ঞাত ভোজন, খুব ভাল খাইয়েছিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের যোগানন্দ স্বামীকে ভৎ‍র্সনা করা

তারপর বুঝলি কিনা খুব মাল টেনেছিলুম। কাঁচা কোঁচা খুলে গেছে আর কাপড়ও ময়লা করে ফেলেছি, এসেই তোকে দেখি। তিনি যে একটা বাতির জন্য আমার কাছে তোকে পাঠিয়েছেন, এই কথায় আমার যে একটা কি আহ্লাদ হোলো যে, সে আর বুকে চেপে রাখতে পারলুম না। আমি ভাবতে লাগলুম আমার উপর এত দয়া যে সামান্য একটা বাতির জন্য আমার কাছে তিনি লোক পাঠিয়েছেন। আমার কি সৌভাগ্য! এই পাঁচ কথা ভেবে আমার এমন আহ্লাদ হলো যে, সব ভুলে গেস্‌লুম, তার উপর রংয়ে ছিলুম, কি করে আহ্লাদ প্রকাশ ক'রব কিছু খুঁজে না পেয়ে যা মুখে এসেছে তাই বলেছি আর একটা করে প্রণাম করেছি। সেদিন এমন আহ্লাদ হয়েছিল যে বহুদিন সে রকম আহ্লাদ আমার জীবনে হয় নাই। সেদিন আমার ঠিক বিশ্বাস হলো যে, তিনি আমায় নিশ্চয় কৃপা করেছেন ও গ্রহণ করেছেন।" সে সময় তত রাস্তায় বাড়ী হয় নাই, তাই গিরিশবাবুর বৈঠকখানা থেকে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির স্পষ্ট দেখা যাইত। গিরিশবাবু তাই মন্দিরটির দিকে দৃষ্টি করিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন এবং যখন এই কথা হইতেছিল তখন গিরিশবাবু মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দিকে চাহিয়া যোড়হাতে মন্দিরের দিকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। এই উপাখ্যানটি হইতে গিরিশবাবুর কিরূপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ছিল তাহা সেখানে যাহারা ছিল, সকলেই বুঝিতে পারিল।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের প্রতি ভক্তি

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সিংহাসন ও পর্য্যঙ্ক তৈয়ারি করা

বরাহনগরের মঠে সামান্যভাবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা হইত অর্থাৎ শয্যাদি বা সিংহাসন এমন বিশেষ কিছু ছিল না। আলমবাজারের মঠে নিরঞ্জন মহারাজের খেয়াল হইল যে, ঠাকুরের সিংহাসন ও পর্য্যঙ্ক করাইবেন। শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে যেখানে ছোট কালীর মন্দিরটী আছে সেখানে একটী বৃদ্ধ ছুতর বাস করিত। লোকটী উঁচুদরের কারিকর ছিল, কিন্তু বয়স বেশী হওয়ায় সর্ব্বদা কাজ করিতে পারিত না। নিরঞ্জন মহারাজ অনুসন্ধান করিয়া সেই কারিকরটী স্থির করিলেন এবং প্রত্যহই তাহার ছোট দোকান ঘরটীতে গিয়া বসিতেন ও কাজ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন।

সুবোধ মহারাজ নিরঞ্জন মহারাজের সহিত যাইতেন ও বর্ত্তমান লেখকও গিয়াছিলেন। সেই কারিকরটী কয়েক মাস পরিশ্রম করিয়া ঐ সিংহাসনটী তৈয়ারি করেন, ঐরূপ উৎকৃষ্ট গড়নের সিংহাসন খুব অল্প স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। নিরঞ্জন মহারাজ ঠাকুরের শয্যাদি ও পর্য্যঙ্ক ধীরে ধীরে করাইতে লাগিলেন। একদিন ১১টা বা ১২টার সময় নিরঞ্জন মহারাজ বলরামবাবুর বাড়ীতে বসিয়া সম্ভবতঃ একখানি dictionary দেখিতেছিলেন। তাহাতে চীনে বা জাপানি কাঁসরের বর্ণনা আছে। নিরঞ্জন মহারাজের জাপানি কাঁসর কিনিতে বড়ই ইচ্ছা হইল এবং মাষ্টার মহাশয়ের কাছ থেকে কয়েকটী টাকা লইয়া একখানি কাঁসর ও চামড়ার গুলো দেওয়া বাজাইবার একটী ডাণ্ডা আনিলেন। সেই কাঁসরটী অদ্যাপিও ঠাকুর ঘরে বাজিয়া থাকে।

এইরূপে ঠাকুর ঘরের অনেক জিনিষ নিরঞ্জন মহারাজ যোগাড় করিয়াছিলেন।

নিরঞ্জন মহারাজের পরামাণিকের ঘাটে বেলগাছ রোপণ ও স্থানটী মার্ব্বেল পাথর দিয়া বাঁধান

পরামাণিকের ঘাটে যেখানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অগ্নিসংস্কার করা হইয়াছিল, নিরঞ্জন মহারাজ সেইখানে একটা বেলগাছ রোপণ করিয়াছিলেন এবং স্থানটী মারবেল পাথর দিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার আরও ইচ্ছা ছিল যে, দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে যে যে স্থানে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের বিশেষ ঘটনা হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে তিনি তদ্বিষয় উল্লেখ করিয়া পাথর বসাইয়া দিবেন, কিন্তু তিনি সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার এই সকল দিকে বড় ইচ্ছা ছিল। এই রকম প্রয়োজনীয় অনেক জিনিষ তিনি তৈয়ারী করাইয়াছিলেন।

সম্ভবতঃ ১৮৯১ সালে গরমের শেষ ও বর্ষার প্রারম্ভে দীন মহারাজ (স্বামী সচ্চিদানন্দ নং ১) আলমবাজার মঠে প্রথম আসিলেন, তখন তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইবে। তিনি পদব্রজে গঙ্গা পরিক্রম করিয়া আলমবাজার মঠে আসিলেন। অতি কঠোরী ও ত্যাগী ছিলেন, একটি পয়সা পর্য্যন্ত রাখিতেন না এবং অতিরিক্ত বস্ত্রও কিছু সঙ্গে রাখিতেন না। বৃদ্ধ বয়সে তিনি সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষটা ও উত্তরাখণ্ড বা হিমালয় প্রদেশ পদব্রজে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। দেখিতে কৃশ ও দীর্ঘাকৃতি এবং কার্য্যে সর্ব্বদা তৎপর। পূর্ব্বে তিনি কাশীধামে সোনারপুরায় বংশী দত্তের বাড়ীতে অদ্বৈতানন্দ বা গোপালদাদার কাছে অল্প দিন

ছিলেন। সেই সময় যোগেন মহারাজ, তুলসী মহারাজ প্রভৃতির সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল এবং তাঁহারা নিজেদের লোক করিয়া লইয়াছিলেন। পরে যখন তিনি আলমবাজারের মঠে আসিলেন, অনেকেই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন এবং আপনার লোক বলিয়া অতি সাদরে গ্রহণ করিলেন। তদবধি তিনি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের একজন প্রধান ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়া বর্ত্তমানে কাশীধামে বাস করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ আমেরিকা থেকে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে তিনি বাড়ী তৈয়ারীর কন্‌ট্রাক্টারী কাজ করিতেন এবং উড়িষ্যা দেশের অনেক বাড়ী তিনি তৈয়ারী করিয়াছিলেন। "বেলুড় মঠ" ও "কাশীর সেবাশ্রমের" অনেক অংশ ইঁহার তত্ত্বাবধানে তৈয়ারী হইয়াছিল। তিনি কার্য্যেতেও যেমন নিপুণ ছিলেন সেইরূপ সাধনমার্গেও উন্নত। সাধনমার্গের কথা বর্ত্তমান লেখকের সহিত রাত্রিতে কহিবার সময় তিনি এত উচ্চস্তরের কথা কহিতেন যে, শ্রোতারা সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক সময় তাঁহাকে কথা বন্ধ করিতে বলিতেন। তিনি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সকলের শ্রদ্ধেয় ও প্রণম্য। দীন মহারাজ

আলমবাজারের মঠের প্রথম সময়েই একদিন গরম কালের বৈকালে শরৎ মহারাজ বলিলেন, "তিনি কিছু আহার করিবেন না ; রাত্রিটা উপোষ করিয়া থাকিবেন। বাহিরের দিকের বড় ঘরের সাম্‌নের বারান্দাটায় একখানা

মাদুর পাতিয়া তিনি পশ্চিম দিকে মাথা করিয়া শুইলেন। বর্ত্তমান লেখককে বড় ভালবাসিতেন, তাঁহাকে সেই বালিসের অপর পার্শ্বে মাথা দিয়া পূর্ব্বদিকে পা করিয়া শুইতে বলিলেন। গরম কাল, একটু একটু হাওয়া চলিতেছে; বর্ত্তমান লেখকের আধা নিদ্রা হইয়াছে, রাত্রিটা তখন একটু অন্ধকার ছিল। রাত্রি ১১টা বা ১১॥০টার সময় শরৎ মহারাজ পশ্চিম দিকের দেওয়ালের জানালার দিকে মুখ করিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং অনেকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। ক্রমেই রাত্রি বাড়িতে লাগিল। চাঁদ উঠিল, চাঁদের আলো মুখে ও বুকে পড়িল। নিকটস্থ শায়িত ব্যক্তির আর নিদ্রা হইল না তিনি নিঃশব্দে স্থির হইয়া রহিলেন। শরৎ মহারাজ প্রথমে গুণগুণ করিয়া গাহিতে লাগিলেন,—

স্বামী সারদানন্দের বিষাদের ভাব

"যাবে কিহে দিন আমার বিফলে চলিয়ে
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে।"

প্রথম অতি মৃদুস্বরে তিনি এই গানটী গাহিতে লাগিলেন, ক্রমেই স্বর বাড়িতে লাগিল এবং শেষে তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। অনবরত তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, মোটা মানুষ—বুক ভাসিয়া গিয়া পরিধেয় বস্ত্র ভিজিয়া যাইল। চাঁদের আলো পড়ায় তাঁহার অশ্রুপ্রবাহ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতে লাগিল। এমন সকরুণ স্বরে কাতরপ্রাণে চারিটী পংক্তি গাহিতে লাগিলেন যে, শায়িত শ্রোতার বুকের ভিতর কষ্ট হইতে লাগিল। তখন

শরৎ মহারাজ ভাবে বিভোর হইয়া গিয়াছেন; দিক্‌বিদিক্ কিছুই জ্ঞান নাই ভজনের অপর কলিগুলা তিনি গাহিতে পারিতেছেন না। কেবল চারিটি পংক্তি অনবরত উচ্চারণ করিতেছেন ও হৃদয়বিদারক কাতরস্বরে যেন ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া স্তুতি করিতেছেন। এই সময় শরৎ মহারাজের বড় একটা বিষাদের ভাব আসিয়াছিল। তিনি সকল কার্য্যে ও কথাবার্ত্তাতে সর্ব্বদাই "আর ত কিছু হোলো না, আর কিছুই পেলুম না, দেহটা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র" এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন।

শরৎ মহারাজের এইরূপ ভাব আরও দু'বার দেখা গিয়াছিল। স্বামিজীর দেহত্যাগের পর প্রথম অমাবস্যায় যখন বেলুড় মঠে কালীপূজা হইয়াছিল তখন একবার এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। শরৎ মহারাজ রাত্রি ২টা বা ২৷৷০ সময় উপরকার বারান্দায় একলা দাঁড়াইয়া গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া অতি কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ রোদনের পর তিনি নিজের মাথা মা কালীর চরণে সমর্পণ করিলেন। তিনি এমন করুণস্বরে ও কাতরভাবে রোদন করিতে করিতে এক এক জনের নাম উল্লেখ করিয়া তাহাঁর মস্তক মা কালীর পদে সমর্পণ করিতেছিলেন যে তাহা শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া উঠিয়াছিল। শরৎ মহারাজের এরূপ ভাব দেখিয়া অন্য ঘরের অনেকেই উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি যাহাদিগের নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন, তাহাদের ভিতর অনেকেই শরৎ মহারাজের খেদোক্তি অনুসারে

কালী পূজার দিন সারদানন্দ স্বামীর রাত্রে রোদন

আপনাদিগের মস্তক মা কালীর কাছে পূর্ণাহুতি মনে মনে দিতে লাগিলেন। তাহার পর বৃদ্ধ নিত্যানন্দস্বামী উপরে আসিয়া শরৎ মহারাজকে লইয়া চলিয়া যাইলেন। এইরূপ মাতোয়ারা ভাব ধীর শান্ত শরৎ মহারাজের পক্ষে আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

বেলুড় মঠে দরিদ্র-নারায়ণ সেবা

স্বামিজীর তিরোভাবের পর প্রথম বৎসর যে দরিদ্র নারায়ণ সেবা হইয়াছিল, তাহাতে জনসংখ্যা অধিক হইয়াছিল। প্রথম ক্ষেপে সমস্ত মাঠটিতে লোক ভোজন করিতে বসিল; কিন্তু প্রায় তত পরিমাণ লোক খাইতে অবশিষ্ট রহিল। অভুক্ত লোকদিগের আহারের স্থান করিবার জন্য শরৎ মহারাজ, বিরজানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক ঝাড়ু ও বাল্‌তি হাতে লইয়া মাঠ পরিষ্কার করিতে বাহির হইলেন। যদিও অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন, তবুও অপরকে আদেশ করা অবিধেয় বিবেচনা করায় ইহারা তিন জনেই কাজ সুরু করিলেন। বেলুড় মঠের দক্ষিণ দিকের মাঠের ধারে যে রকটি আছে তাহার অনতিদূরে একটি বাঁশের বেড়া আছে। উৎসবের দিন যদিও বাঁশের বেড়াটি খুলিয়া ফেলা হইয়াছিল, কিন্তু তৎস্থল হইতে কয়েক পদ দক্ষিণ দিকে গিয়া দরিদ্র নারায়ণদিগের ভুক্তাবশিষ্ট অন্নাদি বাল্‌তিতে তিন জনে ঢালিতে লাগিলেন। শাল পাতাতে ভাত, কড়ায়ের দাল, মাছের ছ্যাঁচড়া, আলু দিয়া মাছের দম্ এবং বোঁদে ও দই ইত্যাদি সব একত্রিত ও মিশাল হইয়া রহিয়াছে। দেখিতে অতি বীভৎস হইয়াছিল।

শরৎ মহারাজ তিন জনের মধ্য হইতে কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন এবং ডান ধারের ও বাম ধারের উচ্ছিষ্ট পাতাগুলি হইতে কিছু কিছু সর্ব্ব মিশ্রিত অন্ন উঠাইয়া লইলেন এবং বাম হাতের চেটোয় রাখিয়া ডান হাতের তিনটি অঙ্গুলি দিয়া অন্নগুলি মুখে দিয়া মাথায় হাত মুছিলেন এবং অতি ভক্তিপূর্ণ মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, "উনসত্তিক জাতের প্রসাদ মহাপ্রসাদ" বার তিনেক একথা বলিয়াই শরৎ মহারাজ স্থির নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। চক্ষুর্দ্বয় অর্দ্ধ নিমীলিত, বাহুদ্বয় নিস্পন্দ, সমস্ত শরীর স্থির। তাহার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন ও আবার কাজ করিতে লাগিলেন। শরৎ মহারাজের মুখের ভাব দেখিয়া যেন বোধ হইতে লাগিল যে, তিনি যেন দেখিতেছেন গাছ, পাতা, ফুল, ঘাস, মানুষ, আকাশ, জল সবই যেন ব্রহ্মময় —সব একেরই বহুরূপ হইয়াছে! সবই একরূপ। কি স্নিগ্ধ গম্ভীর ভাব তাঁহার মুখে সে সময় হইয়াছিল তাহা বলিবার নয়। কয়েক দিবস পরে ঐ কথার উল্লেখ করায় শরৎ মহারাজ অপ্রতিভ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ও সব কিছু নয়, ও সব কিছু নয়" এই বলিয়া তিনি কথা চাপা দিলেন ও আপনার ভাব গোপন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ পুনরায় যেন তাঁহার চক্ষের ভিতর দিয়া আবার সেই ভাবটি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

সারদানন্দ স্বামীর দরিদ্র নারায়ণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন

বরাহনগর মঠের শেষ বরাবর তুলসী মহারাজ যদিও ঋষিকেশ প্রভৃতি স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন,

 কিন্তু দক্ষ মহারাজকে পাগল অবস্থায় ফিরাইয়া লইয়া আসা অবধি বোধ হইতেছে যেন তিনি আর বিশেষ কোথাও বাহিরে যান নাই। মঠের সমস্ত দেখাশুনা কার্য্য তিনিই করিতেন। আলমবাজারের মঠ হইলে তুলসী মহারাজ একজন প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তিনি যুবা, বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী ছিলেন। আলমবাজারের মঠে শশী মহারাজের সহকারীরূপে সমস্ত কার্য্যই করিতেন। ভিতর বাড়ীর পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণের যে পায়খানাটি ছিল তাহা তিনি নিজেই মাঝে মাঝে পরিষ্কার করিতেন। ঐ পাইখানার দরজার সম্মুখে একটা বা দুইটা মাটির গামলা থাকিত, একটা বড় মাটির কলসি বাঁ-কাঁধে ও একটা ডান হাতে করিয়া তিনি খিড়কির পুকুর হইতে জল আনিয়া গাম্‌লাগুলি ভরিয়া রাখিতেন। এইরূপ অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া তাঁহার কাঁধে দাগ পড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার মুখে একটি কথা কখন ফোটে নাই বা বিরক্তির ভাব কখনও প্রকাশ পায় নাই। তিনি স্বয়ং বাজার করিয়া আনিতেন এবং যখন যাহা কাজের আবশ্যক হইত তিনি তাহা প্রাণ দিয়া অকাতরে করিতেন। আবার একটু অবসর পাইলেই অধ্যয়ন করিতে বসিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধন ভজনও খুব করিতেন। সর্ব্বদাই হাসি মুখ, মিষ্টভাষী ও বিনয়ী। এই সময়ে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী শক্তি বিকাশ পাইয়াছিল। সকলেই তখন তুলসী মহারাজের বিশেষ অনুগত হইয়াছিল। সকলকে তিনি এরূপ ভাবে সেবা ও পরিতুষ্ট করিয়া

ছিলেন যে, সেটা যেন তাঁহার আজও আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার সকলের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য অসীম ছিল। উদাহরণস্বরূপ এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাইতেছে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে রবিবার সকলে লোচন ঘোষের ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিল। স্নান ঘাটে সকলে একত্রিত হইয়া কথাবার্ত্তা করায় বেলা অধিক হইয়া পড়ে। রাস্তায় তখন খোয়া ঢালা ছিল না,—বালী ঢালা ছিল। সকলের শুধু-পা, তাহাতে রাস্তা গরম হইয়া পড়িয়াছিল। পায়ে সকলেরই তাত লাগিতে লাগিল। বাজার থেকে পূর্ব্বদিকে খানিকটা আসিয়া বর্ত্তমান লেখকের পায়ে ফোস্কা হইয়া উঠিল। তুলসী মহারাজেরও শুধু-পা ছিল, কিন্তু তিনি সহ্য করিয়া রহিলেন। অবশেষে ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে তিনি দুই হাতে তুলিয়া লইয়া মঠে আসিলেন, —নিজের কোন কষ্ট গ্রাহ্য করিলেন না। এইরূপ দয়া ও অপরের মঙ্গল কামনার উদাহরণ তাঁহার জীবনে অনেক আছে।

বর্ত্তমান লেখকের প্রতি নির্ম্মলানন্দ স্বামীর ভালবাসা।

আর একটি উদাহরণ এই স্থানে বলা যাইতে পারে। তখন জামাইষষ্ঠীর দিন কয়েকবার সুরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের জন্মোৎসব হইয়াছিল। বাহিরের কাহাকেও বলা হইত না,— কেবলমাত্র দুই একটিকে নিমন্ত্রণ করা হইত। তুলসী মহারাজ একদিন বৈকাল ৩টা বা ৩৷৷০টার সময় ৭নং রামতনু বসুর গলির বাটীতে আসিয়া বর্ত্তমান লেখককে আলমবাজারের মঠে যাইবার জন্য বলিয়া গেলেন, এবং আরও বলিলেন যে

এ বিষয় যেন অপর কাহাকেও বলিয়া গোল করিও না। রাত্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ ভোগ দেওয়া হইলে তুলসী মহারাজ বর্ত্তমান লেখককে নিজের কাছে বসাইয়া প্রসাদের অংশ হইতে তাহাকে খাওয়াইলেন, নিজে শুধু একটু জিবে ঠেকাইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অমায়িক উদার ভাব যে শুধু বর্ত্তমান লেখকের প্রতি ছিল তাহা নহে, সকলের সহিতই তাঁহার বিশেষ স্নেহপূর্ণ সদাশয় ভাব ছিল।

নির্ম্মলানন্দ স্বামীর বিদ্যা চর্চ্চা।

বিদ্যাচর্চ্চায় ও পাণ্ডিত্যে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রাদি তিনি অনেক অধ্যয়ন করিয়া লইয়াছিলেন এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ বুৎপত্তি লাভ হইয়াছিল। তিনি বাঙ্গালা ও হিন্দীর ন্যায় সংস্কৃত ভাষাতে অনর্গল বাক্যালাপ করিতে পারিতেন। নবাগত ব্যক্তিদিগকে বেদান্ত, ব্যাকরণ ও অপর শাস্ত্রাদি পাঠ করাইতেন এবং বক্তৃতাকালে ইংরাজি ভাষায় অনর্গল গভীর ভাবপূর্ণ বক্তৃতা দিতে পারিতেন। তাঁহার একটি বিশেষ লক্ষণ ছিল যে, তিনি যেখানে বসিতেন বা শয়ন করিতেন সেই স্থানটি বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতেন।

রন্ধনকার্য্যে তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। তিনি পাচকদিগের চেয়েও উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন রন্ধন করিতে পারিতেন। তাঁহার শক্তি বহুমুখী। তিনি সকলেরই শ্রদ্ধেয় ও প্রণম্য।

স্বামী সদানন্দ সিমলার Bird and Co র কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সন্ন্যাসী বেশে মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

সদানন্দ স্বামীর পুনরায় মঠে আগমন।

সর্ব্বদাই হাসি মুখ ও বিশাল হৃদয়। সকলেরই সহিত তিনি বালকের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতেন এবং অল্পতেই পরিতুষ্ট হইয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেন। গুপ্ত মহারাজ বর্ত্তমান লেখককে প্রীতি পূর্ব্বক 'চাচা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং দীনো মহারাজকে 'নানা' (মাতামহ) বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কার্ত্তিক মাস আরম্ভ হইয়াছে, একটু একটু শীত পড়িয়াছে। একদিন সকালবেলা গুপ্ত মহারাজ বর্ত্তমান লেখককে বলিলেন, "চাচা, আমায় বাইবেল পড়িয়া শুনাও ত।" বর্ত্তমান লেখক একখানা বাইবেল লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। গুপ্ত মহারাজ একখানি গৈরিক চাদর লইয়া আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিলেন। বর্ত্তমান লেখক তাহা দেখিয়া বলিলেন, "তুমি যদি ঘুমাও, তাহলে আমি পড়িব না।" গুপ্ত মহারাজ মুখের চাদরটি খুলিয়া স্মিত মুখে বলিলেন,— "তুমি যা পড়্ছো আমি সব শুনেছি, ঐটাই আমি ধ্যান কচ্ছি। আমি যেন Parable of Samaritan Woman (সামেরিয়া নারীর উপাখ্যান) দিব্য চক্ষে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি। যীশু যেন সেই পাত্‌কোর চাতালের উপর চুপ ক'রে ব'সে আছেন"—বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চক্ষের কোণেতে জলবিন্দু আসিল, তখন তিনি স্থির হইয়া গম্ভীর মুখ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে মুখ অন্য ভাবাপন্ন হইয়া গেল,—তাঁহার প্রস্ফুটিত তেজঃপুঞ্জ জ্যোতিটী অন্য এক অতি উচ্চস্তরে চলিয়া

গেল। অগত্যা পড়া বন্ধ হইল, দুই জনাই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি নাই। অবশেষে বর্ত্তমান লেখক সহসা বলিয়া উঠিলেন,—"দেখ্ গুপ্ত, তোর মুখটা ঠিক আমাদের মতন দেখ্‌তে, তুই যেন পূর্ব্ব জন্মে আমাদের বংশে জন্মেছিলি। তবে এ জন্মে কোন কারণে বস্তির ঘরে জন্মেছিলি, যেমন একটু বড় হ'লি থাক্‌তে পার্‌লিনি, পালিয়ে নিজের আত্মীয়দের কাছে ছুটে এলি।" গুপ্ত মহারাজের এই কথাটা এতদূর ধারণা হইয়াছিল যে, সর্ব্বদাই তিনি সকলকে এই কথাটা বলিতেন।

সদানন্দ স্বামীর একটি টাকা পাইয়া আনন্দ।

এক সময়ে গুপ্ত মহারাজ একটা টাকা পাইয়াছিলেন। টাকাটা তাঁহার বিষম জঞ্জাল হইয়া উঠিয়াছিল। টাকাটা লইয়া কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে স্থির করিলেন যে শনিবার চাচা আসিলে স্বহস্তে মাংস রাঁধিয়া তাঁহাকে খাওয়াইবেন। শনিবার তিনটার সময় বর্ত্তমান লেখক উপস্থিত হইলে গুপ্ত মহারাজ বালকের ন্যায় হাততালি দিয়া নৃত্য ও উল্লাসের ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। যেন কি একটা ব্যাপার হইয়াছে,—আনন্দ তাঁর আর ধরে না। নিরঞ্জন মহারাজ রহস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হ্যাঁরে গুপ্ত তুই না ত্যাগী, তোর পক্ষে টাকাটা চোঁয়া ঠিক না, তুই টাকাটা আমায় দে।" গুপ্ত মহারাজ বালকের ন্যায় স্বভাব, হাস্য ও অর্দ্ধনৃত্য করিতে করিতে বলিলেন, "নেহি দেগা, কিসিকো নেহি দেগা।"

তুলসী মহারাজও তাঁহাকে লইয়া এইরূপ কৌতুক করিতে লাগিলেন। একটা সামান্য কথা উপলক্ষ করিয়া সকলেই আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। পরে গুপ্ত মহারাজ নিজে মাংস আনিলেন ও রান্নাঘরের পূর্ব্বদিকের দালানে একটা বড় মাটির উনুন পড়িয়াছিল, আর একটা বড় লোহার stew-pan ছিল। তিনি সেই উনুনটীতে মাংস রন্ধন করিলেন। সেইদিনকার রান্না এত সুস্বাদু হইয়াছিল যে বর্ত্তমান লেখকের অদ্যাপিও তাহা স্মরণ রহিয়াছে। বাগবাজারের বোস পাড়ার বাটীতে গুপ্ত মহারাজ দেহত্যাগ করিবার মাস খানেক পূর্ব্বে একদিন তিনি বলিলেন, "চাচা, আলমবাজারের মঠে সেই মাংস রান্না হইয়াছিল মনে আছে?" বর্ত্তমান লেখক বলিলেন, "সেদিনকার কথা কি ভোলা যায়, সেটা অমৃতময় ডেলা ডেলা ভালবাসা।" কথাটা শুনিয়া গুপ্ত মহারাজের পূর্ব্বস্মৃতি জাগরুক হওয়ায় তাঁহার চক্ষে একটু জল আসিয়াছিল এবং ঠোঁট দুটি হাসি ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

সদানন্দ স্বামীর বর্ত্তমান লেখককে রন্ধন করিয়া খাওয়ান।

গিরিশ বাবু গাড়ী করিয়া ফিরিবেন। তাঁহার সহিত আসিলে বাগবাজার পর্য্যন্ত অনায়াসে পৌঁছান যাইতে পারে এইজন্য বর্ত্তমান লেখক তাঁহার সহিত আসিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু হঠাৎ বর্ত্তমান লেখকের তীব্র ক্ষুধার উদ্রেক হইল। তখন ঠাকুরের কোন বৈকালী প্রসাদও ছিল না। তিনি গুপ্ত মহারাজকে চুপি চুপি বলিলেন, "গুপ্ত, আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে, আমি অস্থির হ'য়ে

উঠেছি, কিছু থাকে ত আমায় খেতে দাও।" গুপ্ত মহারাজ তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "এই যে এখুনি এনে দিচ্ছি" বলিয়া উঠিয়া গেলেন। গিরিশ বাবুর গাড়ী আসিয়াছে,—তিনি ফিরিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন,—গাড়োয়ান চেঁচামেচি কচ্ছে,—সেদিকে গোলমাল। ভালবাসা এমনি জিনিষ যে, সব প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকে। গুপ্ত মহারাজ গিরিশ বাবুকে তাওয়া দেওয়া এক ছিলিম তামাক সাজিয়া দিয়া একটা গল্প আরম্ভ করিয়া দিলেন। গিরিশ বাবু সেই প্রসঙ্গ লইয়া সকলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। এদিকে গাড়োয়ানকে মিষ্টিকথা বলিয়া একটু বিলম্ব করিতে বলিলেন। দ্রুতপদে রান্নাঘরে গিয়া ঘুটে দিয়া আগুন করিলেন। ময়দাতে একটু গোল-মরিচ ও লবণ দিয়া একটা লাড্ডু করিয়া একখানা "টিক্কর" করিলেন এবং অল্পক্ষণের ভিতর একখানা গরম "টিক্কর" ও এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল লইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া সাম্নের বড় ঘরেতে বসিয়া বলিলেন, "চাচা, এই গরম টিক্কর খাও—বহুৎ বড়িয়া মাল হুয়া হ্যাঁয়।" বর্ত্তমান লেখক তাঁহার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন এবং পরে অল্প অল্প করিয়া গরম "টিক্কর" ও এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাইয়া বড়ই পরিতুষ্ট হইলেন। ইহাকেই বলে ভালবাসা। যতদিন গুপ্ত মহারাজের নাম থাকিবে ততদিন এই "টিক্কর" ও ঠাণ্ডা জলের কথা জগতে থাকিবে।

সদানন্দ স্বামীর বর্ত্তমান লেখকের প্রতি ভালবাসা।

আলমবাজারের মঠে তিনি নিবিষ্ট মনে বাইবেলখানি পড়িতেন এবং যীশু ও তাঁহার উপাখ্যানগুলি অতি শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া হৃদয়ে রাখিতেন। গীতা, উপনিষদ, বেদান্ত ও শঙ্করের গ্রন্থাদি তিনি মন দিয়া শুনিয়া সারার্থ অতি সুন্দরভাবে গ্রহণ করিতেন এবং আবশ্যক হইলে অপরকে বুঝাইয়া দিতেন। যদিও পাণ্ডিত্য ও ভাষার পারিপাট্যে তাঁহার নৈপুণ্য ছিল না, কিন্তু তাঁহার বিশাল হৃদয় ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকায় গ্রন্থের সারার্থ অতি সুন্দরভাবে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিতেন। জোয়ানপুরে জন্ম হওয়ায় তুলসীদাসের রামায়ণখানি তাঁহার বিশেষ আদরের ছিল। তাঁহার মেধাশক্তি বেশ ভাল ছিল, নিবিষ্ট মনে শুধু কথাবার্ত্তা শুনিয়া অনেক গ্রন্থ না পড়িয়াও তিনি স্মরণ রাখিয়াছিলেন। এই সময় গুপ্ত মহারাজ অনবরত জপ করিতেন। যখনই একটু অবসর পাইয়াছেন, তখনই দেখা যাইত তিনি স্থির হইয়া বসিয়া জপ করিতেছেন এবং ঠোঁট দু'খানি নড়িতেছে। তিনি যখন শেষ রোগাক্রান্ত হইয়া বোস পাড়ার বাড়ীতে মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন তাঁহার দেহত্যাগের কয়েক মাস পূর্ব্বেও দেখা যাইত যে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সদাসর্ব্বদ জপ ধ্যান করিতেছেন। যে সমস্ত বালক তাঁহার সেবা করিত তাহারা নিদ্রিত মনে করিয়া যখন তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিত তখন তিনি বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "একটু জপ কচ্ছি তাহাতে তোমরা বাধা দাও কেন?" মৃত্যু সময়েও তাঁহার ঠোঁট নড়া এবং জপ করা দেখা গিয়াছিল।

সদানন্দ স্বামীর জপ করা।

গুপ্ত মহারাজ কর্ম্মীলোক ছিলেন। কর্ম্মই তাঁহার সাধনা ছিল। কলিকাতায় যেবার প্রথম প্লেগ হয় সেই সময় গুপ্ত মহারাজ, সিষ্টার নিবেদিতা ও কতিপয় ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া রাস্তা পরিষ্কার করিবার প্রয়াস করেন। তাহার পর তিনি ভাগলপুর প্লেগে, স্বগোষ্ঠি লইয়া প্লেগ নিরারণের জন্য ভাগলপুর গিয়া তথায় এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও লোকের এমন সাহায্য করিয়াছিলেন যে, সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা করিয়াছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান অঙ্গ দুঃস্থ গ্রামবাসীদিগের সাহায্য করা। গুপ্ত মহারাজ, শরৎ মহারাজের আদেশে প্রণোদিত হইয়া প্রথম এই কার্য্য সুরু করিয়াছিলেন। এক্ষণে স্থানে স্থানে যে দুঃস্থ ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করা হয়, এই কার্য্যের গুপ্ত মহারাজ প্রণেতা ছিলেন। দ্বিতীয় বার ভাগলপুর থেকে প্লেগ নিবারণ কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিয়া গুপ্ত মহারাজের শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি শয্যাশায়ী হইলেন এবং পুনরায় আর উঠিতে পারিলেন না। বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইলেন, তাহাতেই কয়েক বৎসর পরে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

প্লেগের সময় সদানন্দ স্বামীর সেবাকার্য্য করা।

এস্থলে গুপ্ত মহারাজের বিস্তৃত জীবনী লেখা উদ্দেশ্য নয়। কেবলমাত্র সংক্ষিপ্ত গুটীকয়েক কথা উল্লেখ করা হইল মাত্র। এইজন্য তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনা পরিত্যক্ত হইল। শুধু এইমাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, গুপ্ত মহারাজ স্বামিজীর সেবা করিবার জন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "আমি স্বামিজীর সেবা

করিবার জন্য জন্মিয়াছি, স্বামিজী চলিয়া গেছেন আমার দেহ রাখিবার আর আবশ্যক নাই।" অনেক সময় তিনি বলিতেন, "আমি স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝিতে পারি নাই; তিনি বড়লোক, যশস্বী, শক্তিমান ও পণ্ডিত লোক, —আমার সে লোককে ভয় করে। আমি বুঝি আমার পুরাণ গরীব নরেন্দ্র দত্ত যে শুধুপায়ে হেঁটে হেঁটে বেড়াত, আর দুজনে মিলে গাছের তলায় শুয়ে থাক্‌তুম, আর যে দিন যা যুট্‌তো তাই খেতুম। আমার নরেন্দ্রনাথকে মিষ্টি লাগে,—বিবেকানন্দকে ভয় করে।" এই উক্তি হইতেই গুপ্ত মহারাজের সমস্ত জীবনের কর্ম্ম বোঝা যায়। তিনি লোককে ভালবাসিতেন, কথাবার্ত্তার দিকে তাঁহার তত খেয়াল ছিল না। এমন উদার ভাবের লোক জগতে ভবিষ্যতে আদর্শ হইয়া থাকিবে।

সদানন্দ স্বামীর নরেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা।

বরাহনগরের মঠে যেরূপ, আলমবাজারের মঠেও সেইরূপ শশী মহারাজ পূজাদি করিতেন এবং অত্যন্ত পরিশ্রমী ও তেজস্বী বলিয়া সকল কার্য্যে প্রধান হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি একপ্রকার কর্ত্তা ছিলেন এবং তাঁহার আদেশমত সকলেই চলিতেন। মঠ সংক্রান্ত যাহা কিছু কার্য্য সমস্তই শশী মহারাজ স্বয়ং করিতেন ও তাঁহার আদেশমত সম্পাদিত হইত। তিনি যেমন অকাতর পরিশ্রমে সমস্ত কার্য্য করিতেন, তেমনি জপ, ধ্যান ও অধ্যয়ন করিতেন। B. A. পরীক্ষা দিবার কয়েক দিবস পূর্ব্বে তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কাশীপুরের বাগানে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট আসিয়াছিলেন। সংস্কার এমন জিনিষ যে, আলমবাজারের মঠে তিনি একদিন হাস্য করিয়া বলিতেছেন, "আরে দেখ কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি যে, পরীক্ষার চারদিন মাত্র আর বাকী আছে, আমি খুব মন দিয়া পড়্‌ছি আর ভাব্‌ছি কি ক'রে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ব। আর দেখ কত বৎসর হ'ল বাড়ী ঘর ত্যাগ করেছি তবুও এখন পরীক্ষার ভয় ভেতোরে রয়েছে; স্বপ্নেও তাই দেখেছি, একেই বলে সংস্কার।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।

গণিত বিদ্যা তাঁহার বিশেষ ভাল লাগিত। আলমবাজারের মঠে অনেক সময় ১১টার পর অবসর পাইলেই তিনি গণিতের একখানা পুস্তক খুলিয়া শ্লেট বা কাগজে অঙ্ক কসিতেন। অনেক সময় অপরাহ্ণ ৪টার পর অর্থাৎ ঠাকুরঘরের বৈকালি সমাপনের পর তিনি ভাগবৎখানি খুলিয়া ঋষভদেবের উপাখ্যানটী পড়িতেন এবং পড়িতে পড়িতে সহসা উত্তেজিত হইয়া বর্ত্তমান লেখককে বলিতেন, "দেখ একেই বলে উচ্চ অবস্থা। এই হচ্চে ঠিক পরমহংসের অবস্থা।" তিনি ঋষভদেবের উপাখ্যানটি অনেকবার পড়িয়াছিলেন ও বর্ত্তমান লেখককে শুনাইয়াছিলেন। একবার নিরঞ্জন মহারাজ বর্ত্তমান লেখকের সহিত নানা গ্রন্থাদি সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করিতেছেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা উঠিল। বর্ত্তমান লেখক তখন বৈষ্ণবগ্রন্থের কিছুই জানিতেন না,—চৈতন্যদেবের শুধু নাম মাত্র শুনিয়াছিলেন,—কাজেই বেফাঁস কথা হইতে

লাগিল। শশী মহারাজ অপর স্থানে ছিলেন। তিনি, সেখান থেকে আসিয়া বলিলেন, "তুই ছোঁড়া বৈষ্ণব বই পড়েছিস্?" বর্ত্তমান লেখক বলিলেন, "না।" "আগে বৈষ্ণব বই পড়ে তবে তর্ক কর্‌বি" এই বলিয়া শশী মহারাজ চৈতন্যচরিতামৃত ও অপর অপর বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠ করিতে উপদেশ দিলেন। বর্ত্তমান লেখক পুস্তকগুলি লইয়া আসিয়া চৈতন্য-চরিতামৃতের ধারে দাগ দিয়া সমস্ত পুস্তকগুলি পড়িলেন ও যতদিন না অধ্যয়ন সমাপ্ত হইল ততদিন শশী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। তারপর গ্রন্থাদি লইয়া শশী মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এইত সব বইগুলা পড়া হয়ে গেছে, এখন কি তর্ক কর্‌বে বল।" শশী মহারাজ বইগুলা খুলে দেখেন যে যথার্থই ধারে ধারে দাগ দেওয়া হইয়াছে। তিনি তখন সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "যা ছোঁড়া সন্তুষ্ট হয়েছি" —এই বলিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। গল্পটি সামান্য হইলেও শশী মহারাজের বিদ্যাচর্চ্চার দিকে কেমন অনুরাগ ছিল এবং অপরকেও তিনি কি ক'রে বিদ্যাচর্চ্চায় প্রণোদিত করিতে পারিতেন ইহাই তাহার একটি উদাহরণ। মিষ্ট মধুর ভাবে হাসি তামাসার ছলে তিনি অপরকে বিদ্যাচর্চ্চায় উত্তেজিত করিতে পারিতেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও বর্ত্তমান লেখক।

একদিন গরমকালের অপরাহ্নে বর্ত্তমান লেখক একখানি খৃষ্টীয় গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন এবং শিবানন্দ মহারাজের সহিত সেই বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। উভয়েই বাহির

বাড়ীর বড় ঘরটীর মাঝের দরজার সাম্‌নার বারান্দায় বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন; তাহাতে যীশু, বুদ্ধ ও মহম্মদের জীবনী লেখা ছিল এবং কে কাহার চাইতে কতখানি বড় তাহার যেন সব জরিপ করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান লেখকের অল্প বয়স, সেই জন্য দোষ গুণ কিছু বুঝিতে পারিতেছিলেন না। শিবানন্দ মহারাজের সহিত কথাবার্ত্তা হইতেছিল। শশী মহারাজ ঠাকুরঘরের বৈকালীর কাজ করিতেছিলেন এবং জানালা দিয়া সব শুনিতে পাইতেছিলেন। সহসা তিনি রুদ্র-মূর্ত্তি ধরিয়া সম্মুখে আসিলেন এবং অতি ক্রোধে পূর্ণস্বরে বর্ত্তমান লেখককে বলিলেন, "কি বই পড়ছিস্‌রে হতভাগা ছোঁড়া?" বর্ত্তমান লেখক যাহা পাঠ করিতেছিলেন তাহা লইয়া শশী মহারাজের সহিত তর্ক করিবার প্রয়াস পাইলেন। শশী মহারাজ তাহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং ডান পা তুলিয়া লাথি মারিবার মত করিয়া দাঁড়াইলেন। সে ভীষণ রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া বর্ত্তমান লেখকের হৃৎকম্প হইতে লাগিল,—তর্ক ও বাক্‌বিন্যাস তিরোহিত হইয়া যাইল। তখন শশী মহারাজ শান্ত হইয়া বলিলেন, "ছাখ্‌ ওসব বই কখন পড়্‌বিনি। যাঁহারা মহাপুরুষ, জগৎগুরু, যাঁহাদের পায়ের ধূলা নিলে লোক পবিত্র হয়ে যায়, তাঁদের আবার বিচার করা? আর কে কত বড় সেই নিয়ে আবার তর্ক করা? লিখ্‌বে কে? না একটা সামান্য লোক যে মহাপুরুষদের কণামাত্র সাধনা করে নাই! তার কথা শুনিয়া উচ্চ অবস্থার সাধক জগৎ-গুরুদের

বর্ত্তমান লেখককে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ভৎর্সনা করা।

নিন্দা করা—এতে মহাপাপ হয়।" কথাটী অতি সত্য। বর্ত্তমান লেখক একেবারে লজ্জিত হইয়া পড়িলেন এবং মনে মনে মহাপুরুষদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সেই অবধি মহাপুরুষদের লইয়া আর তর্ক করেন নাই এবং অপর কেহ করিতে আসিলে শশী মহারাজের উপখ্যানটি তাহাকে বলেন। শশী মহারাজের ন্যায় মহাপুরুষের সামান্য কাজের ভিতর থেকেও এক প্রগাঢ় উপদেশ পাওয়া যায়।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও সুরেশচন্দ্র মিত্র

বরাহনগর মঠের অবস্থানের শেষ ভাগেতে সম্ভবতঃ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বর্ষাকালে সুরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের উদরী রোগ হইল এবং তাহাতেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। সকলেই আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছিলেন, শুধু শশী মহারাজ বরাহনগর মঠ ছাড়িয়া আসেন নাই। সুরেশ বাবুর শশী মহারাজকে দেখিবার বড় আকাঙ্ক্ষা হইল, এইজন্য শশী মহারাজ একেবারে যাতায়াতের গাড়ী ভাড়া করিয়া সুরেশ বাবুকে দেখিতে আসেন। ঘণ্টা খানেক থাকিয়া আবার মঠে ফিরিয়া যান। তাহার পর তিনি বড় একটা কলিকাতায় আর আসেন নাই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগ হইয়াছে এ কথা তাঁহার ভাল লাগিত না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদে সূক্ষ্ম শরীরে উপস্থিত আছেন। এইজন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহী অবস্থায় যে সকল সেবা করিয়াছিলেন, শশী মহারাজ সাধ্যানুযায়ী ঠিক সেই সকল কার্য্য করিতেন। এরূপ

প্রত্যক্ষ গুরুভক্তি সহসা দেখা যায় না। একদিন আলমবাজারের মঠে বড় গরম পড়িয়াছিল, শশী মহারাজ পশ্চিম-দক্ষিণ কোণের ঘরে শুইয়া আছেন এবং নিজেকে পাখার বাতাস করিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবেরও ত এই প্রকার গরম বোধ হইতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া ঘরে গিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অবশিষ্ট রাত্র পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। এরূপ আশ্চর্য্য গুরুসেবা জগতে অতি বিরল।

রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীর গুরুভক্তি।

শশী মহারাজের তীর্থ পর্য্যটনের কোনই আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবা করাই তীর্থবাস ও তপস্যা মনে করিতেন। "জয় গুরুদেব শ্রীগুরুদেব" এই কথাটী উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি বিভোর হইয়া প্রদীপ্ত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে থাকিতেন। সর্ব্ব তীর্থই তাঁহার ঠাকুরঘর ছিল। জপ বিষয়ে তিনি একান্তমনা ছিলেন। বরাহনগর মঠে প্রথম অবস্থায়, তখন শশী মহারাজ অল্প বয়স্ক, তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "এই ঠাকুরের সেবা লইয়াই আমি জীবন কাটাব, আর আমার অন্য কিছুই আবশ্যক নাই।" যথার্থই তাহা তিনি জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি অনবরত জপ করিতেন এবং সকলকেই জপ ধ্যান করিতে উপদেশ দিতেন। জপ ও গুরুসেবা এই দুইটি তাঁর প্রাণ ছিল।

বরাহনগরের মঠে যেরূপ অনাটন হইয়া ছিল আলম্-

বাজারের মঠে উৎসব উপলক্ষে সেইরূপ প্রচুর সামগ্রী আবার আসিতে লাগিল। এক একদিন মা অন্নপূর্ণা যেন দশ হাতে জিনিষ দিতে লাগিলেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ভক্তদের প্রতি ভালবাসা।

কলিকাতার বাজারের উৎকৃষ্ট সামগ্রী আনিয়া ভক্তেরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভোগাদি দিতে লাগিলেন। শশী মহারাজ সমাগত ভক্তবৃন্দকে পরিতোষ করিয়া আহার করাইতেন কিন্তু পরে অনেক জিনিষ উদ্বৃত্ত থাকিত। তিনি উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে সেই সকল উদ্বৃত্ত সামগ্রী প্রসাদ বলিয়া গৃহে লইয়া যাইতে বলিতেন এবং যাঁহারা সম্মত হইতেন তাঁহাদের সহিত জিনিষ পাঠাইয়া দিতেন,—ঘরে কিছুই রাখিতেন না। বালকের ন্যায় সব সময়ে হাস্য মুখে কথা কহিতেন এবং বালকের ন্যায় নানাপ্রকার রহস্য করিতেন। কিন্তু তাঁহার কথাবার্ত্তা ও হাস্য কৌতুকের ভিতর একটা মাধুর্য্যপূর্ণ গাম্ভীর্য্যভাব পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার হাস্য কৌতুকে অপরে হাস্য কৌতুক করিতে সাহস করিত না। বালকত্ব করিলেও তিনি খুব "রাসভারি" লোক ছিলেন। তাঁহার একটি প্রিয় জিনিষ ছিল,—কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মুড়ি খাইতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। একবার করে মুড়ি মুখে দিচ্ছেন, আর একবার করে কাঁচা লঙ্কায় কামড় দিচ্ছেন, যখন দুই চক্ষে জল আসিত তখন তাঁর কাঁচা লঙ্কা খাওয়া সাব্যস্ত হইত। তিনি রুটি লুচি খাইতে পছন্দ করিতেন না। ভাতই তাঁহার প্রিয় আহার ছিল এবং অধিক পরিমাণে খাইতে পারিতেন। 'উদ্বোধন' আফিসে যখন

তাঁহার শেষ অসুস্থ অবস্থা, ডাক্তারেরা তাঁহাকে দেড় সের মাত্র দুধ খাওয়াইয়া রাখিয়াছিল। একদিন বর্ত্তমান লেখক তাঁহাকে প্রাতে দর্শন করিতে যাইলে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ্‌ছ ভাই, শ্যালারা আমায় শুকিয়ে রাখ্‌ছে, আমায় মাত্র দেড় সের করিয়া দুধ দেয়। জানতো আমার সেই Royal morsel" (অর্থাৎ বড় থাবা করিয়া অন্নের গ্রাস) এই বলিয়া অঙ্গুলি বিস্ফারিত করিয়া তাঁহার অন্নের গ্রাসের নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। অগ্নি ও জল একসঙ্গে মিশাইলে যাহা হয় শশী মহারাজ তাহাই ছিলেন। প্রত্যক্ষজ্ঞানে গুরুসেবা করা কাহাকে বলে তাহাই তিনি নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া গিয়াছেন। যৌবনের প্রথম অবস্থায় তিনি কৃশ ছিলেন এবং গায়ের রং ফ্যাকাসে সাদা ও মুখে কোঁকড়ান দাঁড়ি ছিল, কিন্তু শেষ অবস্থায় তিনি স্থূলকায় হইয়া গিয়াছিলেন।

স্বামী সুবোধানন্দ

স্বামী সুবোধানন্দ বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বরাহনগর মঠে রহিলেন। বরাহনগর মঠে যেমন তিনি আপন সাধন-ভজন লইয়া থাকিতেন সেইরূপ আলমবাজার মঠেও সাধন-ভজন লইয়া রহিলেন। কখনও বা তিনি অন্যস্থলেও থাকিতেন। তাহার সকল বিষয় আমার বিশেষ স্মরণ নাই।

হরি মহারাজ বরাহনগরের মঠে অল্পদিন থাকিয়া তীর্থ-পর্য্যটন ও সাধন-ভজনের জন্য নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন বিচিত্র। একনিষ্ঠ সাধক এরূপ

অল্পই আজকাল জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বরাহ নগর মঠ হইতে বহির্গত হইয়া নানা তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া কিছুদিন বৃন্দাবনে বাস করেন। বৃন্দাবন হইতে কুসুম সরোবর, গোবর্দ্ধন প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন সাধন ভজন করিয়া এক সময়ে তিনি নন্দগ্রাম বর্ষানাতে অবস্থান করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বর্ষানায় অবস্থানকালে বৃন্দাবনের গঙ্গামায়ির সহিত দেখা করিয়াছিলেন। হরি মহারাজ যখন বর্ষানাতে গিয়াছিলেন তখনও তিনি জীবিতা ছিলেন। গঙ্গামায়ির বয়স তখন অধিক হইয়াছিল এবং দু-একটি স্ত্রীলোক তাঁহার সেবা করিত। গঙ্গামায়ি হরি মহারাজের পরিচয় পাইয়া বিশেষ আদর করিতেন এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতেন, "তুমি যখন এরূপ মহাপুরুষের আশ্রয় ও আশীর্ব্বাদ পাইয়াছ তখন তোমার পথ খোলা রহিয়াছে"। গঙ্গামায়ি হরি মহারাজকে সর্ব্বদা আশীর্ব্বাদ ও অভয়বাণী দিতেন। হরি মহারাজও গঙ্গামায়িকে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। তিনি বৃন্দাবন হইতে হৃষিকেশ প্রভৃতি উত্তরাখণ্ড পর্য্যটন করিয়া মিরাটে আগমন করেন এবং তথায় সকল গুরু-ভাই একত্রিত হইয়া কিছুদিন অবস্থান করিয়া পরে অন্য কয়েক যায়গা ভ্রমণ করিয়া আলমবাজার মঠে প্রত্যাগমন করেন।

গঙ্গামায়ি ও স্বামী তুরিয়ানন্দ

হরি মহারাজ অতি ধীর এবং অল্পভাষী; চাপল্য ও নিরর্থক বাক্যালাপ আদৌ পছন্দ করিতেন না। তাঁহার মেধা শক্তি অতি প্রখর ছিল; উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্র মুখস্থ বলিতে পারিতেন এবং শঙ্করাচার্য্য রচিত

তুরিয়ানন্দ স্বামীর পাণ্ডিত্য

গ্রন্থাদি অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রে তিনি একজন প্রধান অধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। তিনি এমন সুললিত কণ্ঠস্বরে শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করিতেন যে সকলেই তাহা শুনিয়া মোহিত হইয়া যাইত। শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থও তাঁহার বিশেষ আয়ত্ত ছিল। সাধক ও পণ্ডিত বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেন। বাঙ্গালা, ইংরাজী ও হিন্দী ভাষার গ্রন্থ হইতে তিনি ইচ্ছামত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিতে পারিতেন। বাঙ্গালা সাহিত্য খুব ভাল রকম জানিতেন এবং মেঘনাদবধ কাব্যখানি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। তিনি অভিমানশূন্য মহাত্যাগী সাধক ছিলেন। আলমবাজার মঠে তাঁহার কখনও ক্রোধ দেখিতে পাওয়া যাইত না। তিনি অতিশয় গম্ভীর এবং নিরবচ্ছিন্ন জপ-পরায়ণ ছিলেন। আহারে বসিয়াছেন, অন্নাদি দিতে সামান্য বিলম্ব আছে—তখনও জপ করিতেছেন, কিন্তু সে ভাব তিনি বাহ্যতঃ প্রকাশ করিতেন না। তিনি মহাশক্তিমান ছিলেন এবং সদাসর্ব্বদা আত্মগোপন করিয়া রাখিতেন। কিন্তু গম্ভীর বলিয়া যে হাস্য কৌতুক জানিতেন না তাহা নহে, আবশ্যক হইলে তিনি এমন হাস্য কৌতুক করিতে পারিতেন যে সকলে হাসিয়া লুটাপুটি খাইত, কিন্তু সেরূপ খুব অল্পই করিতেন। অধ্যয়ন ও জপ-ধ্যান এই দুইটা তাঁহার জীবনের প্রধান জিনিষ ছিল। সকলের সহিত তিনি সমভাবে মিশিতেন এবং কোন প্রকার নিজের প্রাধান্য রাখিতেন না। আলমবাজার মঠে একদিন তাঁহার



স্বামী তুরিয়ানন্দ

পরিধেয় বহির্বাসখানি একেবারে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। সেই ছিন্ন বসনখানি তিনি পরিধান করিয়া থাকিতেন, ঘটনা-ক্রমে কেহই তাহা বিশেষ লক্ষ্য করে নাই। বর্ত্তমান লেখক শশী মহারাজের নিকট তাঁহার ছিন্ন বসনের উল্লেখ করিলে সকলেই অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন এবং তৎক্ষণাৎ নূতন বস্ত্র তাঁহাকে পরাইয়া দিলেন। হরি মহারাজ নির্লিপ্ত ও সর্ব্বত্যাগী; তিনি স্নেহপূর্ণ মধুর বৈরাগ্যময় স্বরে বলিলেন,—"কেন তুমি সামান্য কথা নিয়া সকলকে চঞ্চল করিলে? বহির্বাস ছিঁড়ে গেছে তাহাতে ক্ষতি কি? কৌপীন্ ত আছে—তাহাতেই যথেষ্ট"। কথাগুলি এমন নিরভিমান বৈরাগ্যপূর্ণস্বরে বলিলেন যে তাঁহার ভিতরের নিভৃত ভাবগুলি যেন স্পষ্ট বোঝা গেল।

তুরিয়ানন্দ স্বামীর ত্যাগ

কথিত আছে মানবের মন যখন উচ্চ অবস্থায় উঠে তখন জগতের প্রত্যেক বস্তুতে সাম্যভাব দেখে এবং ব্রহ্মশক্তি তখন কণ্ঠ দিয়া বাহির হইলে তাহাকে নাদ বা শব্দ-ব্রহ্ম বলে। ইহাই মহাপুরুষের ভিতরকার উন্নত অবস্থার একমাত্র পরিচায়ক। হরি মহারাজের ভিতর এই সব শক্তি বিশেষভাবে লক্ষিত হইত। বেলুড় মঠে একবার শিবরাত্রি উপলক্ষে প্রায় ১৫০শত লোক সমবেত হইয়াছিল। Frank সেই বৎসর আমেরিকা থেকে নূতন আসে। রাত্রে শিবপূজার কালে সকলেই উল্লাসে "হর হর ব্যোম, হর হর ব্যোম" বলিয়া চীৎকার করিতেছিল, কিন্তু এত চীৎকারের মধ্যেও হরি মহারাজের কণ্ঠস্বর স্বতন্ত্র ও স্পষ্ট

.শুনা যাইতেছিল—যেন এ জাতীয় নয়, অন্য প্রকার শব্দ-তরঙ্গ চলিতেছিল।

হরি মহারাজ আমেরিকাতে কিছু বৎসর ছিলেন। তথায় বহু লোকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত এবং আপনাদিগকে তাঁহার আশ্রিত বলিয়া পরিচয় দিত। তিনি বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিয়া আমেরিকাতে যে সব মহৎ কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার কোন প্রকার উল্লেখ বা গর্ব্ব করিতেন না। তাঁহার কথাই ছিল,—"ঠাকুর, ঠাকুরের কার্য্য করিয়া থাকেন, মানুষ নিমিত্ত মাত্র"। তিনি অতি বালকভাবের এবং নিতান্ত অভিমানশূন্য লোক ছিলেন। রাস্তায় যখন তিনি একলা পায়চারী করিতেন তখন কখন কখন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহাকে না জানিয়া ফরমাজ বা আদেশ করিত। তিনি নির্ব্বিকার পুরুষ; শুনিবামাত্র আগন্তুক ব্যক্তির মনঃতুষ্টির জন্য তাহার কার্য্যটী তৎক্ষণাৎ করিয়া দিতেন। তাহার পর তাঁহার পরিচয় পাইলে লোকটী অপ্রস্তুত হইয়া পড়িত। এরূপ ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছিল। ধর্ম্ম জগতে উচ্চ চিন্তার অধিকারী যে কয়জন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন হরি মহারাজ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

তুরিয়ানন্দ স্বামীর নিরভিমান

কালীবেদান্তী বরাহনগর মঠ হইতে সাধন ভজন ও তীর্থ পর্য্যটন করিবার জন্য ৺কাশীধাম প্রভৃতি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া হৃষিকেশে গমন করেন। পুনরায় তথা হইতে নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া রাজপুতনা, দ্বারকা প্রভৃতি স্থান হইয়া আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসিলেন। আর কোন্

কোন্ স্থানে তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন বর্ত্তমান লেখক তাহা বিশেষ জানেন না। এই সময় বোম্বাই প্রভৃতি স্থানও তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। যাহা হউক আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসিয়া কালীবেদান্তী নিজের স্বভাবসিদ্ধ অধ্যয়নাদিতে মন নিবিষ্ট করিলেন। তিনি ভিতরকার মাঝের কক্ষটিতে আপন পুস্তকাদি লইয়া পাঠ ও সাধন-ভজন করিতেন। ইংরাজী দর্শনশাস্ত্র তিনি বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত ও ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের উপর তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। এই সময় তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি স্তোত্র রচনা করেন। সম্ভবতঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে এইটি প্রথম স্তোত্র। সংস্কৃত স্তোত্রটি অতি সুন্দর হইয়াছিল এবং এখনও উহা অনেকে পাঠ করিয়া থাকেন। আলমবাজারের মঠে প্রাতে কেহ কেহ চা পান করিতেন। পানকালে অনেকে সমবেত হইয়া নানাশাস্ত্র বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিতেন। একটা প্রশ্ন উঠিলে সকলেই নানা গ্রন্থ উল্লেখ করিয়া তাহার মীমাংসা করিতেন এবং ইহাতে সকলের বিশেষ উপকার হইত। অনেক সারগর্ভ কথা এই সময় হইত, একটি প্রশ্ন উঠিলে যতদিন না তাহার মীমাংসা হয় ততদিন সকলে মিলিয়া আলোচনা করিতেন, তাহাতে নানা গ্রন্থ পাঠের কার্য্য হইত।

অভেদানন্দ স্বামীর স্তোত্র রচনা

যদিও তর্ককালে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সকলেই দৃঢ়তা অবলম্বন করিতেন, কিন্তু পরস্পর এরূপ শ্রদ্ধা ও

সম্মান করিয়া কথা কহিতেন যে, তাহা এক আদর্শ শিক্ষাস্থল হইয়া উঠিত; অবজ্ঞার লেশমাত্র থাকিত না এবং সকলের মুখ থেকে নানা শাস্ত্রের কথা এক সময়ে পাওয়া যাইত। কালীবেদান্তী তর্কে বিশেষ পণ্ডিত ও নিপুণ লোক ছিলেন এইজন্য তিনি বিশেষ করিয়া প্রশ্নের মীমাংসা করিতে সমর্থ হইতেন।

একদিন তর্ক-বিতর্ক করিয়া সকলে লোচন ঘোষের ঘাটের পার্শ্বে অশ্বত্থগাছওয়ালা কয়লাওয়ালাদের ঘাটে চলিলেন। অশ্বত্থগাছের তলায় বসিয়া কালীবেদান্তী ও বর্ত্তমান লেখক ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পুস্তকালয়ের কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পুস্তকালয়ে অনেক গ্রন্থ ছিল এবং সেগুলি তখন বাজারে বিক্রয় হইবে। কালীবেদান্তী বলিল,—"যদি টাকা সংগ্রহ করা যাইত তাহা হইলে ঐ Libraryটা খরিদ করিবার চেষ্টা করা হইত"। বাবুরাম মহারাজ শিশি করিয়া তেল কয়লা-ওয়ালাদের ঘরে রাখিতেন। তিনি শিশিটি বাহির করিয়া অপরদিকে বসিয়া তেল মাখিতে লাগিলেন। অবশেষে সকলে জলে নামিয়া ঝাঁপা-ঝাঁপি করিতে লাগিলেন। তখন ভাঁটা ছিল, গরমী কাল, সম্ভবতঃ রবিবার হইবে, কারণ সান্ন্যাল মহাশয় আফিসে চাকরী করিতেন, তিনিও তখন উপস্থিত ছিলেন। সান্ন্যাল মহাশয় বর্ত্তমান লেখককে বলিলেন,—"অত ক'রে জলে ঝাঁপা-ঝাঁপি করিস্‌নি অসুখ ক'রবে।" বর্ত্তমান লেখক তাহা শুনিয়া ধীর হইয়া

স্বামী অভেদানন্দ ও বর্ত্তমান লেখক

স্নান করিতে লাগিলেন। পার্শ্বে তুলসী মহারাজ সাঁতার কাটিতেছিলেন, কিছুদূরে শরৎ মহারাজ গামছা দিয়া গা ঘসিতেছিলেন এবং সকলের চাপল্য দেখে মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। সান্ন্যাল মহাশয় বর্ত্তমান লেখককে বলিলেন, "ছাখ্ আমরাত মুখ্য-সুখ্য লোক তুইতো খুব লেখাপড়া করিস্, তা-তা-তা-আমার একটা কথা শোন, তুই-তুই-তুই-এই-এই-এই বরাহনগর ম-ম-মঠের স-ব বিষয়ের একটা কিছু লেখ্ দিকিনি, যা-যা হইয়াছে স-ব এক-একটা লিখে ফ্যাল দিকিনি"। সান্ন্যাল মহাশয় হর্ষিত বা উত্তেজিত হইয়া কথা কহিতে গেলে একটু তোত্‌লা হইয়া পড়িতেন। সান্ন্যাল মহাশয় গঙ্গায় গা ঘসিতে ঘসিতে এমন মিষ্ট স্নেহপূর্ণ স্বরে আদেশ করিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান লেখক মনে মনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট এই আশীর্ব্বাদ চাহিলেন, যদি সময় হয় তাহা হইলে যেন গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া সান্ন্যাল মহাশয় যাহা আদেশ করিতেছেন তাহা যেন পূর্ণ করিতে পারেন। বর্ত্তমান লেখকের মনে এই আদেশটি চিরকাল স্মরণ ছিল। এই গ্রন্থ লিখিবার এইটিই হইল মূল কারণ। এইজন্য এইস্থানে তিনি সান্ন্যাল মহাশয়ের চরণে প্রণাম করেন ও এই আশীর্ব্বাদ চান যেন তাঁহার আদেশমত গ্রন্থখানি সফল হয়। স্নানান্তে সকলে বেলা প্রায় ১২টার সময় আলমবাজারের মঠে আসিয়া প্রসাদ পাইলেন। কালীবেদান্তী ও বর্ত্তমান লেখক বাহিরের বড় ঘরের পশ্চিমদিকের প্রথম ও দ্বিতীয় দরজার

সান্ন্যাল মহাশয় ও বর্ত্তমান লেখক

মধ্যস্থিত স্থানটিতে একটা বালিশ মাথায় দিয়ে শয়ন করিলেন। বেলা ৩টার সময় হঠাৎ কালীবেদান্তীর হাত মুখ ফুলিয়া উঠিল। কালীবেদান্তী বর্ত্তমান লেখককে বলিলেন, "ভ্যাখ্ গা টা ফুলে উঠ্ল কেন?" ক্রমশঃ তাঁহার হাত, পা, মুখ ও সমস্ত শরীরই ফুলিয়া উঠিল এবং শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কেহই কিছু স্থির করিতে পারিল না, শেষে সকলের এমন ভয় হইল যে, বুঝি বা শরীরের চামড়া ফাটিয়া যাইবে বা মাথার শীর ছিঁড়িয়া যাইবে। সকলেই ভীত ত্রস্ত হইয়া উঠিল। অবশেষে ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায় বরাহনগর হইতে আসিয়া আশুরক্ষা হয় এরূপ কোন ঔষধ দিয়া পীড়ার কারণ নির্ণয় করিতে লাগিলেন। যদিও শরীরের ফোলা দুদিন বাদে কমিয়া গেল, কিন্তু দিন কতক পরে পায়ের পাতার উপর একটা ফোস্কা উঠিল, পরে ফোস্কা ভিতর থেকে ছিঁড়িয়া গেলে একটি সাদা সরু চুলের-মত দেখা গেল। সেটিও ক্রমশঃ সরু সূতারমত হইল। টানিতে গিয়া ছিঁড়িয়া যাইল, ডাক্তারেরা অনেক গ্রন্থাদি দেখিয়া স্থির করিল যে ইহাকে tape worm অর্থাৎ সূতার মতন একরকম পোকা হইয়া সর্ব্বশরীর পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে কালীবেদান্তী আজমীর, পুষ্কর, রাজপুতনার অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন ইহা সেই দেশের জল দূষিত রোগ।

অভেদানন্দ স্বামীর শরীর ফোলা

ডাক্তারেরা দুই তিনটী স্থানে অস্ত্র করিয়া কালী-

বেদান্তীর পীড়ার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, এবং দুই-খানি পাতলা কাঠ উচ্চ করিয়া তাহার উপর নেইল বা ফিতা লম্বা করিয়া তাহার উপর পালকের গদি দিয়া রোগীর পা রাখিয়া দিলেন। কলিকাতার ডাক্তারেরা এ পীড়ার পূর্ব্বে চিকিৎসা না করায় সকলেই ভীত হইয়াছিলেন, পরে জানিতে পারা গেল যে এ রোগ রাজপুতনায় সচরাচর হইয়া থাকে, ইহাকে নেহারু রোগ বলে। বৃন্দাবনে ইহা অনেক দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহার একমাত্র ঔষধ হইতেছে হিং খাওয়া ও ক্ষতস্থানে হিং লাগান।

অভেদানন্দ স্বামীকে সারদানন্দ স্বামীর শুশ্রূষা

পীড়াকালে শরৎ মহারাজ কি আশ্চর্য্যরূপে প্রাণ দিয়া শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। তিনি অপরকে বলিতেন এই পীড়ার বীজ অন্যের গায়ে লাগিলে তাহারও এই পীড়া হইবার সম্ভাবনা, এইজন্য তিনি ক্ষতস্থানে ধোয়াইবার সময় অন্য কাহাকেও নিকটে যাইতে দিতেন না। শরৎ মহারাজ নিজের প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া রোগীর সমস্ত কার্য্য করিতেন। এইরূপে প্রায় তিন মাস তিনি সেবা করিয়াছিলেন, তখন রোগীর চিকিৎসাই তাঁহার জপ, ধ্যান, সাধনভজন হইয়াছিল। কি স্নেহভাবে, কি যত্নে, কি ঐকান্তিক ভালবাসা দেখাইয়া শরৎ মহারাজ কালীবেদান্তীর শুশ্রূষা করিয়াছিলেন তাহা বলিবার কথা নয়। রামকৃষ্ণমিশনের যে সেবাভাব প্রচলিত হইয়াছে ইহা শরৎ মহারাজ তাঁহার জীবনে তখন দেখাইয়াছিলেন।

বস্তুতঃ শরৎ মহারাজের পাহাড় থেকে বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসা হইতে ১৮৯৬ সালে মার্চ্চ মাসে ইউরোপ যাত্রা পর্য্যন্ত এই সময়টি যদিও সাধারণের অজানা, কিন্তু এই সময়েই শরৎ মহারাজ যথার্থ সাধন, ভজন ও তপস্যা করিয়াছিলেন। সর্ব্বদাই দেবভাবে তিনি পরিপূর্ণ থাকিতেন এবং মন উচ্চস্তরে থাকিত। ভালবাসা দিয়া আকর্ষণ শক্তি তাঁহার খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, অনেকে শরৎ মহারাজের নিকট থাকিতে ও তাঁহার সাথে কথাবার্ত্তা কহিতে বিশেষ ইচ্ছা করিতেন। সাধন ভজন সম্বন্ধে এই সময়টী তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

অভেদানন্দ স্বামীকে সারদানন্দ স্বামীর হাঁটাইবার চেষ্টা

কালীবেদান্তীর পা-টি সর্ব্বদা প্রশস্ত করিয়া একভাবে রাখায় পায়ের মাংসপেশী সকল ক্ষীণ হইয়া গেল। যদিও পীড়া আরোগ্য হইল, কিন্তু চলিবার ক্ষমতা রহিল না। ডাক্তারেরা পরামার্শ দিল যে, যে কোন রকম উপায় করিয়া রোগীকে একটু করিয়া চলান আবশ্যক, তাহা না হইলে পাখানি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। একদিন বৈকালে ৪টার সময় শরৎ মহারাজ কালীবেদান্তীকে খুব আদর করিয়া হাতে একটী লাঠি দিয়া ধরিয়া ধরিয়া বাহিরের সিঁড়ি দিয়া নামাইয়া নীচের উঠানে লইয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ তাঁহার সাথে বসিয়া খুব আদর করিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। হঠাৎ শরৎ-মহারাজ উপরে দৌড়িয়া চলিয়া আসিয়া কালীবেদান্তীকে

একলা উপরে আসিতে বলিলেন। কালীবেদান্তী নিজকে অসমর্থ ও চলচ্ছক্তি বিহীন মনে করিয়া কাকুতি মিনতি ও রোদন করিতে লাগিলেন। শরৎ মহারাজ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বড়ঘরের সামনের বারাণ্ডা থেকে কালীবেদান্তীকে নির্ম্মমভাবে অতি কঠোর বচনে গালি দিতে লাগিলেন। কালীবেদান্তী প্রথমে নীচে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাহাতে কেহ কর্ণপাত করিল না দেখিয়া অবশেষে ভয়ানক ক্রোধান্বিত হইয়া অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে সিঁড়ি দিয়া স্বয়ং উঠিয়া আসিলেন। শরৎ মহারাজ, সান্ন্যাল মশাই, তুলসী মহারাজ ও শশী মহারাজ তাহাতে সকলে হাসিতে লাগিলেন। শরৎ মহারাজ তখন আবার স্নেহপূর্ণ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "কালু ভাই রাগ করিস না, তোর ভালর জন্যেই করেছি, ডাক্তারেরা এইরূপ করিতে বলে গেছে ভাই, আমার কোন দোষ নাই"। তারপর থেকে কালী বেদান্তী লাঠি লইয়া নিজেই চলিতে আরম্ভ করিলেন।

অভেদানন্দ স্বামীর রোগ আরোগ্য হওয়া

ভবনাথ বন্দোপাধ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে সর্ব্বদা যাইতেন এবং নরেন্দ্রনাথের সমবয়স্ক হওয়ায় নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং আদর করিয়া "ভবু" বলিতেন। দেখিতে রং উজ্জ্বল, মুখ গোল ও ঈষৎ চেপ্টা এবং মুখে কাল কাল কোঁক্ড়ান দাড়ী, তাঁহার সম্মুখের উপরকার দুটি দাঁত একটু বাঁকা ছিল, তাঁহার বাড়ী বরাহনগর, অমায়িক ভক্তভাবের

লোক। প্রচণ্ডভাব তাহার কখনও দেখা যায় নাই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর ভবনাথের বরাহনগরের মঠে যাতায়াত অতি কম হইয়াছিল, তখন তিনি পুনরায় B. A. পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং কলিকাতায় বাদুড়বাগানের এক মেসে থাকিতেন। তাহার পর তিনি School Sub Inspectorএর কর্ম্ম লইয়া অপর স্থানে গিয়াছিলেন। এইজন্য বরাহনগরের মঠে আসিতে পারিতেন না, আলমবাজারের মঠে অবসর পাইলেই মাঝে মাঝে আসিতেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ করিয়া সকলের সহিত মিশিতেন।

ভবনাথ বন্দোপাধ্যায় ও কালীকৃষ্ণ

কালীকৃষ্ণ নামক তাঁহার জনৈক বন্ধু ছিলেন, বাড়ী বরাহনগর। তিনিও ভবনাথের সহিত মাঝে মাঝে আসিতেন ও আপনার লোকের ন্যায় সকলের সহিত মিশিতেন।

একদিন ভবনাথ বৈকালে আসিয়াছেন কিছু পরেই যাইতে ইচ্ছা করিলেন। সকলে কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন যে তাঁহার অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে সেজন্য বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছেন। সকলে বলিল, "উনুন ধরেছে, দুখানা রুটী খেয়ে যাওনা"। ভবনাথ রান্নাঘরের উত্তর দিকের দালানের কোণে অর্থাৎ ভিতরকার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া ডান দিকের দালানের প্রথম স্থানটিতে কালীকৃষ্ণর সঙ্গে বসিয়া একটু তরকারী দিয়া গরম রুটি এক এক খানা করিয়া মহানন্দে খাইতে লাগিলেন। দু-একখানা গরম রুটি খাইয়া ভবনাথের ভক্তিভাব

একেবারে প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি মেরুদণ্ড লম্বা করিয়া ধ্যান করার ভাবে বসিয়া ভক্তি গদগদ ভাবে বলিলেন, "Man cannot live on bread alone" অর্থাৎ যীশুর উক্ত কথাটি 'অন্নের উপরেই নির্ভর করিয়া মানুষের জীবন চলিতে পারে না।' কিন্তু বাইবেলের এই কথাটার অপর অংশ বলিবার পূর্ব্বেই সম্মুখে দণ্ডায়মান কালীবেদান্তী হাস্যচ্ছলে বলিলেন, "But upon bread and mutton" অর্থাৎ 'রুটির সঙ্গে ভাল তরকারী হলে একরকম বেশ চলে'। এই আর কি সকলে ভবনাথকে লইয়া হাস্য ও আনন্দ করিতে লাগিলেন। ভবনাথের ভক্তিভাব যদিও রহস্যে পরিণত হইল, কিন্তু সকলের ভিতর কিরূপ একটা বুক খোলা ভালবাসা ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল তাহাই সকলে অনুভব করিতে লাগিল। কথাটা তুচ্ছ হইলেও সকলের ভিতর যে কি একটা ঐকান্তিক ভালবাসা ছিল তাহাই বোঝা যাইত, সংযত আদব্‌কেতা দোরস্ত, পোষাকি ভাব কিছুই ছিল না, সকলেই অকপটে পরস্পরকে ভালবাসিত।

যজ্ঞেশ্বর চন্দ্র চন্দ্রের বাড়ী বাঁকুড়া জেলা কাঁক্‌টে গ্রামে। পূর্ব্বে দমদমার কোন Schoolএ শিক্ষকের কার্য্য করিতেন এবং মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে যাইতেন। দম্‌দম্‌ মাষ্টার একবার বলিয়াছিলেন, "কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন যে দেবস্থানে যাইলে অন্ততঃ এক পয়সার বাতাসাও যজ্ঞেশ্বর চন্দ্র চন্দ্র

লইয়া যাইতে হয়, রিক্ত হস্তে যাইতে নাই।” দম্‌দম্‌ মাষ্টার তদনুযায়ী এক পয়সার বাতাসা লইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কাছে যাইতেন, কারণ তিনি অল্প বেতন পাইতেন এইজন্য এক পয়সার বাতাসা লইয়া গিয়াছিলেন। বেতন সামান্য এইজন্য অধিক জিনিষ লইয়া যাওয়া সম্ভব ছিল না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বহুবিধ উৎকৃষ্ট আহার্য্য ত্যাগ করিয়া গরীব দম্‌দম্‌ মাষ্টারের বাতাসা খাইয়াছিলেন ইহা অনেক গ্রন্থেই আছে।

দম্‌দম্‌ মাষ্টারের মঠে থাকা

সম্ভবতঃ দম্‌দম্‌ মাষ্টারের সে চাকুরী যায়। তিনি বরাহ-নগরের মঠ স্থাপনের এক বৎসর পরে বরাহনগরের মঠে আসিয়া মাঝে মাঝে থাকিতেন এবং শিবানন্দ মহাপুরুষকে তাঁহার অবস্থার কথা জানাইলে, তিনি বরাহনগরের মঠে আহারের দিক্‌ দেখিবার জন্য তাঁহাকে বলেন এবং মঠে থাকিবার আদেশও করিয়াছিলেন। যাহা হউক দম্‌দম্‌ মাষ্টার কখনও বরাহনগরের মঠে কখনও বা অন্যত্র থাকিতেন। তাঁহার স্ত্রী ও তিনটী পুত্র ছিল। তাহাদের ভরণপোষণের জন্য বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়া উঠিল। এই সময় বরাহনগরে শশীপদ বন্দোপাধ্যায়ের ‘বিধবা আশ্রম’ বেশ চলিতেছিল এবং দম্‌দম্‌ মাষ্টারকে বেশ উপযুক্ত লোক বিবেচনা করিয়া তাহাকে বিধবা আশ্রমের অধ্যক্ষের কার্য্যে কর্তৃপক্ষরা নিযুক্ত করিল। এই স্থানে তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় যশের সহিত কার্য্য করিয়া কয়েক বৎসর পরে কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। দম্‌দম্‌

মাষ্টার তখন আলমবাজার মঠের কাছে নিজের বাসা ঠিক করেন এবং অবসর পাইলেই মঠে আসিয়া সকলের সেবা শুশ্রূষা ও আবশ্যকীয় সকল কার্য্যই করিতেন। সকলেই তাঁহাকে স্বগোষ্ঠির মধ্যে গণ্য করিতেন।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী ভবানীপুর। নরেন্দ্রনাথের সহপাঠি না হইলেও সমসাময়িক পাঠি ছিলেন। ১৮৯১ সালে ইনি হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন এবং শনিবার ও রবিবার এমন কি অন্য দিনেও বিশেষ কার্য্য না থাকিলে আদালতের কাপড় পরিয়াই অর্থাৎ চোগা চাপকান পরিয়াই আলমবাজারের মঠে চলিয়া আসিতেন। প্রায় দুই বৎসর তিনি সর্ব্বদাই আলমবাজারের মঠে যাতায়াত করিতেন। তুলসী মহারাজ ও শরৎ মহারাজের সহিত ইহার বেশী হৃদ্যতা ছিল। ইনি কখন কখন ভিতর বাড়ীর পূর্ব্ব উত্তর কোণের ঘরটীতে যেখানে ঠাকুরের ভাণ্ডার ছিল অর্থাৎ পূজার দ্রব্যাদি থাকিত তথায় বসিয়া বেশ ভক্তিভাবে ঠাকুরের ফুলের মালা তৈয়ারি করিতেন, কখন কখন চন্দন ঘষিতেন, কখন বা তাঁহাকে দিয়া যাহা হইতে পারিত এরূপ কার্য্য করিতেন। যে কয়দিন তিনি আলমবাজার মঠে থাকিতেন, প্রাতে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেন ও ঠাকুর ঘরে বসিয়া ঠাকুরের পূজার কোন কোন সামগ্রী গুছাইয়া দিতেন এবং অপর সময়টী জপ করিতেন। রাত্রে শয়ন কালে তিনি বাইরের বড় ঘরের ভিতর যে ছোট ঘরটি আছে তথায় শুইতেন

এবং তুলসী মহারাজও এক একদিন তাঁহার পাশে কম্বল বিছাইয়া শুইতেন। সতীশ মুখোপাধ্যায় এই সময় অনেক রাত্র পর্য্যন্ত জপ করিতেন। তুলসী মহারাজ মাঝে মাঝে বলিতেন, "ও সতীশ রাত অনেক হলো এখন একটু ঘুমাও, সমস্ত রাত জপ করলে ঘুম হবে না"। তাঁহার আহার অতি অল্প ছিল। একটি বাটীতে একটু ঝালের ঝোল ভাত দিয়া খাইতেন এবং এক সূর্য্যে দুবার অন্ন গ্রহণ করিতেন না বলিয়া রাত্রে একটা বাটি করিয়া অল্প পরিমাণে দুধ-ভাত খাইতেন। তখন তাঁহার স্বভাব বালকের মত হইয়াছিল। দেহ কৃশ, রং উজ্জ্বল, মুখ কিঞ্চিৎ লম্বা, চলন একটু ডাইনে বাঁয়ে হেলিয়া এবং কথায় জিবের একটু আড় ছিল। মুখে কোঁকড়ান কোঁকড়ান অল্প দাড়ী। তিনি কখন কখন বৈকালবেলা কোঁচার কাপড়টি কোমরে ফেট্টি করিয়া বাঁধিয়া খালি গায়ে পূর্ব্বদিকের রান্না ঘরের উপর যে ছাতটি ছিল তথায় মেঝের উপর শুইয়া থাকিতেন এবং স্থির নেত্রে কোন বিষয় ভাবিতেন। মুখে খালি সাধন ভজনের কথা লাগিয়া থাকিত অন্য কথা বড় কহিতেন না।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জপ-ধ্যান

একদিন গিরিশ বাবু আলমবাজার মঠে যান। গরম-কাল, রবিবার আহারের পর একটু বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করিলে উপরকার ঘরগুলা বড় গরম হওয়ায় তুলসী মহারাজ বাইরের বড় ঘরের নীচেকার এঁদো ঘরটি পরিষ্কার করিয়া মাদুর পাতিয়া রাখিয়াছিলেন এবং একখানি বড়

এড়ানি পাখাও তথায় রাখিয়াছিলেন। অনেকেই গিয়া সেই ঘরটির ভিতর শুইয়া রহিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বিষয় কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল; সতীশ মুখুজ্জ্যে উঠিয়া এড়ানি পাখাখানি লইয়া সকলকে বাতাস করিতে লাগিলেন। তুলসী মহারাজ সতীশ মুখুজ্জ্যের কষ্ট হইতেছে বিবেচনা করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। সতীশ মুখুজ্জ্যে অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, "আমি আর সকলের বিশেষ কি সেবা করতে পারি? একটু বাতাস করে লোকের সেবা করতে পারব না?" এমন সবিনয়ে কথাগুলি বলিলেন যে সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া গেল। গিরিশ বাবু শুনিয়া বলিলেন, "সতীশ তুমি বাতাস কর, তুলসী তুমি ওর ভক্তির উপর হাত দিওনা, যখন ভক্তি করে সেবা কচ্ছে করুক"। সতীশ মুখুজ্জ্যে তখন অতি সংযত ও ভক্তিপূর্ণ ভাবে দাঁড়াইয়া বড় এড়ানি পাখাখানি লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর পর তিনি "Dawn" নামক মাসিক পত্র বাহির করিলেন এবং তদবধি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের সহিত আর বিশেষ কিছু সংশ্রব রাখিলেন না।

সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সেবা ভাব

বাবুরাম মহারাজ বরাহনগর মঠে যেমন সাধন ভজন করিতেন আলমবাজার মঠে ততোধিক সাধন ভজন করিতে লাগিলেন। অনেক দিন মধ্যাহ্নে আহারের পর মাথায় গামছাখানি ঢাকা দিয়া, কোঁচার কাপড় খানি গায়ে দিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া পঞ্চবটিতে বসিয়া জপ

করিতেন এবং বিকাল বেলা ফিরিয়া আসিতেন। বাবুরাম মহারাজ এ সময় গৈরিক বসন পরিধান করিতেন না, সাদা কাপড় পরিতেন এবং সন্ন্যাসীর বাহ্যিক কোন চিহ্ন রাখিতেন না। কালীবেদান্তী অতি সতর্ক লোক, বাহিরের সিঁড়ির কাছে রাস্তার দিকে যে জানালাটি ছিল সেইখান থেকে বাবুরাম মহারাজকে বাহির হইতে দেখিয়া বলিতেন, "বাবুরাম এবার চরা করতে বেরুল, আর কি—দিন কাটিয়ে আসবে। পাতলা উজ্জ্বল বর্ণ যুবা বাবুরাম মহারাজ তখন অতি দীন হীন নিরভিমান শান্ত ভালমানুষটী ছিলেন। সকলের কাছেই বিনীত এবং যেন সকলের কাছেই কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন। সেই সময় তাঁহার ভাব এত নম্র ও বিনীত হইয়াছিল যে তাঁহাকে দেখিলে লোকের মনে কষ্ট হইত। একেবারে যেন সকলের চেয়ে শান্ত ও নরম এবং তাঁহাকে কোনরূপ গালাগালি করিলেও তিনি তাহার কোন জবাব দিতেন না।

স্বামী প্রেমানন্দ

গরমকালে অনেকবার বাবুরাম মহারাজ বর্ত্তমান লেখককে সঙ্গে লইয়া অপরাহ্নে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘর ও পঞ্চবটিকে প্রণাম করিয়া অবশেষে বড় ঘাটটিতে উভয়ে আসিয়া বসিতেন এবং জলে পা ডুবাইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিষয় আলোচনা হইত। কথাবার্ত্তায় উভয়ে এমন উন্মনা হইয়া যাইতেন যে অনেক সময় রাত্রি ৯টা ১০টা বাজিয়া যাইত। বাবুরাম মহারাজের তখন কি সরল প্রাণ, কি অমায়িক ভাব, কি

বালকের মত স্বভাব! দেহ ধারণের জন্য আহার করিতে হয়, তাই সামান্য আহার করিতেন। কোন বিষয়েই আকাঙ্খা বা স্পৃহা নাই; কেবলমাত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব পঞ্চবটিতে বসিয়া যেরূপ সাধন ভজন করিয়াছিলেন তাহাই জীবনে উপলব্ধি ও প্রতিফলিত করিবার চেষ্টাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছিল। যদিও তিনি বাহ্যতঃ কিছু প্রকাশ করিতেন না কিন্তু অন্তরে সে বিষয় উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কালীবাড়ীর কোন্ স্থানে বসিয়া কোন্ কথাগুলি কাহাকে বলিয়াছিলেন বর্ত্তমান লেখককে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতেন। প্রেমানন্দ স্বামীর পঞ্চবটিতে গমন

একদিন রাত্রি ৯ বা ১০টার সময় দুইজনে আলমবাজারের মঠে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে সদর দরজা বন্ধ। এতরাত্র পর্য্যন্ত বাহিরে থাকায় নিরঞ্জন মহারাজ রাগিয়া গিয়াছেন, তিনি উভয়কেই বাড়ীতে ঢুকিতে নিষেধ করিলেন। বর্ত্তমান লেখক তখন আব্দার ধরিলেন,—"বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, আর থাকতে পারিনা।" নিরঞ্জন মহারাজ তখন হাসিয়া ফেলিলেন এবং সস্নেহে বলিলেন— "আয় ভিতরে আয় আমার জন্য আলুভাতে হয়েছিল তাই আমি তোর জন্যে খানিকটা রেখে দিয়েছি। ও শ্যালা বৈরাগীকে ঢুক্‌তে দিস্‌নে। শ্যালা বৈরাগী কেবল এখানে ওখানে লুকিয়ে বেড়াবে, জপ ধ্যান কি আর এখানে বসে হয় না?" বড় ভাইয়ের নিকট ছোট ভাই যেমন শঙ্কিত হইয়া থাকে বাবুরাম মহারাজ সেইরূপ লজ্জিত

ও নির্ব্বাক হইয়া সেই রাত্রে কিছু খাইয়া, এক যায়গায় একান্তে বসিয়া জপ ধ্যান করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে উস্ খুস্ কর্চ্ছেন তাহাতেই বোঝা গেল যে নিদ্রা হয় নাই। কারণ তখন রাত্রে জপ করাই সকলের মধ্যে প্রথা ছিল, ঘুমিয়ে রাত কাটান দোষনীয় বিবেচনা হইত।

নিরঞ্জনানন্দ স্বামীর প্রেমানন্দ স্বামীকে ভৎসনা করা

একদিন বাবুরাম মহারাজ বর্ত্তমান লেখকের সহিত চৈতন্যচরিতামৃত সম্বন্ধে নানাবিধ কথা কহিতে লাগিলেন। প্রসঙ্গক্রমে কথা উঠিল যে চৈতন্য মহাপ্রভু বরাহনগরে আসিয়াছিলেন। হটাৎ দুইজনার ইচ্ছা হইল যে সেই স্থানটি দর্শন ও প্রণাম করিয়া আসে। বাবুরাম মহারাজ পূর্ব্ববৎ মাথায় গামছাখানি চারপাট করিয়া দিয়া বহির্গত হইবার চেষ্টা করিতেছেন, বর্ত্তমান লেখকও সঙ্গে যাইবে; এমন সময় কালীবেদান্তী বাবুরাম মহারাজকে বলিলেন, "বৈরাগীর পেটে ভাত পড়লো—আর কি—ভাত হজম করতে হবে ত, তাই চরা কর্‌তে বেরোচ্ছ। বলি ও ছোঁড়াটাকে এত রৌদ্রে ঘোরাচ্ছ কেন? নিজে রৌদ্রে ঘুরে মর্‌বে, তা মরগে যাওনা; আবার ওটাকে ঘোটাচ্ছ কেন?" যাহা হউক উভয়ে নির্গত হইলেন। তখন মালি-পাড়ায় চৈতন্য মহাপ্রভুর স্থানটি একেবারে ধ্বংশ হইয়া গিয়াছিল। বাড়ীর অধিকাংশ স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সাধারণ লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কিছু বলিতে পারিত না। দুইজনে দুপুরবেলা রৌদ্রে অনেক

ঘুরিয়া স্থানটিও আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া মণি মল্লিকের গঙ্গার ধারের বাগান "তটিনী কুটীরে" প্রবেশ করিলেন। ভাগ্যক্রমে মণি মল্লিক সেদিন বাগানে গঙ্গার ধারের বৈঠকখানা ঘরে উপস্থিত ছিলেন। বাবুরাম মহারাজের সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। মণি মল্লিক বলিলেন,—"আমরা সংসারী লোক—ভোগ বিলাসে থাকি—আমাদের আবার মুক্তি কোথায় হবে। আর আপনারা সাধু সন্ন্যাসী—যেন কামধেনু, সামান্য জটেবুড়ি (জড়িবুটি) খেয়ে অমৃত-দুধ দিয়া থাকেন। জটেবুড়ির কথা শুনিয়া উভয়ের হাসিতে হাসিতে পেট ফুলিয়া উঠিল। কিন্তু বাহ্যিক ধৈর্য্য ধরিয়া বেশ ভক্তির সহিত আবার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। বাহিরে আসিয়া দুইজনে জটেবুড়ির কথা লইয়া হাসিতে হাসিতে আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

প্রেমানন্দ স্বামী ও মণি মল্লিক

বরাহনগরের মালিপাড়ার যে ভাঙ্গা বাড়ীতে চৈতন্য মহাপ্রভুর আগমন হইয়াছিল কয়েক বৎসর পরে জঙ্গল কাটিয়া সেই স্থানটি কিঞ্চিৎ পরিমাণে মেরামত করা হয়। বর্ত্তমান লেখক একবার দর্শন করিতে যান। উপস্থিত অধ্যক্ষেরা অতি যত্ন করিয়া বর্ত্তমান লেখককে চৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যবহৃত "খড়ম" দেখাইলেন। ইহা কেবল মাত্র পাতলা দুখানি কাঠ, খড়মের বোগ্‌লো ছুটি ছিল না। চৈতন্য মহাপ্রভু যেখানে বসিয়া ভাগবত পাঠ শুনিতেন সেই স্থানটি একটি বেদীর মত বাঁধান রহিয়াছে

এবং যে ভাগবত খানি শুনিতেন তাহা অদ্যাপিও সংরক্ষিত আছে কিন্তু কাগজ গুলি টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যাওয়ায় একটি পুঁট্‌লিতে করে বাঁধা ছিল। পাতাগুলা যেন মুড়ির মত হয়ে গেছে, খুলিলেই ক্ষুদ্র অংশগুলি পড়িয়া যাইবে। বর্ত্তমান লেখক সমস্ত স্থানগুলি ও বস্তুগুলিকে প্রণাম ও মস্তকে স্পর্শ করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

একদিন শীতকালের প্রথমে বাবুরাম মহারাজ বর্ত্তমান লেখককে সঙ্গে লইয়া আলমবাজারের গ্রামের ভিতর বেড়াইতে যাইলেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি খুব তন্ময় হইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা কহিতেছিলেন। পথিমধ্যে একখানি গোল পাতার ঘরের চালে লাউ ও লাউ ডগা দেখিতে পাইলেন। বর্ত্তমান লেখক বলিলেন, "ডগাগুলী যেন ল-ল কচ্ছে, লাউডগা ভাতে দিয়ে খেতে বড় ভাল লাগে।" বাবুরাম মহারাজ এত সরল ও অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন যে, এই কথা শুনিয়া নিঃসঙ্কোচে সেই গোলপাতার বাড়ীতে ঢুকিয়া একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোককে বলিলেন, "ত্তাখ, তোমাদের লাউডগা বেশ হয়েছে, আমাদের কিছু দাও—আমরা ভাতে দিয়ে খাব।" তিনি এমন সরল ও মিষ্টবাক্যে কথা কহিলেন যে স্ত্রীলোকটি অতি আগ্রহে ব্যস্তসমস্ত হইয়া লাউডগা কাটিয়া বাবুরাম মহারাজকে দিলেন। বাবুরাম মহারাজের কণ্ঠস্বরে এমন একটি স্নিগ্ধ আকর্ষণী শক্তি ছিল যে স্ত্রীলোকটি ভক্তি করিয়া বাবুরাম

প্রেমানন্দ স্বামীর সরল ভাব

মহারাজকে লাউডগা দিয়া কৃতার্থ মনে করিলেন। ইহাকেই বলে দেবভাব সর্ব্ববস্তুকে আকর্ষণ করে।

শীতের প্রথমে নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার গুরুভাইদিগের পরিচিত মীরাট নিবাসী জনৈক ভদ্রলোক বালী হইতে নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া সন্ধ্যার সময় আলমবাজার মঠে আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি ক্লান্ত ও শীতার্ত্ত হইয়া বড় ঘরটিতে আসিয়া বসিলেন। মুখ হাত পা ধুইয়া ঠাকুর ঘরে প্রণাম করিয়া পুনরায় পূর্ব্বস্থানে বসিলে বর্ত্তমান লেখক তাঁহাকে একবাটি চা আনিয়া দিলেন। তিনি চা পান করিয়া পরিতুষ্ট হইয়া বর্ত্তমান লেখকের সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন এবং অপর সকলের সহিতও বন্ধুভাবে সসম্মানে কথা কহিতে লাগিলেন। অনেকের পরিচিত থাকায় সকলেই তাঁহাকে যত্ন করিতে লাগিলেন। কথাপ্রসঙ্গে জানা গেল যে ইঁহার নাম যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্যাগী ভক্তেরা যখন মীরাটে ছিলেন তখন তাঁহাদের সহিত বিশেষ হৃদ্যতা হইয়াছিল। যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়

১৯০৫ বা ১৯০৬ সালে খেতড়ি মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারি ও স্বামিজীর শিষ্য মুন্‌সি জগমোহন লাল অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত মাড়োয়ারী ভদ্রলোক ও একটি সাধুকে লইয়া বেলুড় মঠে আসেন। সাধুটীর গৈরিক বসন, কাঁধ পর্য্যন্ত লম্বা চুল, জীর্ণ শীর্ণ কলেবর, চক্ষু উজ্জ্বল এবং হাতে ছোট একটি বেতের ছড়ি ছিল।

গঙ্গারদিকের দক্ষিণ কোণের ঘরটিতে আসিয়া সকলে বসিয়াছেন এবং সাধুটি হাঁটুদুটি উঁচু করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া এদিক্ ওদিক্ নিরীক্ষণ করিতেছেন। বর্ত্তমান লেখক মাড়োয়ারী দেশীয় সাধু বিবেচনা করিয়া প্রণাম করিয়া হিন্দিতে কথা কহিবার উপক্রম করিলে সাধুটি তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট ও স্নেহপূর্ণস্বরে কহিলেন, "মহীন কেমন আছ?" এইরূপ ভাবে সম্ভাষণ করিতে শুনিয়া বর্ত্তমান লেখক চমকিত হইয়া উঠিলেন। সাধুটি বলিলেন, "আমায় চিন্তে পাচ্ছ না? মীরাট থেকে সেই আলমবাজারের মঠে এসেছিলুম, তুমি রাত্রে আমায় চা করে খাওয়ালে,—আমি সেই যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়।" উক্ত পরিচয়ে উভয়ে পরম প্রীত হইলেন এবং অন্যান্য সকলের সহিত নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। তাঁহার বর্ত্তমান নাম স্বামী জ্ঞানানন্দ,—কাশীধামে "ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলীর" অধিনায়ক।

স্বামী জ্ঞানানন্দ ও বর্ত্তমান লেখক

একটু শীত পড়িয়াছে। কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত উকিল ৺দাশরথি সান্ন্যাল তখন যুবক, নরেন্দ্রনাথের সহপাঠি ও বিশেষ বন্ধু ছিলেন। একদিন সন্ধ্যার পর খুব হর্ষিত হইয়া বড় ঘরটিতে আসিয়া বসিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে এক ইংরাজ থিয়েটারের দল Corinthian Theatre ভাড়া লইয়া Shakespeareএর Merchant of Venice অভিনয় করে,—সেই বিষয়ের আলোচনা হইতেছিল। দাশরথি সান্ন্যাল সহসা উল্লসিত হইয়া উঠিলেন

এবং গঙ্গাধর মহারাজ তিব্বত থেকে যে পশমের লম্বা জামাটি পরিয়া আসিয়াছিলেন সেই জামাটি গায়ে দিয়া কোমরে একখানা কাপড় জড়াইয়া Shylockএর পালাটি মুখভঙ্গি, কণ্ঠস্বর ও চোখের চাহনি নানারূপ পরিবর্ত্তন ও হস্ত সঞ্চালন করিয়া এমন সুন্দরভাবে অভিনয় করিতে লাগিলেন যে, তাহা দেখিয়া সকলেই তাঁহার নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অভিনয় কার্য্যে তিনি অশিক্ষিত হইলেও এরূপ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন যে, তাহা দেখিয়া সকলের বোধ হইতেছিল যেন তাঁহারা প্রকৃত রঙ্গালয়েই উপস্থিত আছেন।

দাশরথি সান্যালের অভিনয়

চৌধুরী মহাশয় যোগেন মহারাজের পিতা। দক্ষিণেশ্বরের সাবর্ণ চৌধুরীদিগের একজন কর্ত্তা। ইহাঁরা ব্রাহ্মণ ও প্রাচীন মাননীয় বংশ। কথাবার্ত্তায় চৌধুরী মহাশয় বিশেষ নিপুণ এবং কৌতুকরহস্যে তাঁহার অসীম ক্ষমতা ছিল।

আলমবাজারের মঠ দক্ষিণেশ্বর গ্রামের সন্নিকটে হওয়ায় চৌধুরী মহাশয় কখন প্রাতে, কখন বৈকালে আসিয়া সকলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া যাইতেন। দেখিতে দীর্ঘকায়, বর্ণ সাধারণ, শরীর দোহারা, পেট বসা এবং মেরুদণ্ড সম্মুখের দিকে কিছু বক্র ; উভয় কর্ণ কিছু লোমযুক্ত, এবং ভ্রূদ্বয় প্রশস্ত ও লোমযুক্ত। মস্তক সর্ব্বদাই এদিক ওদিক সঞ্চালন করিতেন এবং চক্ষুদ্বয় সতর্ক। বামস্কন্ধে একখানি কোচান চাদর, পরিধানে একখানি মলমল থান, বক্ষঃস্থলে যজ্ঞোপবীত, হাতে

কখন একটা লাঠি বা ছাতি থাকিত, কোঁচার ডগাটা বাঁদিকের কসিতে গোঁজা। চৌধুরী মহাশয় আলমবাজারের মঠে আসিলে যোগেন মহারাজের পিতা বলিয়া সকলেই তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। তিনি আসিয়াই প্রথমে স্বরু করিতেন,—"আর আমার বেঁচে সুখ নাই; বাপের নামে বেটার পরিচয় হয়, আর আমার কিনা বেটার নামে বাপের পরিচয়! যেন নন্দ ঘোষের দশা!

চৌধুরী মহাশয় নন্দের বেটা কেউত বলে না, কেষ্টর বাপ নন্দই সকলে বলে থাকে। আর আমি যেখানে যাই সেখানে যোগের বাপ বলে সকলে সম্মান করে আর আমার বেটা যোগে কেউ বলে না। একেই বলে পোড়াকপাল।" তাহার পর কালীবেদান্তীর সহিত একবার একপালা হইত। চৌধুরী মশাই বলিতেন, "মা কালীইত সকলে বলে থাকে এ যে দেখি বাবা কালী" এইরূপ কালীবেদান্তীর সহিত কিছুক্ষণ হইত। তাহার পর নিতান্ত ভালমানুষ বাবুরাম মহারাজ কোঁচার কাপড় গায় দিয়ে সুমুখ দিয়া যখন যাতায়াত করিতেন তখন তাঁহার উপরও এক পালা হইত,—"ইনি দিদিবাবু না দাদাবাবু?" বাবুরাম মহারাজ হাস্যকৌতুকে অপ্রস্তুত হইয়া ঠাকুর ঘরের পার্শ্বের সিঁড়িটা দিয়া অনেক সময় সরিয়া যাইতেন। বর্ত্তমান লেখকের সহিতও বিশেষ হাসি তামাসা হইত। তিনি গল্প বলিতে সুনিপুণ ছিলেন। কলিকাতার বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত বাড়ীর সমস্ত গল্প অভিনয়চ্ছলে হুবহু বলিয়া যাইতেন। Lord Canningএর পত্নী

Lady Canningএর কিরূপ সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইয়াছিল, কিরূপে ইংরাজ ডাক্তারগণ চিকিৎসা করিতে লাগিল, সুবিখ্যাত ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় কিরূপে চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিয়া দিলেন—হস্ত সঞ্চালন ও নয়নভঙ্গী করিয়া তিনি অভিনেতার ন্যায় সুন্দরভাবে গল্পগুলি বিবৃত করিতেন। চৌধুরী মহাশয়ের ন্যায় গল্প বলিবার নৈপুণ্য অতি অল্প লোকেরই ছিল। অনবরত তিনি দুই তিন ঘণ্টা গল্প বলিয়া যাইতে পারিতেন এবং শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। তিনি নূতন প্রকার হাস্যকৌতুকের শব্দ রচনা করিতে পারিতেন এবং সেকালের ভট্টাচার্য্য-পণ্ডিতের মত সাধু ভাষাতেই কথা কহিতেন। সামান্য কথাতেও তিনি সাধু শব্দ ব্যবহার করিতেন। "কাপড় ভিজা" না বলিয়া "আর্দ্র বস্ত্র" বলিতেন, বৃদ্ধ না বলিয়া "স্থবির" বলিতেন। যাহা হউক তিনি সকলের বিশেষ শ্রদ্ধেয় ছিলেন এবং সর্ব্বদাই মঠে আসিয়া সকলকে দেখিয়া যাইতেন।

চৌধুরী মহাশয়ের হাস্য কৌতুক

হৃদু মুখুজ্জে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র কিছুদিন কাজ কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তাহার পর কাঁকুড়গাছি রামচন্দ্র দত্তের যোগোদ্যানে পূজারি নিযুক্ত হন কিন্তু নানা কারণবশতঃ সেই কার্য্য হইতে তাঁহাকে অপসারিত করা হইয়াছিল। তাহার পর তিনি তসরের কাপড়ের পুঁটুলি লইয়া পরিচিত বাড়ীতে বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেন। একদিন কাপড়ের পুঁটুলি লইয়া আলমবাজারের মঠের সম্মুখ দিয়া বেলা ৯৷৷০ বা ১০টার

সময় যাইতেছিলেন,—হঠাৎ তাঁহার মঠে একবার তামাক খাইয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। তিনি বড় ঘরটিতে পুঁটলিটি রাখিয়া ভিতর বাড়ীতে আসিয়া ঠাকুর প্রণাম করিয়া শিবানন্দ স্বামীর কাছে তামাক খাইতে গেলেন। শিবানন্দ স্বামী তখন ভিতর বাড়ীর দক্ষিণদিকের বারান্দায় ও পূর্ব্বদিকের ফাঁকা ছাতের সঙ্গমস্থলে বসিয়া একটি ছোট হুঁকায় তামাক খাইতেছিলেন। নিরঞ্জন মহারাজ পূর্ব্বদিকের খোলা ছাত ও ঠাকুরের ভাঁড়ারের দোরের কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কি মুখুজ্জে! কেমন আছ?" হৃদু মুখুজ্জে বলিলেন, "আর দাদা—মরে আছি, আর কি সে দিন আছে? মামা গেছেন, তার সঙ্গে আমার প্রাণও চলে গেছে; খালি দেহটা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তবে পেট্টা ত আছে তাই কিছু চেষ্টা কর্ত্তে হয়।"

হৃদয় মুখোপাধ্যায়

শিবানন্দ স্বামীর হাত থেকে হুঁকাটি লইয়া হৃদু মুখুজ্জে উপু হইয়া বসিয়া বার কতক তামাক টানিলেন। শিবানন্দ স্বামী বলিলেন, "হ্যাঁ হে মুখুজ্জে, তিনি যখন কেশব বাবুর বাড়ীতে গিয়াছিলেন তুমি ত সঙ্গে ছিলে —কি সব হয়েছিল একবার বলত।" হৃদু মুখুজ্জে বলিতে লাগিলেন,—"একটা গাড়ী করে মামার সঙ্গে আমি ক্যাশব বাবুর বাড়ী চলিলাম। গাড়িতে আমি মামাকে বলিতে লাগিলাম, 'ক্যাশব বাবু বড় মানুষ, বড় লোক, তার বাড়ীতে গিয়ে তুমি এমন বেফাঁশ্ এলোমেলো কথা বল কেন? তুমি বড়—' আমি এই রকম বল্‌তে

বল্‌তে গাড়িতে চলিলাম। মামা তখন একখানা লালপেড়ে ধুতি পরে আছেন। ক্যাশব বাবুর বাড়িতে গাড়ি পৌঁছিলে যত্ন করে তাহারা ক্যাশব বাবুর ঘরে লয়ে গেল। ক্যাশব বাবু যত্ন করিয়া অগ্রসর হইয়া মামাকে বসাইতে গেলে মামা বলিতে লাগিলেন,—'ও ক্যাশব আমি তোমায় কি বলেছি ? হৃদু তাই পথে আমায় বোক্‌ছিল আর আমায় এই কথা বলে গাল দিচ্ছিল...' ক্যাশব বাবুর কাছে তখন জনকতক লোক বসেছিল, ক্যাশব বাবু আহ্লাদ করিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হৃদু আপনাকে রাস্তায় কি বলে গাল দিয়েছে ?' মামা আবার সেই কথাটি বলিলেন। তখন ক্যাশব বাবু খুব উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলেন। আবার একটু পরে জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'হৃদু আপনাকে কি বলে গাল দিয়েছে ?' মামা আবার সেই কথাটি বল্লেন। ক্যাশব বাবু আরও উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলেন। মামার সরল গ্রাম্য কথা ক্যাশব বাবুর কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল আর সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। তারপর ক্যাশব বাবু আনন্দ ও কৌতুকচ্ছলে জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'আজকে কি মনে করে এসেছেন ?' মামা বল্‌লেন, 'ক্যাশবের মন ভোলাতে এই দূতিগিরি কর্‌বো বলে এসেছি' এই বলিয়া তাঁহার পরনের লালপেড়ে কাপড়খানি মাথায় ঘোমটার মত দিয়া দূতী সাজিলেন এবং ক্যাশব বাবুর মুখের কাছে হাত নেড়ে নেড়ে দূতী সংবাদ গাহিতে লাগিলেন।

হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব ও কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে গল্প বলা

ক্যাশব বাবু আনন্দে উল্লসিত হইয়া তাড়াতাড়ি খোল লইয়া নিজেই বাজাইতে লাগিলেন আর মামা নৃত্য করিয়া দূতী সংবাদ গাহিতে লাগিলেন। উপস্থিত সকলে উহা শুনিয়া আহ্লাদে টুপুটুপু হইয়া উঠিলেন।"

হৃদু মুখুজ্জে এইকথা বলিতে বলিতে পূর্ব্বস্মৃতি স্পষ্ট ভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিল। নিজের পরিধেয় বস্ত্রের কোঁচাটি মাথায় দিয়া স্বয়ং দূতী সাজিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দূতী-সংবাদ অভিনয় করিতে আরম্ভ করিলেন। সেইরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাত নাড়িয়া দূতী সংবাদ গাইতে লাগিলেন। (গানটি এখন স্মরণ নাই এইজন্য এইস্থানে প্রদত্ত হইল না)। যাহা হউক হৃদু মুখুজ্জে সেই সময়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্পষ্ট ভাবটী জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন তাহাতে সকলেই মহা আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে হৃদু মুখুজ্জেকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিষয় অনেক প্রশ্ন করা হইল এবং তিনি যে সব বিষয় জানিতেন তাহার কিছু কিছু উত্তর দিতে লাগিলেন। ক্রমেই বেলা বাড়িতে লাগিল; সকলে স্নানের জন্য চলিলেন; স্নানের পর তিনি সকলের সহিত আহার করিয়া নিজের পুঁটলিটি লইয়া পুনরায় কাপড় বেচিতে চলিয়া গেলেন।

হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের দূতী সংবাদ অভিনয় করা

আলমবাজারের মঠে তিনি কখন কখন আসিতেন এবং শশী মহারাজ কথাপ্রসঙ্গে তাঁর পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেন; তাঁহারও মাঝে মাঝে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিত। তাঁহাকে অনেকেই বিশেষ সম্মান করিতেন।

১৮৯৫ সালে তিনি দক্ষিণেশ্বরে উৎসব দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। দুঃখ করিয়া তিনি একটি কথা বলিয়াছিলেন,—"যখন কেউ আসেনি তখন আমি মামার এত কোরে সেবা করেছিলুম কিন্তু এখন আমায় কেউ পোঁছে না। বেড়ালটা একবার দুধে মুখ দিয়েছে বলে তাকে কি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয় ?" সান্ন্যাল মশাই তখনকার উৎসবের এক জন প্রধান উদ্যোগী লোক। তিনি হৃদু মুখুজ্জের এই কথা শুনিয়া বড় ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে গোপনে কিছু কিছু দিতেন, তিনি সেই সামান্য পাইয়াই পরিতুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইতেন।

কিশোরী মোহন রায়ের বাড়ী বনহুগলি গ্রামে—আলমবাজারের মঠের অনতিদূরে। ১৮৯০ বা ১৮৯১ সালে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তিনি দাহ করিয়া আসিয়া বৈকাল বেলা বড় ঘরটিতে বিমর্ষ ভাবে লম্বা হইয়া শুইয়া রহিলেন। আধঘণ্টা পরে হঠাৎ হুঙ্কার পূর্ব্বক লম্ফ দিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং ভিতর বাড়ীর পূর্ব্বদিকের খোলা ছাতটিতে গিয়া সতীশ মুখুজ্জের সহিত নানা হাস্যকৌতুক করিতে লাগিলেন। শোকের কথা যেন অনেকটা ভুলিয়া গেলেন। তাহার জন্য সকলেই একটু চিন্তিত হইয়াছিলেন কিন্তু পরে তাহার হর্ষ দেখিয়া সকলের সে চিন্তা দূর হইল। একটা কিছু কাজ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না—সর্ব্বদাই হাস্য মুখ; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও নরেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল এবং নরেন্দ্রনাথও ইঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

কিশোরীমোহন রায়

শিবানন্দ স্বামী এতবার বাহিরে গিয়াছিলেন ও ফিরিয়া আসিয়াছিলেন যে তাঁহার পর্য্যটনের কোন হিসাব রাখা যায় না এবং কোন্ বারে কোন্ কোন্ যায়গায় গিয়াছিলেন তাহাও মনে রাখা সম্ভব নয়। তবে যাহা কিছু স্মরণ আছে তাহাই এখানে বিবৃত হইল। তিনি আলমোড়ায় গিয়াছিলেন এবং তথায় তথাকার ধনাঢ্য ব্যক্তি লালা বদ্রিসা থুলঘড়িয়ার সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। বদ্রিসা তদবধি শিবানন্দ স্বামীর বিশেষ ভক্ত হইয়াছিলেন ও শিবানন্দ স্বামীকে সর্ব্বদা চিঠি লিখিতেন এবং পার্ব্বতীয় অনেক জিনিষ তিনি আলমবাজারের মঠে পাঠাইতেন। তিনি জম্বুঘাস (তরকারীতে ফোঁড়ন দিলে হিংয়ের মতন গন্ধ হয়—একপ্রকার পাহাড়ি শুক্‌নো ঘাস) থুল খুসিয়ানি (কামরাঙ্গার ন্যায় বড় বড় একজাতীয় লঙ্কা—ঈষৎ ঝাল ও কাঁচা লঙ্কার ন্যায় সুগন্ধি), আপেল ও অন্যান্য অনেক দ্রব্য মাঝে মাঝে পাঠাইতেন এবং মঠের বিশেষ অনুগত ভক্ত ছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোন সন্ন্যাসী শিষ্য আলমোড়ায় যাইলেই বদ্রিসার বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। বদ্রিসার বৃদ্ধা মাতা ও ভ্রাতাগণ সকলেই মঠের সন্ন্যাসিগণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। তাঁহার একটি সন্তান হইলে ছেলেটির নাম সিদ্ধদাস রাখিয়াছিলেন।

শিবানন্দ স্বামী ও লালা বদ্রিসা

একবার শিবানন্দ স্বামীর আলমোড়ায় অবস্থান কালে E. F. Sturdy নামক জনৈক ইংরাজের সহিত বিশেষ প্রণয় হয়। শিবানন্দ স্বামী Sturdyর সহিত মাদ্রাজে

গিয়াছিলেন। এই Sturdyর বাড়িতেই America হইতে স্বামিজী Englandএ আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

শিবানন্দ স্বামীর মঠে প্রত্যাগমন।

শিবানন্দ স্বামী আলমবাজার মঠে প্রত্যাগমন করিয়া Sturdy ও দক্ষিণদেশের নানা বিষয় কহিতে লাগিলেন। কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলিলেন, "মান্দ্রাজে এক সম্প্রদায় ক্রিশ্চান আছে যাহাদের Thomas ক্রিশ্চান বলে। এইরূপ প্রবাদ যে, যীশুর শিষ্য Thomas তথায় আসিয়া তাহাদিগকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। আচার ব্যবহারে প্রায় হিন্দুরই ন্যায় তবে ধর্ম্মে তাহারা ক্রিশ্চান। চলিত কোন ক্রিশ্চান ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ভিতর তাহারা নয়। বর্ত্তমান লেখক শিবানন্দ স্বামীর কাছে Thomas Christianদের খবর এই প্রথম শুনেন এবং পরে অন্যান্য গ্রন্থে ও কিছু কিছু পাঠ করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি গলা থেকে পা পর্য্যন্ত একটা রেশমের জামা আর একজোড়া মাদ্রাজি চটি পায়ে দিয়া আসিয়াছিলেন। বর্ত্তমান লেখক সেই মাদ্রাজি চটিটি শিবানন্দ স্বামীর কাছ থেকে চাহিয়া লইলেন। তিনি হাস্য ও কৌতুক করিতে করিতে প্রসন্ন হইয়া তাহা দিলেন এবং সান্ন্যাল মহাশয়ও সেই গরদের লম্বা জামাটি চাহিয়া লইলেন। তিব্বত হইতে আনিত গঙ্গাধর মহারাজের লম্বা পশমী জামাটি সান্ন্যাল মহাশয় পূর্ব্বে লইয়া গিয়া কাটাইয়া নিজের গায়ের মতন কোট-জামা তৈয়ারি করাইয়াছিলেন এবং এই দুটি জিনিষ পাইয়া তিনি বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলেন।

নিরঞ্জনানন্দ স্বামীর অজীর্ণ রোগ:।

এই সময় নিরঞ্জন মহারাজের অজীর্ণরোগ দেখা দিল। সর্ব্বদাই তাঁহার পেটের অবস্থা খারাপ। কখন তিনি আলমবাজারের মঠে, কখন বলরাম বাবুর বাড়ীতে কখন বা অন্যত্র বাস করিতে লাগিলেন। আহারাদির বিশেষ নিয়ম পালন করিয়াও পীড়ার কোন উপশম হইল না, কয়েক বৎসর ভুগিয়া ক্রমেই শরীর দুর্ব্বল হইতে লাগিল। তিনি আর পূর্ব্বের ন্যায় সকল কার্য্যে উৎসাহ ও আনন্দসহকারে যোগ দিতে পারিতেন না। অনেক সময় ম্রিয়মান হইয়া থাকিতেন, কখন বা পূর্ব্বের ন্যায় হর্ষিত হইয়া কার্য্য করিতেন। স্বভাবতঃ তিনি প্রফুল্লচিত্ত ও লোকরঞ্জক ছিলেন এবং সকলের সহিত সাদরে বাক্যালাপ করিতেন, কিন্তু এই সময় শরীর অসুস্থ থাকায় সব দিন সমান থাকিতেন না। তাঁহার জীবনের শেষ কয়েক বৎসর এই পীড়া ভোগ করিতে হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সেই সময় বেলুড় গ্রামে গঙ্গার পশ্চিম তীরে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানে বাস করিতে লাগিলেন। তখন বাড়ীখানি একতলা, শুধু সিঁড়ি দিয়া ছাতে উঠিবার স্থানটিতে একখানি ছোট ঘর এবং নীচেতে কয়েকটি মাত্র ঘর ছিল। যোগেন মহারাজ অভিভাবক হইয়া বাহিরের সমস্ত কার্য্য দেখাশুনা করিতেন এবং গোলাপ মা ও অপর স্ত্রী ভক্তেরা ভিতরের কার্য্য দেখিতেন। রবিবার বা অন্য কোন বিশেষ দিনে পুরুষ ভক্তেরা যাইলে বাহিরেই থাকিতেন এবং যোগেন

মহারাজের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন, ভিতরে যাইবার কাহারও অধিকার ছিল না। পুরুষ-ভক্তেরা বৈকালে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন বা ফল প্রসাদ পাইতেন, তখনি অন্য প্রসাদের কোন ব্যবস্থা ছিল না। গোলাপ মা তখন বাহিরের ভক্তদের সহিত কথা কহিতেন ও সকলকে বিশেষ যত্ন করিতেন। স্থানটি গঙ্গার ধারে, সামনে ঘাসওয়ালা উঠান, পিছনে কিছু কলাগাছ ও সুপারিগাছ ছিল। যাহা হউক স্থানটি অতি নিরিবিলি ও সুরম্য। গঙ্গার পাঁতারে নেপালীদিগের বড় বড় শাল কাঠ বরাবর কিনারাময় পাতা ছিল কারণ বেলুড় গ্রাম তখন শালকাঠের আড়ৎ।

কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাস, যোগেন মহারাজ একটি গৈরিক রঙ্গের হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত তূলাভরা জামা পরিয়া গঙ্গার ধারে বসিয়া আছেন। জামাটির তৈয়ারিতে কিছু বিশেষত্ব ছিল। বর্ত্তমান লেখক উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ আবার কোন্ দেশী জামা?" যোগেন মহারাজ বলিলেন, "এ হচ্ছে পশ্চিমের তূলোভরা জামা।" বর্ত্তমান লেখক বলিলেন, "হাঁ একখানা লেপ্‌কে কেটে সেলাই করে জামা করেচে।" যোগেন মহারাজ তাহা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান লেখক বারংবার কহিতে লাগিলেন, "লেপের জামা, লেপের জামা" এই কথা শুনিয়া কালীবেদান্তী ও অপর সকলে যোগেন মহারাজের সহিত কৌতুক করিতে লাগিলেন, "কিরে যোগে,

যোগানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক।

তোর বুঝি শীত করে তাই লেপ্ কেটে জামা করে গায়ে দিয়ে সারাদিন রোদ পোয়াস!" কথাটা অতি তুচ্ছ হলেও তখন সকলের প্রাণ এত সরল ও পরস্পরের প্রতি এরূপ ভালবাসা ছিল যে সামান্য কার্য্যেও সকলে আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের বৈরাগ্য ভাব।

এই সময় গিরিশ বাবুর খুব বৈরাগ্যভাব হয়। তিনি অনবরত জপ করিতে থাকেন এবং থিয়েটার ও সংসারের সকল কার্য্য হইতে অবসর লইতে ইচ্ছা করেন। শুধু ভক্তবৃন্দদের লইয়া তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও সাধন ভজনের নানা সোপানের উচ্চ অবস্থার কথা কহিতেন। তখন তিনি নরম, ধীর ও একেবারে বালকের মতন হইয়া গিয়াছিলেন। সংসারের বা অন্য কোন বাজেকথা কেহ কহিলে তিনি অনেক সময়ে বিরক্ত হইতেন। ভক্তদের লইয়া আহার বিহার ও বসা দাঁড়া করিতেন, বাহিরের লোককে বড় একটা আসিতে দিতেন না। সকলেই তাঁহাকে ঐকান্তিক ভাবে জপ ধ্যান করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় মাষ্টার মহাশয়, শরৎ মহারাজ প্রভৃতি এবং আরও কয়েক জন বলরাম বাবুর বড় ঘরটিতে বসিয়া আছেন। গিরিশ বাবু সহসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কাপড়ের ডানদিকের ট্যাঁকে কতকগুলো পান ছিল। তিনি সেইগুলি বাহিরের কাগজের উপর রাখিয়া উত্তেজিতভাবে সাধন ভজনের কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার রাধাকৃষ্ণের ছবির দিকে চক্ষু পড়িল, তিনি

কৃষ্ণের বঙ্কিম-নেত্রের বিষয় একাধারে রহস্য ও ভক্তিসহকারে বলিতে লাগিলেন। একদিকে যেমন ব্যঙ্গ করিতেছেন অপরদিকে তেমনি আবার প্রগাঢ় ভক্তি দেখাইতেছেন।

তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই বিশেষ ভাবে আনন্দিত হইলেন। তিনি মাঝে মাঝে দুইহাত তুলিয়া রাধাকৃষ্ণের ছবিকে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের রামপ্রসাদী গান শুনা।

এমন সময় এক রাত-ভিখারি রামপ্রসাদী পদ

"মা সোহাগে বাপের আদর"

গাহিতে গাহিতে বলরাম বাবুর বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। চলিত রামপ্রসাদী পদ, চলিত গান কিন্তু গিরিশ-বাবুর গানটী এত ভাল লাগিল যে তিনি গায়কটীকে উপরে ডাকাইয়া আনাইয়া আপন সম্মুখে বসাইয়া রাম প্রসাদী পদ গাহিতে বলিলেন। লোকটি তিন চারিটী গান গাহিলে গিরিশবাবু তাহাকে দুই আনা পয়সা দিলে সে চলিয়া গেল। গিরিশবাবু শরৎ মহারাজকে বলিতে লাগিলেন, "দেখ শরৎ! এই রামপ্রসাদী পদ এমন তেজী ভাবের যে ইহাতে মনের angularity থাকে না, মনটাকে একেবারে সিদে চোস্ত করে দেয়" কথাগুলি কহিতে কহিতে তিনি আরও উত্তেজিত হইতে লাগিলেন। সে দিন যেন তিনি ভক্তি ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন। স্বতন্ত্র গিরিশবাবু স্বতন্ত্র ভাব। অবশেষে তিনি একটী জটাধারী সন্ন্যাসীর গল্প আরম্ভ করিলেন, "দেখ এক দিন দুপুরবেলায় একটা জটাধারী ছাইমাখা চিম্‌টে

হাতে এক সন্ন্যাসী এসে আমাদের ঠাকুরদালানে বসিল। সন্ন্যাসী দেখ্‌লেইত মেয়েদের হাত দেখান আছেই। আমি বৈঠকখানা ঘরে দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে কি বলে শুনতে লাগ্‌লুম। ঝি মাগি সে বাড়ীর সব কথা আগেই তাকে বলে দিয়ে গেল। সন্ন্যাসী গণৎকার তখন ত কৃতবিদ্য। বাড়ীর মেয়েরা এসে যেমনি হাত দেখায় আর সন্ন্যাসী অমনি পট্ পট্ করে সব বলে দেয়। আমার ত রাগে গা গস্ গস্ করতে লাগলো। চুপ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে শুয়ে রইলুম। যখন বুঝ্‌লুম মেয়েরা সব বাড়ীর ভেতর চলে গেছে তখন আমি নেমে এলুম। এসে ঠাকুরদালানের সম্মুখের করবিগাছের গোটাকতক ডাল ভেঙ্গে নিয়ে এই আর কি সন্ন্যাসীকে মার আর তাড়া! সন্ন্যাসীও যত গলি দিয়ে পালাতে থাকে, আমিও তত করবিগাছের ডাল নিয়ে মার্‌তে সুরু কল্লুম” এই কথা বলিতে বলিতে তিনি এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীর পলায়ন ক্রীড়া কবিতায় বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাহার কবিতাটী এত সুন্দর হইয়াছিল যে বর্ত্তমান লেখক তাহা লিখিয়া রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি এত শীঘ্র বলিয়া গিয়াছিলেন যে তাহা লিখিয়া রাখা অসম্ভব হইয়াছিল। গিরিশবাবু খানিকক্ষণ চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিলেন তাহার পর পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “দেখ শরৎ! অতুলের মেয়ের অসুখের সময় অতুল চিকিৎসা কর্‌বার জন্য কোত্থেকে একটা সন্ন্যাসী এনে

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও জনৈক সন্ন্যাসী।

ঠাকুরদালানে রাখলে। মিন্‌ষে খায় দায় থাকে আর কি ওষুধ পত্তর করে। অতুলের একটী মাত্র মেয়ে, তার অসুখ করেছে, তা সে যা ভাল বোঝে করুক বাবু, আমি কিছু ব'লতুম না। একদিন দুপুরবেলা আর থাক্‌তে পার্‌লুম না, এদিক ওদিকে কেউ নেই দেখে আমি চুপি চুপি এসে সন্ন্যাসীর কাছে বস্‌লুম। বসে, তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "বলি ও সন্ন্যাসী ঠাকুর! বলি ও সন্ন্যাসী ঠাকুর! তুমি ত সব রোগের দাওয়াই ক'চ্ছো। বলি তোমার যে ভবরোগ হয়েছে তার কোন দাওয়াই ক'চ্ছো কি? সে দিকে মন দাওনা কেন?" এ কথা বলেই আবার এদিক ওদিক চেয়ে পোঁ করে পালিয়ে এসে উপরের ঘরে ঢুকে প'ড়লুম। কি জানি কেউ দেখে ফেলবে, আবার কোন কথা হবে। সন্ন্যাসী ঠাকুরও কিন্তু সেই দিন থেকে ডেরা ওঠালো।"

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের জনৈক সন্ন্যাসীকে ভৎর্সনা করা।

একদিন গিরিশবাবু বলরামবাবুর ঘরটিতে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ আমাদের একটা ছোঁড়া উড়ে চাকর ছিল। কল্‌তলাটা পেচলা ছিল—তথায় গিয়ে ধুপ ক'রে সে পড়ে যায়—তাইতে তার ডান হাতটা মচ্‌কে গিয়ে বড় যন্ত্রণা হল ও ফুলে উঠ্‌ল। উড়ে ছোঁড়াটা কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। আমি বল্লুম, "তুই এই টাকাটা নে—নিয়ে এক টাকার জিলিপি কিনে দক্ষিণেশ্বরে চলে যা। সেখানে এক সাধু আছে, তার কাছে খাবারটা দিয়ে বল্‌বি যে, আমার হাত ভেঙ্গে গেছে, আপনি হাত বুলাইয়া যায়গাটা ভাল করে দিন।" চাকরটাও ঠিক সেইরূপ কল্লে। ফিরে এলে আমি

জিজ্ঞাসা কল্লুম, "কিরে সাধু কি বল্লে ?" চাকরটা বল্লে, "সাধু বল্লে ভাল হয়ে যাবে।" কিন্তু তখনও তার হাতের হাড়টা বেঁকে রয়েছে, আর কিছু ফুলেও রয়েছে। আমি বল্লুম, "সাধু যখন বলেছে তখন তোর নিশ্চয়ই ভাল হবে। যা ভয় করিস্ না।" তার পরদিন আবার যখন সে কল্‌তলায় গেছে আবার পা পিছলে ধুপ করে পড়ে গেছে। আর যেমনি পড়ে যাওয়া ওম্‌নি যে হাড়ের গাঁট্‌টা বেঁকে গেছ্‌লো সেটা ঠিক বসে পোড়লো। আহ্লাদ করে আমায় এসে দেখালে। আমি বল্লুম, "দেখ্‌লি সাধুর কথা কেমন ঠিক হয়!"

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও স্বামী সারদানন্দ।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে উৎসব হইবে। বলরামবাবুর বাটীতে উৎসবের ফর্দ্দাফর্দ্দির সভা বসিত। একদিন সকাল ৯টা ১০টার সময় গিরিশবাবু আসিলেন। খাণিকক্ষণ উৎসবের কথা শুনিয়া গিরিশবাবু বলিলেন, "দেখ শরৎ! আমি একটি কথা বলি, উৎসবে অনেক গণ্যমান্য বড় লোক যাবে —তাদের জন্যে উৎসবে প্রসাদের আলাদা বন্দোবস্ত ক'র্‌লে হয় না? তাঁহারা সমাজে একটা মান্য পেয়ে থাকে। তাই প্রসাদের একটা বিশেষ বন্দোবস্ত করে রাখা উচিত নয় কি ?"

শরৎ মহারাজ বলিলেন, "এত ভিড়ে দুরকম বন্দোবস্ত হওয়া সম্ভব নয়। সে সব গোলমাল হয়ে যাবে। আর সামাজিকতার কথা যা ব'ল্লে এত সে ভাবের নয়, এযে প্রসাদ পাওয়া এখানে সকলেই সমান।" গিরিশবাবু বলিলেন, "তবুও তাহারা ত সমাজে একটা মান্য পাইয়া

থাকেন, এখানে পাবেন না কেন?" বর্ত্তমান লেখক বলিলেন, "এটা তীর্থক্ষেত্র—সমাজে বড় ছোট থাকিতে পারে, মানী অমানী হইতে পারে কিন্তু তীর্থে সকলেই সমান। শ্রীক্ষেত্রে কেউ কি বড় ছোট বিবেচনা করে? সমাজ ওসব বড় ছোট বিচার করে, শুধু এই মহাতীর্থস্থানে বড় ছোট বিচার উঠিয়া গিয়া সকলে এক হ'য়ে যাবে।"

তাহার পর সে কথা মিটিয়া গেল, সকলেই একমত হইলেন। গিরিশবাবু বলিলেন, "এখানে ছোট বড় নেই, সব এক—এ ভাল কথা।" তাহার পর তিনি বলিতে লাগিলেন, "দেখ শরৎ! আগে আমি আদি ব্রাহ্মসমাজে খুব যেতুম। একদিন একটি পূর্ব্ববদেশীয় লোক আসিয়া বেদিতে বসিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি বক্তৃতা-কালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভগবানের দ্বারের দ্বারপাল বলিয়া বর্ণনা করিতে লাগিলেন এবং তাহার হাতে ধর্ম্মদণ্ড আছে, তাহার দ্বারা গতাগতি নিয়মিত করিতেছেন। বর্ণনাটি বেশ হইয়াছিল, তাহাতে এমন কোন বিশেষ দোষ হয় নাই। পরদিন আমি কেশব বাবুর বাড়িতে গেলুম; কথাপ্রসঙ্গে একটি লোক বলিতে লাগিলেন, 'শুনেছেন মশাই, ঐ বাঙ্গালটার কীর্ত্তি। মহর্ষিকে দরোয়ান সাজাইয়া কাঁধে লাঠি দিয়া ভগবানের দেউড়িতে দাঁড় করাইয়া রাখিল, তার যেন ভগবানের বাড়ীতে ঢুকিবার অধিকার নাই; আর ভগবানের সহিত তার যেন সাক্ষাতই হয় নাই।' আবার দু' একজন বলিলেন, 'ওটা

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের আদি ব্রাহ্মসমাজের গল্প বলা।

বাঙ্গাল অসভ্য, ওর কি কোন হিতাহিত জ্ঞান আছে, না কথা কহিতে জানে।' এইরূপ কথা শুনিয়া আমার প্রাণে বড় লাগিল, এদের ভিতরেও এরূপ অবজ্ঞার ভাব! পরস্পরকে এরূপ অবজ্ঞা করিয়া কথা কয়! আমি তখন মনে মনে স্থির কল্লুম আজ থেকে ব্রাহ্মসমাজের সংসর্গ ছাড়লুম। যদি ভগবান স্বয়ং প্রেমে আলিঙ্গন করিয়া আমায় নেয় তবে আমি ধর্ম্ম কর্ম্মের কথা সব শুন্‌বো? তারপর কত বছরের পর তাঁর (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের) সহিত দেখা। ভাগ্যিস্ তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল, তাইত আমার মন ফির্‌লো, বুকে একটা শান্তি পেলুম, নইলে বুকটা জ্বলে যেত।" তারপর উৎসব সংক্রান্ত নানা বিষয় কথাবার্ত্তা হ'তে লাগ্‌লো।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত।

যে দিন রাত্রে বলরাম বাবুর ঘরে রামপ্রসাদী গান হইয়াছিল মাষ্টার মশাই সেদিন রাত্রে তথায় উপস্থিত ছিলেন। গিরিশবাবু সেদিন মাষ্টার মশাইকে সঙ্গে লইয়া নিজের বাড়ীতে খাইতে গেলেন। গিরিশবাবু খাইতে খাইতে বলিতে লাগিলেন, "এ আনন্দের অন্ন,—এ প্রেমের অন্ন! সকল ভক্ত একত্রিত হইয়া খাওয়া মহা আনন্দের জিনিষ।" প্রকৃত তখন ভক্তমণ্ডলীর ভিতর পরস্পরের এরূপ ভালবাসা ছিল যে কোন্‌দিন কে কোথায় আহার করিল অনেক সময় তাহা স্থির থাকিত না। যে দেখা করিতে গেছে উপস্থিত মত কিছু খেয়ে এসেছে এরূপ অনেক সময়েই হইত। প্রত্যেক ভক্তের বাড়ী যেন নিজের বাড়ী, প্রত্যেক ভক্তের

অন্ন যেন মহা পবিত্র অন্ন। নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ কিছুই ছিল না,—পরস্পরের ভিতর এরূপ একটা টান ছিল যে দু' তিন দিন দেখা না হইলে বড় কষ্ট হইত। ভক্তদিগের মধ্যে যে সব সময় বিশেষ কোন কথা হইত এরূপ নহে ; কিন্তু সকলে একসঙ্গে বসিয়া থাকিতে বড় ভালবাসিত।

শ্রদ্ধেয় গিরিশ চন্দ্র ঘোষের সন্ন্যাস লইবার ইচ্ছা।

এই সময় গিরিশবাবুর সাধনের ভাব প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি থিয়েটার ও সংসার একেবারে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইতে মনস্থ করিলেন। কেহ নিষেধ করিলে মানিতেন না। অবশেষে সকলে স্থির করিলেন যে এসব বিষয়ে নরেন্দ্রনাথকে জানাইয়া তাহার মত লওয়া আবশ্যক। নরেন্দ্রনাথ তখন রাজপুতানায় ছিলেন। গিরিশবাবু তখন আপনার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া নরেন্দ্রনাথকে একখানি চিঠি লিখিলেন। নরেন্দ্রনাথ স্থির হইয়া গিরিশবাবুকে চিঠির উত্তর লিখিলেন যে তাঁহার সন্ন্যাস লইবার কোন আবশ্যক হইবে না। তিনি সংসারে থাকিয়া তাঁহার কর্ম্ম ও বহু কল্যাণকর কার্য্য করিতে পারিবেন। গিরিশবাবু নরেন্দ্রনাথের পত্রখানি পাইয়া প্রাণে শান্তি পাইলেন ও সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন।

ইংরাজি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের গরমকালে বিকাল বেলায় যোগেন মহারাজ ও বর্ত্তমান লেখক বলরাম বাবুর বাড়ীর ছোট্ট ঘরটিতে বসিয়া আছেন, মাঝে একটি টেবিল। টেবিলের অপরদিকের বেঞ্চিটিতে যোগেন মহারাজ বসিয়া আছেন। বর্ত্তমান লেখক টেবিলের দক্ষিণ দিকে একখানা

চেয়ারে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। বেলা চারিটা বা সাড়ে চারিটার সময় উপেন মুখুজ্জ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বর্ত্তমান লেখক চেয়ারখানি ছাড়িয়া যোগেন মহারাজের পার্শ্বে গিয়া বসিলেন এবং উপেন মুখুজ্জ্যে চেয়ারখানিতে বসিলেন। উপেন মুখুজ্জ্যে আহ্লাদ করিয়া বলিলেন যে, তিনি ১৩০০০৲ টাকা দিয়া একখানি বাড়ী কিনেছেন আর সেই সুখবরটি যোগেন মহারাজকে দিবার জন্য আসিয়াছেন। উপেন মুখুজ্জ্যে যোগেন মহারাজকে গুরুর মত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, তাই আহ্লাদ করিয়া খবরটি দিতে আসিয়াছেন। যোগেন মহারাজ তাহা শুনিয়া খুব আনন্দিত হইলেন। উপেন মুখুজ্জ্যে বলিলেন, "আরও হাজার দুই টাকা বাড়ীটি মেরামত করিতে লাগিবে।" যোগেন মহারাজ বাবুরাম মহারাজের মার কাছ থেকে চার্‌টে বড় বড় পান্‌তুয়া আনিয়া উপেন মুখুজ্জ্যেকে খাইতে দিয়া এক গ্লাস জল ও একটা পান দিলেন। যোগেন মহারাজের প্রদত্ত জিনিষ উপেন মুখুজ্জ্যে অতি ভক্তি সহকারে গ্রহণ করিয়া আহার করিতে লাগিলেন এবং নিতান্ত আপনার লোক জ্ঞানে যোগেন মহারাজের কাছে অনেক বিষয়ের পরামর্শ ও উপদেশ লইতে লাগিলেন। পরে তিনি চলিয়া গেলেন। যোগেন মহারাজ তখন হর্ষিত হইয়া সাম্‌নের বারান্দায় পাইচারি করিতে করিতে কৌতুকচ্ছলে ডান হাতের তর্জ্জনী নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিলেন, "দেখ্‌লি শ্যালা আশীর্ব্বাদ ফলে কি না? তুই

স্বামী যোগানন্দ ও উপেন মুখোপাধ্যায় :

শ্যালা ত আমায় মান্‌বিনি, শ্যালা নিজের গোঁয়েতেই চল্‌বি ? ত্যাখ্‌ শ্যালা, উপেনের বটতলার ছোট দোকানটি থেকে এখন কেমন ক'ল্লে। শ্যালা তবুও তুই আমায় মান্‌বিনি ?" যোগেন মহারাজ তখন খুব হর্ষিত হইয়াছিলেন সেইজন্য নানাভাবে হাসি ও কৌতুক করিতে লাগিলেন। তখনকার দিনে কাহারও কোন শুভ হইলে সকলেই আনন্দিত হইতেন এবং কাহারও কোন কষ্টতে সকলেই চিন্তান্বিত হইতেন। তখন ছিল এক মন এক প্রাণ।

স্বামী সারদানন্দ ও বর্ত্তমান লেখক।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে শরৎ মহারাজ ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতে-ছিলেন। তখন তিনি অতিশয় ধীর ও নিতান্ত বালকের স্বভাব হইয়াছিলেন। সর্ব্বদাই এমন কি রাত্রের অনেক সময় পর্য্যন্ত তিনি জপ ধ্যান লইয়া থকিতেন এবং অধ্যয়নেও তদ্রূপ উৎসাহিত ছিলেন। অধীত নানা গ্রন্থের কথা তাঁহার মুখে সর্ব্বদা লাগিয়া থাকিত। সকলের কি প্রকারে মঙ্গল হয়,—সাধারণ জীবের কি করিলে মঙ্গল হয় এই চিন্তাই তিনি সর্ব্বদা করিতেন এবং এই বিষয়েই সর্ব্বদা কথা কহিতেন। প্রাতে কখন কখন তিনি বর্ত্তমান লেখককে সঙ্গে লইয়া বনহুগলির সুরম্য রাস্তাটিতে বেড়াইতে যাইতেন, কখন বা বাগানের ভিতরকার রাস্তাটি দিয়া বরাহনগর পর্য্যন্ত বেড়াইতেন। একবার Necessities of lifeএর কথা উঠিল, মানুষ কি পরিমাণে দ্রব্যাদি ভোগ করিলে স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতে পারে,—কোন্ সব বস্তুকে বিলাসদ্রব্য

বলা যাইতে পারে—আর কোন্ সব বস্তুকে আবশ্যকীয় বলা যাইতে পারে। এ সবই হচ্ছে Political economyর কথা। উভয়েই নানারূপ কারণ দর্শাইতে লাগিলেন। অবশেষে ইহা সিদ্ধান্ত হইল যে, জাতি বা সমাজের সভ্যতা, জল, বায়ু, স্থান ও অন্যান্য কারণের উপর আবশ্যকীয় ও বিলাসী দ্রব্য নির্ভর করে। কোন একটা বিশেষ নিয়ম করা যায় না। কোন স্থানবিভাগের রেখা টানিবার নয়। বহু কারণের উপর আবশ্যকীয় ও বিলাসী দ্রব্য নির্ভর করে। কিন্তু সাধারণতঃ সমস্ত দ্রব্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। শরৎ মহারাজ Political economyর গূঢ়তত্ত্ব লইয়া এই সমস্ত বিষয় অতি সুন্দরভাবে বিচার করিতেন, তাহা শুনিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইত।

স্বামী সারদানন্দর Political economyর আলোচনা।

একদিন শরৎ মহারাজ বলিলেন, "চা পান বিলাস দ্রব্যের ভিতর, আবশ্যকীয় নহে।" উভয়েই চা খোর; শরৎ মহারাজের মুখে বিপরীত ভাব শুনিয়া বর্ত্তমান লেখক বিস্মিত হইলেন। শরৎ মহারাজ তখন আসামের চা বাগানের কুলিদিগের দুঃখ কষ্ট বলিতে লাগিলেন, "চার জলটা কি জান? আসামের কুলিদিগের রক্ত। বিলাসের জন্য চা খাচ্ছ না? আবশ্যকীয় বলিয়া যুক্তি তর্ক দিয়া সমর্থন করা নয় ইহা প্রত্যক্ষ গরিব নিরাশ্রয় কুলিদিগের রক্ত।" শরৎ মহারাজ এমন ওজস্বী এবং হৃদয়স্পর্শী ভাবে কথাগুলি বলিতে লাগিলেন যে তাহা শুনিয়া বর্ত্তমান লেখকও ব্যথিত হইলেন। তিনি চা-বাগানের কুলিদিগের দুঃখের কথা

বলিতে বলিতে এমন ব্যথিত হইয়া পড়িলেন যে তাহার চক্ষে জল আসিল।

বর্ত্তমান লেখকের চা পান ত্যাগ করা।

বর্ত্তমান লেখক বলিলেন, "চা বিলাস দ্রব্য হইতে পারে কিন্তু ব্যক্তিগত আবশ্যকীয়ও বটে।" যদিও বর্ত্তমান লেখক ভীষণ চা খোর কিন্তু সেই দিবসেই চা পান ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহার চক্ষের উপর শরৎ মহারাজের মুখ, জলপূর্ণ চক্ষুর্দ্বয় এবং অর্দ্ধ ক্রন্দনস্বরে আদ আদ শব্দ কয়েক দিবস ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান লেখক অতীব চা খোর, দশ বার দিন চা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় চা খাইতে লাগিলেন কিন্তু শরৎ মহারাজের সেইদিনকার কথাগুলি ও ভাবভঙ্গী আজীবন তাঁহার স্মরণ আছে।

কৌতুকরহস্যেও শরৎ মহারাজ বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। একদিন সকলে গঙ্গাস্নান করিয়া মঠের দিকে ফিরিয়া আসিতেছিলেন এমন সময় একটা গরু এক স্থান হইতে অপর এক স্থানে গিয়া শুইয়া রহিল। বর্ত্তমান লেখক বলিলেন, "এই বৃষটা এই বাড়ীরই হইবে কারণ এই স্থানটা ওর অভ্যস্তস্থান বলিয়া এইখানেই শুইয়া রহিল।" শরৎ মহারাজ কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "ঠিক বলেচ—এটা ঠিক মাতাল ও গুলিখোরের স্থান নির্ণয়। তবে এক গল্প বলি শুন" এই বলিয়া তিনি এক গল্প বলিতে সুরু করিলেন, "দেখ দুই বন্ধু,—এক মাতাল ও এক গুলিখোর রাস্তায় যাইতে যাইতে এক হালুইকরের দোকানে গিয়া খাবার কিনিল। হালুইকরের দোকানে তখন ভাঙ্গান পয়সা ছিল না, সেইজন্য

ছয় আনা খাবার কিনিয়া দশ আনা পয়সা পরদিন আসিয়া লইবে স্থির করিল। উভয়ে খানিক দূর চলিয়া গেলে গুলিখোর বলিল, 'ভাই, স্থানটি নির্ণয় করিয়া যাইতে হইবে।' ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে একটা সাদা ষাঁড় দোকানের সামনে শুইয়া আছে। গুলিখোরটি বলিল, 'ঠিক হয়েছে একটা সাদা ষাঁড় শুইয়া থাকে, এই হ'ল ঠিক চিহ্ন।' পরদিন সন্ধ্যার সময় উভয়ে নেশা করিয়া দশ আনা পয়সা আদায় করিতে আসিয়াছে। ঘটনাক্রমে সাদা ষাঁড়টি এক লম্বা দাড়িওয়ালা দর্জ্জির দোকানের সম্মুখে শুইয়া আছে, উভয়ে যাইয়া লম্বা দাড়িওয়ালা দর্জ্জিকে তম্বিতম্বা—দশ আনা পয়সা দাও। দোকান ভুল হয় নাই প্রমাণ ত ঠিকই রয়েছে কারণ সেই সাদা ষাঁড় সম্মুখে শুইয়া আছে! গুলিখোর বন্ধুটি বলিল, "কি বাবা দশগণ্ডা পয়সা ফাঁকি দেবার জন্য একেবারে ভোল ফিরিয়েছ? কাল ছিলে হালুইকর আর আজ হলে দর্জ্জি, আর বাবা রাতারাতি দাড়ি গজিয়ে ফেল্লে। এখনও তার সাক্ষী সাদা ষাঁড়টা শুয়ে রয়েছে,—গুলি খাই বলে মনে ক'রনা বাবা আমার ভুল হয়েছে!" শরৎ মহারাজ গল্পটি অভিনয়ের ভাবে এমন স্বর পরিবর্ত্তন করিয়া উভয় বন্ধুর কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন যে বর্ত্তমান লেখকের হাসিতে হাসিতে পেটে ব্যথা ধরিয়া গিয়াছিল। অপর সকলেও শরৎ মহারাজের কথিত গল্পটি নকল করিয়া সকলকে হাসাইতে লাগিলেন।

স্বামী সারদানন্দের কৌতুক রহস্য।

শরৎ মহারাজ গিরিশবাবুর কথিত আর একটি গল্প

অভিনয়ের মত করিয়া সকলকে হাসাইতেন। কতকগুলি চাঁটগেঁয়ে মাঝি যাত্রা শুনিতে গিয়াছে। গানে সোম আসিলে সকলে এক সঙ্গে কি ক'রে তাল দেয় ইহা তাহারা 'বুঝিতে পারিতেছিল না ; এইজন্য তাহারা তাহাদের সর্দ্দারকে বলিল, "ও কস্থা (কর্ত্তা), অই গানটা কেমন হইল ?" কস্থা বলিলেন, "যে সুমুন্দি চুম্‌চুমাইছে উ সুমুন্দি মজা না মার্‌ছ্যা। যে সুমুন্দি ডেব ডেবাইছ্যা ও সুমুন্দিও মজা না মার্‌ছে। যে সুমুন্দি প্যান প্যানাইছ্যা উই সুমুন্দিই মজা মার্‌ছ্যা। কদুর ভেতর গাড়ছে ম্যাক্ আর ম্যাকের গায়ে লাগাইছ্যা চিক। আর সব সুমুন্দি গুয়ে লাগাইছ্যে চিক্। চিক্ ধইরা মারে টান আর সব সুমুন্দি করে হঃ—হঃ—হঃ।"

শরৎ মহারাজ যদিও স্বাভাবিক ধীর গম্ভীর কিন্তু ইচ্ছা করিলে নানারূপ কৌতুক ও ব্যঙ্গ করিয়া সকলকে খুব হাসাইতে পারিতেন। তাহার এইরূপ অনেক হাস্যোদ্দীপক গল্প ছিল অনাবশ্যক বলিয়া এস্থানে তাহা পরিত্যক্ত হইল।

এই সময় তিনি Sir Walter Scottএর নভেলগুলি খুব পড়িতেন এবং মাঝে মাঝে Lady of the Lake হইতে উদ্ধৃত করিয়া আবৃত্তি করিতেন। তখন তিনি যেন একটা ভাবরাজ্যে থাকিতেন, সর্ব্বদাই বিভোর ও সকলের কাছে বিনয়ী, সকলের কাছে কৃপা প্রার্থী। তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনস্রোত কোন্‌দিকে যাইবে তখন তিনি কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। এই সময় তার জীবনটা অতি মধুর ও ভালবাসাপূর্ণ ছিল। সারদানন্দ স্বামীর অধ্যয়ন।

অতুলচন্দ্র ঘোষ
ও
বর্ত্তমান লেখক

বর্ত্তমান লেখক অতিশয় চা খাইতেন তাহাতে Tea poison হইয়াছিল। ভাগলপুর, গাজিপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়া যদিও সুস্থ হইয়াছিলেন কিন্তু চা পান অভ্যাস একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। একদিন প্রাতে বর্ত্তমান লেখক গিরিশবাবুর বাড়ীতে যান। অতুল বাবু বর্ত্তমান লেখককে দেখিয়াই চা ত্যাগ করাইবার জন্য বাহিরের উঠানটিতে দাঁড়াইয়া অনেক ভৎর্সনা ও গাল মন্দ করিতে লাগিলেন। অবশেষে মনে করিলেন যে গিরিশ বাবুর মুখ দিয়া খুব ভৎর্সনা করাইবেন তাহা হইলে বর্ত্তমান লেখক চা পান ত্যাগ করিবে। গিরিশ বাবু তখন অতুল বাবুর নীচের বৈঠকখানাতে তক্তপাষের উপর দাঁড়াইয়া কাপড় পরিতেছিলেন। উঠানে হরেক রকমের লোক, তিনি শীঘ্রই কোথায় বেরিয়ে যাবেন। অতুল বাবু বলিলেন, "দেখ্‌চো মেজদাদা, ছোঁড়ার চা খেয়ে মুখে রক্ত উঠ্‌চে তবুও চা খাওয়া ছাড়বে না। তুমি একে ভাল ক'রে একবার ব'কে দাও না!" বর্ত্তমান লেখক নীরবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন বড় কাজীর কি ফতোয়া হয়। গিরিশ বাবু ফরসা কাপড়খানির কসি গুঁজিতে গুঁজিতে অতুল বাবুকে বলিতে লাগিলেন, "দেখ অতুল, তুমি নেশা ভাঙ্গ কর না তুমি আমাদের কথা বোঝ না, আমরা নেশাখোর লোক আমাদের থাক্ আলাদা ; আমি 'গোদো' মাতাল—মহিন চে'য়ো মাতাল। আমাদের মাতালদের ও এক থাক্, তুমি ও বিষয়ে কিছু বুঝতে পার্‌বে না।" বর্ত্তমান লেখক দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। অতুল

বাবু গিরিশ বাবুকে বলিলেন, "তুমি ত বেশ ব'ল্লে, কোথায় ছোঁড়াকে ধম্‌কাবে না উল্‌টো গাইলে। তা কে জানে বাপু তোমাদের মাতাল ফাতালের থাক্‌ তোমরাই বোঝগে যাও।"

কালীবেদান্তীর পীড়ার সময় কাশীপুরের ডাক্তার মতিলাল মুখোপাধ্যায় চিকিৎসা করিতে আসিয়াছিলেন। যদিও তিনি ব্রাহ্মভাবের লোক ছিলেন, কিন্তু শরৎ মহারাজের সহিত কথা কহিয়া এইরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, আলমবাজারের মঠের সন্নিকটে আসিলেই মঠে আসিয়া সকলের সহিত দেখাশুনা করিয়া যাইতেন। তিনি অতি উদারস্বভাব ও পরহিতৈষী লোক ছিলেন এবং সকলের নিকট বিশেষ আপনার লোক বলিয়া পরিগণিত হইতেন। শীতকাল, সকালে বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে, হাওয়াও চলিতেছে; বড় ঘরের সব দোর জানালা বন্ধ। দুই তিন জন ভিতরে বসিয়া গায়ে সামান্য কাপড় দিয়া জপ করিতেছেন, এমন সময় মতি ডাক্তার আসিয়া সহসা বড় ঘরটিতে ঢুকিলেন। সকল দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া তিনি বলিলেন, "লেপ কাপড় গায়ে দেওয়া চলে কিন্তু ঘর গায়ে দেওয়া ত কখনই দেখি নাই! দোর-গুলি খুলে দিন।" তিনি এমন কৌতুকচ্ছলে কথাটি বলিয়াছিলেন যে সকলে ঐ কথাটী লইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। ডাক্তার মতিলাল মুখোপাধ্যায়।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের প্রথমে যোগেন মহারাজের গ্রহণী রোগ দেখা দিল। প্রথমে তিনি ইংরাজী ঔষধ দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছিলেন, দার্জ্জিলিংএ একবার বায়ু পরিবর্ত্তন করিতেও

গিয়াছিলেন। তাহার পর উত্তর পশ্চিমের দুই একটি স্থানে গিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি গঙ্গাপ্রসাদ সেনের চিকিৎসার অধীন রহিলেন কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হইল না। তাঁহার শরীর ক্রমেই শীর্ণ হইতে লাগিল এবং পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আহার বিশেষ নিয়মিত ভাবে থাকিলে পীড়া কিঞ্চিৎ উপশম পাইত, পথ্যাপথ্যের কোন ব্যতিক্রম হইলেই পীড়া বৃদ্ধি হইত, কিন্তু তাহার মানসিকবৃত্তি তাহাতে কোন প্রকারে ব্যতিক্রম হয় নাই। সেই হাস্য মুখ, সেই অমায়িক ভাব, সেই সকলের জন্য মঙ্গল চিন্তা করা। নিজের শরীরের পীড়াকে গ্রাহ্যের ভিতর আনিতেন না। এই পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে ইহাতেই তাহার দেহত্যাগ হইয়াছিল

যোগানন্দ স্বামীর গ্রহণী রোগ।

আলমবাজারের মঠে বর্ষাকালে বিকালে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে। শরৎ মহারাজ ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিলেন তাই আক্ষেপ করিয়া অস্বাস্থ্যকর স্থানের নানাকথা কহিতেছিলেন এবং উপস্থিত ব্যক্তিরা কি উপায়ে ম্যালেরিয়ার প্রতিকার করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, "বাঙ্গালা দেশ একেবারে ত্যাগ করিয়া পাহাড়ের কোন স্থানে গিয়া মঠ স্থাপন করিলে ম্যালেরিয়ার আর ভয় থাকিবে না।" অপরে বলিলেন, "তিনি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) বাঙ্গালা দেশে থাকিয়া তপস্যা করিয়া গিয়াছেন, পচা ম্যালেরিয়ায় দক্ষিণেশ্বরে তিনি জীবন কাটাইয়াছেন, বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া যাওয়া হইতে পারে না।" এইরূপ নানা বিষয় কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময়

হরিশ, যিনি দক্ষিণেশ্বরে ও কাশিপুরের বাগানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের কাছে ছিলেন এবং মাথার একটু গোল হওয়াতে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন, তিনিও তখন উপস্থিত ছিলেন। হরিশ চুপ করিয়া ম্যালেরিয়ার কথা শুনিতেছিলেন। শরৎ মহারাজ হরিশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভাই হরিশ, আর তো এমন কোরে চলা যায় না।" সকলেই তখন বার-বাড়ীর সিঁড়ির সাম্নে পশ্চিমদিকের দালানটিতে বসিয়া-ছিলেন এবং পশ্চিমদিকের জানালা দিয়া পড়ন্ত রোদ আসিতেছিল। হরিশ ভক্তিভাবে করমর্দ্দন করিতে করিতে শরৎ মহারাজকে বলিল, "তা-তা-তা ভাই ও রকম করে চল্ চল্ চল্লে যদি ব্যামো হয় তবে এমন করে চল্‌লে হয় না" এই বলিয়া পদদ্বয় উচ্চে তুলিয়া হস্তদ্বয় ভূমিতে রাখিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

স্বামী সারদানন্দ ও হরিশচন্দ্র।

ঊর্দ্ধপদে ভ্রমণ বা Peacock march যাহাকে বলে হরিশ তদ্রূপ করিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সকলে তাহা দেখিয়া হাসিতে লাগিল কিন্তু তাহার কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। তখন কোন ব্যক্তি তার পা দুটো ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। হরিশ দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, "কেন শরৎ এই যে বল্লে পায়ে চল্লে ম্যালেরিয়া হয় তাই আমি হাতে চলেছিলুম।" সকলে তাহা শুনিয়া আরও হাস্য করিতে লাগিলেন। বোঝা গেল তার তখনও অপ্রকৃতিস্থ ভাব আছে।

সতীশচন্দ্র দত্ত এই সময়ে আলমবাজারের মঠে খুব

যাতায়াত করিতে লাগিল। তখন তাহার নিবাসস্থান গড়পারে ছিল এবং হুটকো গোপালের প্রতিবাসী হওয়ায় তার বিশেষ বন্ধু ছিল। সতীশচন্দ্র নরেন্দ্রনাথের গৃহী শিষ্য বলিয়া পরিচিতও হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ আহ্লাদ করিয়া তাহাকে "মুট্‌কু" নাম দিয়াছিলেন। এইজন্য অদ্যাপিও তিনি "মুট্‌কু" নামে অভিহিত হন। তিনি আলমবাজারের মঠে যাইয়া সকলের সেবা করিতেন, এইজন্য সকলের বিশেষ প্রীতি ভাজন হইয়াছিলেন।

অদ্ভুতানন্দ স্বামীর শিবরাত্রিতে শিব পূজা।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে শিব রাত্রিতে লাটু মহারাজ আলমবাজারের মঠে চার প্রহর শিবপূজা করিয়াছিলেন। তিনিই এ বিষয়ে বিশেষ উদ্‌যোগী ছিলেন এবং তাঁহার সহিতও দু'চার জন ছিল কিন্তু সকলে নয়। লাটু মহারাজ "হর হর মহাদেব" বলিয়া চীৎকার করাতে বাড়ী কাঁপিয়া গিয়াছিল। প্রভাতে যখন শিবপূজা সমাপ্ত হইয়াছে এবং গঙ্গামৃত্তিকার শিবগুলি বিল্বপত্র সমেত বাহিরে বাহির করিয়া রাখা হইয়াছে তখন কালীবেদান্তী ঈষৎ কৌতুকচ্ছলে বর্ত্তমান লেখককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হে! দেখ্‌চ লাটু কেমন সমস্ত রাত্রি শিবপূজা করেছে!" বর্ত্তমান লেখক গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "হ্যাঁ Man creates God and not God creates man অর্থাৎ মানুষ ঈশ্বর সৃষ্টি করে—ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করে না।" "তুমি যে হে বড় ফিলোজফার হয়েছ। একেবারেই যে অদ্বৈতবাদী! পূজাও কিছু কিছু আবশ্যক" এই বলিয়া কালীবেদান্তী হাস্য করিতে লাগি-

লেন। কারণ তখন তিনি ঘোর অদ্বৈতবাদী ছিলেন এবং তাহার মনের মত কথা বলায় তিনি তাই অত হাস্য কৌতুক করিয়াছিলেন।

ডাক্তার বিপিনচন্দ্র ঘোষ বাবুরাম মহারাজের খুড়তুতো ভাই এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত। তিনি সর্ব্বদা বলরাম বাবুর বাড়ী যাইতেন এবং অত্রস্থ ভক্তবৃন্দের চিকিৎসা করিতেন। তখন তিনি নরেন্দ্রনাথের আত্মীয়দের চিকিৎসা করিতে বা অন্যান্য কারণেও সর্ব্বদা দেখিতে যাইতেন এবং যোগেন মহারাজের প্রতি তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। সমস্ত ভক্তমণ্ডলীর সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় ও মেশামেশী ছিল, সেইজন্য তিনি ভক্তমণ্ডলীর ডাক্তার বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ডাক্তার বিপিন চন্দ্র ঘোষ।

কালীবেদান্তীর এক সময় বর্পি তৈয়ারি করিতে খেয়াল উঠিল। সে নানা পরিশ্রম করিয়া কড়ায় বর্পির থাসা করিয়া থালায় ঢালিয়া দিল এবং সুখাইয়া বর্পি তৈয়ার করিবার প্রয়াস করিল, কিন্তু কার্য্যে অনভ্যস্ত হওয়ায় তাহার বর্পি দোকানের মত উৎকৃষ্ট হইল না। কিন্তু অধ্যবসায়ী ব্যক্তি নিরুদ্যম হইবার নয়, এইটি তাহার জীবনের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। পুনরায় বর্পি তৈরি করিতে লাগিল, অবশেষে কৃত-কার্য্যও হইল। সাদা কুমড়ার বর্পি, আমলকির মোরব্বা প্রভৃতি করিতে লাগিল। এইরূপে তাঁহার দিন কতক মোরব্বা করিবার খুব খেয়াল উঠিয়াছিল।

শশী মহারাজ, শরৎ মহারাজ এবং আরও কেহ কেহ

কড়ায়ের ডাল খাইতে ভাল বাসিতেন এইজন্য মাঝে মাঝে কড়ায়ের ডাল হইত। কালীবেদান্তীর কিন্তু কড়ায়ের ডালে মহা বিরক্তি। কড়ায়ের ডালের নাম শুনিলেই তাহার সর্দ্দি উপস্থিত হইত এবং হাঁচিতে স্বরু করিতেন। এইজন্য অনেকে কড়ায়ের ডাল লইয়া তাহার সহিত কৌতুক করিতেন।

আলমবাজার মঠে ভূতের ভয়।

আলমবাজারের যে বাড়ীটি মঠের জন্য ভাড়া করা হইয়াছিল সেই বাড়ীর নীচের ঘরে আত্মহত্যা হইয়াছিল। মৃত ব্যক্তিরা বাহিরের বড় ঘরের নীচেকার এঁদো ঘরের দেওয়ালে কয়লা দিয়া শেষ বিদায় লিখিয়া গিয়াছিল। বাড়ীটিতে মঠ হইলে সেই খান্‌টি কলি ফিরাইয়া মুছিয়া ফেলা হয়। সাধারণ লোকে উহাকে ভূতের বাড়ী বলিত, এইজন্য অল্প মূল্যেই বাড়ীটি ভাড়া পাওয়া গিয়াছিল। বাড়ীটিতে মঠ হইলেও প্রথম কয়েক মাস সন্ধ্যার সময় লোক যাইতে ভয় করিত এবং দিনের বেলা সকলে জটলা করিয়া বলিত, "এখন বাড়ীটিতে হরি নাম হইতেছে আর ভূতের ভয় থাকিবে না" কিন্তু রাত্রে অন্ধকার হইলেই সকলের আবার ভূতের ভয় হইত।

একদিন গরমকালে বৈকালবেলা বর্ত্তমান লেখক "রেলির থান" পরিয়া গিয়াছে। ঘর্ম্মে কাপড়খানি সিক্ত হওয়ায় সিঁড়ির পশ্চিমদিকের দেওয়ালে যে জানালাটি ছিল তাহার গরাদেতে কাপড়খানি বাঁধিয়া রাস্তার দিকে ঝুলাইয়া দিয়াছিল। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল না, সুধু কাপড়খানি

সুখাইবার জন্য—কিন্তু রাত্রে কাপড়খানি তুলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। রাত্রিতে চন্দ্রের আলো ছিল, কাপড়খানি হাওয়ায় উড়িতেছিল তাহাতে রাস্তার লোক ও প্রতিবাসীরা ভূত বেরিয়েছে বিবেচনা করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইয়াছিল। তাহার পরদিন এক বৃদ্ধ সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিয়া ঘরটিতে বসিয়া তিনি প্রত্যক্ষ ভূত দেখিয়াছেন এইরূপ অলৌকিক গল্প আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাহার সৌজন্য ও হিতৈষীভাব দেখিয়া কেহই উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে পারিলেন না। গুপ্ত মহারাজ, শরৎ মহারাজ ও বর্ত্তমান লেখক ধীরে ধীরে চা পান করিতে লাগিলেন এবং ভূতের অলৌকিক গল্প শুনিতে লাগিলেন। ক্রমেই রাত্রি হইল, বৃদ্ধটি নিজের ভূতের গল্পে নিজেই এত অভিভূত হইয়াছিলেন যে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতে তাঁহার আর সাহস হইল না। অবশেষে তিনি গুপ্ত মহারাজকে লণ্ঠন ধরিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। গুপ্ত মহারাজের বয়স অল্প ও কৌতুক প্রিয়, হারিকেন্ লণ্ঠনটি লইয়া তাঁহাকে সিঁড়ি দিয়া অর্দ্ধেকটা নামিয়া ফস্ করে হারিকেন্ লণ্ঠনটি নিবাইয়া দিলেন এবং দ্রুতপদে উপরকার ঘরে চলিয়া আসিয়াই দরজাটিতে শিকল দিয়া দিলেন। বৃদ্ধটি ভয়ে "বাপরে মারে ভূতে ধ'র্‌লেরে" বলিয়া ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিলেন। কেহই তাহাতে কর্ণপাত করিল না। অবশেষে সিঁড়িতে বসিয়া ক্রন্দন সুরু করিল, তাহাতেও কেহ ভ্রূক্ষেপ করিল না। অগত্যা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রাস্তায় পড়িয়া প্রাণ ভয়ে

সদানন্দ স্বামীর জনৈককে ভূতের ভয় দেখান।

চোঁচা দৌড়। পাড়ায় গিয়া তিনি কত রকম নূতন ভূতের গল্প তৈয়ারী করিয়াছিলেন তাহা বলিবার নয়। কিন্তু তাহার পর থেকে তিনি আর আলমবাজারের মঠে ঢুকিতেন না। ভূতের গল্প লইয়া দিন কতক খুব হাসি তামাসা চলিয়াছিল।

সকলের পরিব্রাজক অবস্থায় নানা স্থানে ভ্রমণ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে গঙ্গাধর মহারাজ নরেন্দ্র নাথকে লইয়া উত্তর পশ্চিমে চলিয়া যান। তিনি আলমোড়া প্রভৃতি অনেক স্থানে এক সঙ্গে ছিলেন। হরি মহারাজ, রাখাল মহারাজ, শরৎ মহারাজ ও সান্ন্যাল মহাশয় ইঁহারা অনেকস্থানেই এক সঙ্গে ছিলেন। অবশেষে মিরাটে আসিয়া সকলে উপস্থিত হন। মিরাটে কয়েক মাস থাকিয়া সকলেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চলিয়া যান। শরৎ মহারাজ বরাহনগরের মঠে প্রথম ফিরিয়া আসেন। হরি মহারাজ আলমবাজারের মঠে ফিরিয়া আসেন। গঙ্গাধর মহারাজ প্রথম রাজপুতানায় চলিয়া যান, তাহার পর তুলসী মহারাজ ও কালীবেদান্তী যাইয়া গঙ্গাধর মহারাজকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। এই সময়কার ঘটনাবলী ঠিক স্মরণ নাই। কারণ সকলেই তখন পরিব্রাজক, কে কোন্ দিকে চলিয়া গেলেন এবং কাহার সঙ্গে কে গেলেন তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। এইসব বিষয়গুলি পরে যে এত মধুর ও প্রীতিপ্রদ হইবে তাহাও তখন কেহ বিবেচনা করেন নাই। সামান্য পর্য্যটকের বিবরণ, কেইবা আর স্মরণ রাখিয়াছিল! তবে অস্পষ্টভাবে যাহা কিছু স্মরণ আছে তাহাই সন্নিবেশিত হইল।

গঙ্গাধর মহারাজ আলমবাজারের মঠে ফিরিয়া আসিলেন। তখন তিনি কেবল রাজপুতানার আর তিব্বতের কথাবার্ত্তা কহিতেন। দিবা রাত্রই ভ্রমণের কথা চলিতেছিল। অবশেষে মঠের লোকেরা ক্লান্ত হইয়া পড়িল। কালীবেদান্তী কৌতুক-চ্ছলে বালকস্বভাব গঙ্গাধর মহারাজকে নানারূপ ব্যঙ্গ ও পরিহাস করিতে লাগিলেন। তিনি আলমবাজারের মঠ ত্যাগ করিয়া বাগবাজারে বলরাম বাবুর বাড়ী বা অন্যস্থানে থাকিতে লাগিলেন। তাহার নাম গঙ্গাধর এইজন্য গিরিশবাবু আদর করিয়া তাহাকে "Ganges" বলিয়া ডাকিতেন এবং লাটু মহারাজ তাহাকে "গোঞ্জিস্" বলিয়া ডাকিতেন। বাগ-বাজারে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত গঙ্গাধর মহারাজের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। প্রিয় মুখুজ্জ্যে বলরাম বাবুর বাড়ীতে বসিয়া তাহাকে একটা গল্পে লাগিয়ে দিতেন। গঙ্গাধর মহারাজ এমন হাস্য কৌতুক এবং মুখভঙ্গী ও চক্ষুর্দ্বয় বিকৃত করিয়া গল্প বলিতে পারিতেন যে দুই ঘণ্টা কাল বলিলেও তাঁহার ক্লান্তি হইত না। তাহার রাজপুতানা ও তিব্বতের গল্প সারগর্ভ; দুঃখের বিষয় তাহা তিনি সম্পূর্ণ লিখিয়া রাখেন নাই।

অখণ্ডানন্দ স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

গিরিশবাবু একটি মুসলমান ফকিরের গল্প অনেক বার বলিয়াছিলেন, গল্পটি অতি সারগর্ভ হওয়ায় এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল। কোনদেশে একটা গ্রামে একটা পাগল ফকির থাকিত। সে পাগ্ড়ির পরিবর্ত্তে মাথায় একটা খড় জড়িয়ে রাখ্ত, গায়ে কোন বস্ত্র থাকিত না, পরিধেয় ময়লা

ছেঁড়া কাপড় ; সে প্রায়ই গ্রামের জল যাবার সেতুর উপর বসে কেবল মাথা দোলাত। সেই গ্রামে ও তৎসন্নিকটস্থ অপর সকল গ্রামে যাইবার সেইটিই প্রশস্ত পথ। পাগলা সাঁকোতে বসিয়া উভয় পার্শ্বে বহুদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইত। যখন দেখিত দূর থেকে কোন বিদেশী আসিতেছে তখন সে দ্রুতপদে তাহার কাছে গিয়া আগন্তুক ব্যক্তির পুঁটুলিটি নিজের মাথায় লইত এবং তাহাকে গ্রামে আনয়ন করিয়া থাকিবার ও আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিত। পরে সেই আগন্তুক ব্যক্তি গ্রামান্তরে যাইবার ইচ্ছা করিলে তাহার পুঁটুলি ও দ্রব্যাদি লইয়া গন্তব্য গ্রামে তাহাকে পোঁছাইয়া দিত। কোন ব্যক্তির অসুখ করিলে পাগলা সমস্ত রাত্র তাহার সেবা করিত এবং বিধিমত নানা প্রকারে চেষ্টা করিয়া তাহাকে সুস্থ করিবার প্রয়াস পাইত। পাগলার আহারের কোন নিশ্চয় ছিল না এবং তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট গৃহ ছিল না। পাগলা বলিয়া লোকে দয়া ক'রে তাকে কিছু খেতে দিত। সেই গ্রামে এক মোল্লা ছিল। সে বিশেষ ভাবে মুসলমান শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছিল এবং মুসলমান ধর্ম্ম অনুযায়ী পাঁচবার নামাজ ও অপর সকল নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য করিত। জনসমাজে মোল্লার বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। মোল্লা পাগলাকে নামাজ করিতে ও রোজা রাখিতে বলিত, পাগলা কিন্তু তাহার কিছুই করিত না। অধিকন্তু ভগবানের নাম শুনিলে পাগলা ২০০ গাল পাড়িত। মোল্লা তাহার উপর বিশেষ রুষ্ট থাকিত এবং গ্রামস্থ

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের জনৈক মুসলমান ফকিরের গল্প বলা।

লোকদিগকে পাগলাকে গ্রাম থেকে তাড়াইয়া দিবার জন্য বলিত। কিন্তু গ্রামের লোকেরা এবিষয়ে কর্ণপাত করিত না। সকলেই পাগলাকে লইয়া হাসিত ও আমোদ করিত।

কয়েক বৎসর এইরূপে অতিবাহিত হইলে ঘটনাক্রমে একবার দেবদূত অদৃষ্ট গ্রন্থ (Book of fate) হাতে লইয়া সেই গ্রামে উপস্থিত হইলেন। গ্রামের সকলেই পরলোকে কার কি অবস্থা হইবে জানিবার জন্য দেবদূতের কাছে গেল ও আপন আপন অবস্থা জানিয়া আসিল। মোল্লা ব্যঙ্গচ্ছলে দেবদূতকে বলিল, "মশাই, এই পাগল কখন নামাজও পড়ে না, রোজাও রাখে না, আর আল্লার নামে গাল পাড়ে। দেখুন দেখি এ কোন্ নরকে যাবে ?" দেবদূত মোল্লার কথামত পুস্তকের নরকখণ্ড খুঁজিতে লাগিল এবং নরকখণ্ডের কোন স্থানে পাগলার নাম উল্লেখ পাইল না। মোল্লা হর্ষিত হইয়া বলিল, "লোকটা এত পাপিষ্ঠ যে নরকেতেও উহার নাম নাই।" তখন সকলেই তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত ও সবিশেষ জানিবার জন্য উৎসুক হইল। পুনরায় তাহারা দেবদূতকে বলিল, "মহাত্মন্! দেখুন দেখি আপনার পুস্তকের অপর অংশে আছে কি না ?" দেবদূত বলিলেন, "অপর অংশ স্বর্গখণ্ড।" "আচ্ছা এ পাগলার কি স্বর্গখণ্ডে নাম থাকিতে পারে ?" দেবদূত বলিলেন, "মর্ত্ত্যে জন্ম হইলে জীবের কার্য্য বিবরণ এই গ্রন্থে লিখিত থাকিবেই থাকিবে, ইহার কোন অন্যথা

দেবদূত ও মোল্লা।

নাই।" এই বলিয়া তিনি স্বর্গখণ্ড দেখিতে লাগিলেন। স্বর্গের প্রথম খণ্ডে পাগলার নামের কোন উল্লেখ নাই, সর্ব্বশেষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সপ্তমস্বর্গ দেখিতে লাগিলেন। সপ্তমস্বর্গের শ্রেষ্ঠ স্থানে পাগলার নাম দেখিলেন এবং তথায় লিখিত আছে যে একদিন এক শ্রান্ত ক্ষুধার্ত্ত বৃদ্ধ গ্রামে আসে, প্রায় মুমূর্ষু অবস্থা, পাগলা তাহাকে স্থান ও আহারাদি দিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল। মুমূর্ষু বৃদ্ধ সুস্থ হইয়া পাগলকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল। আর একটি অনাথ বালক তাহার কেহই ছিলনা, পাগলা তাহার থাকিবার ও আহারের বন্দোবস্ত করিয়া আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিল, পরে সে কৃতবিদ্য হইয়াছিল। পাগল অনেক রোগীর শুশ্রূষা এবং বিপন্ন ব্যক্তির জন্য শারীরিক পরিশ্রম করিয়াছিল। পারিতোষিক ও প্রত্যুপকারের কথা তাহার মনে কখন উঠিত না। এই সকল অপ্রকাশিত সৎকর্ম্মের জন্য শ্রেষ্ঠ স্থানে গতি হইবে। এই সকল কথা শুনিয়া সকলেইত পাগলাকে লইয়া বিশেষ আনন্দ করিতে লাগিল কিন্তু পাগলা দেবদূতের সুমুখে আল্লার নামে গাল পাড়িতে পাড়িতে মাথার ঝাঁকড়া চুলেতে একটি খড় বাঁধিয়া মাথা হেলাইতে হেলাইতে পথের উভয় দিকে খর দৃষ্টি করিতে লাগিল। কোন শ্রান্ত বিদেশী সেই গ্রামে আসিতেছে কি না এবং আসিলে তাহার সে কিছু সেবা করিতে পাইবে এইটি ভাবিতে লাগিল ও বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল।

দেবদূত ও পাগল।

সকলেই দেবদূতকে অনুনয় করিতে লাগিল, "মহাত্মন্! আমাদের এই মোল্লা দেহত্যাগের পর কোন্ স্বর্গে যাইবেন?" দেবদূত সপ্তম স্বর্গে দেখিলেন তাহাতে তাহার নাম নাই। ক্রমে ক্রমে একে একে নীচু স্বর্গ দেখিলেন, কুত্রাপি তাহার নাম দেখিলেন না। তাহার পর দেবদূত নরক খণ্ড দেখিতে লাগিলেন এবং প্রথম হইতে পর্য্যায়ক্রমে নিম্নস্তর নরক দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে সর্ব্ব নিম্ন নরকে মোল্লার নাম দেখিয়া সকলেই অবাক ও বিস্ময়ান্বিত হইল। তাহাতে লেখা আছে "মোল্লা একটি পিতৃহীন বালকের বিষয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছে, একটি গরীব বিধবার উপজীবিকাস্বরূপ একটি দুগ্ধবতী গাভি ছিল, মোল্লা সেটি আত্মসাৎ করিয়াছিল। জেকাত বা উদ্বৃত্ত আয়ের শত করা ৫৲ টাকা হিসাবে যাহা ধর্ম্মার্থে প্রদত্ত হয় সেই জেকাত উৎপীড়ন করিয়া অনেক অর্থ গ্রহণ করিয়াছে; এইজন্য মোল্লার নিম্নস্তর নরকে বাস হইবে।" গ্রামস্থ উপস্থিত ব্যক্তিরা সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যে যার নিজের গৃহে চলিয়া গেল। গিরিশবাবু গল্পটি সহৃদয় ভাবে অভিনয়চ্ছলে এমন বলিতেন যে তাহাতে শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করিত।

দেবদূতের মোল্লার জন্য স্বর্গখণ্ড দেখা।

একদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলরাম বাবুর বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে তথায় অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার কিছু পর যোগেন মহারাজ ও অপর দু'একজন সঙ্গে লইয়া গিরিশ বাবুর বাড়ী গেলেন। গিরিশ বাবু সম্ভবতঃ একটু

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে আগমন।

রংএ ছিলেন, তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিয়াই আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিলেন। কি করিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করিবেন, কি করিয়া আদর যত্ন করিবেন কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া একেবারে এলোমেলো হইয়া পড়িলেন। তিনি তাহার চাকর ঈশ্‌নেকে বাজার হইতে লুচি ও আলুর দম আনিতে বলিলেন, এবং প্রত্যহ যে কাঁসার থালায় খাইতেন সেই থালাখানি আনিতে বলিলেন। বৈঠকখানার ঘরে তোষক পাতা তার উপর লম্বা জাজিম, তাহার উপর গিরিশ বাবু কাঁসার থালায় লুচি ও আলুর দম রাখিলেন। জাজিমের উপর সকলে বসিয়া আছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এইরূপ অপরের ব্যবহৃত থালা ও অপরিষ্কৃত স্থানে খাইতে দ্বিধা বোধ করিয়াছিলেন। গিরিশ বাবু তখন একটু গোলাপী অবস্থায় ছিলেন, অমনি বলিয়া উঠিলেন, "কেন বলরামের বাড়ীতে খাইতে পারেন আর এখানে খেতে যত আপত্তি?"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশ বাবুর এইরূপ অকপট ভালবাসা ও শুচি অশুচি ভাবের কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ নাই দেখিয়া প্রীত হইয়া লুচি ও আলুর দম খাইতে লাগিলেন এবং মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। গিরিশ বাবু তখন ঈশ্‌নে চাকরকে বলিলেন, "দ্যাখ্‌দিকিনি সকালে পুঁইশাক ও চিংড়ি মাছের চচ্চড়ি হয়েছিল, সেটা খেতে বড় ভাল হয়েছিল—থাকে যদি নিয়ে আয়।" ঈশ্‌নে চাকর একটা পাত্র করে সকালকার পুঁইশাক চচ্চড়ি রান্না ঘর থেকে লইয়া আসিল ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের

থালায় ঢালিয়া দিল। যিনি অপর কেহ স্পর্শ করিলে বা কোন প্রকার অশুচি হইলে আহার্য্য জিনিষ খাইতে পারিতেন না তিনি কোন দ্বিধা না করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে পুঁইশাক চচ্চড়ি ও লুচি খাইতে লাগিলেন। যোগেন মহারাজ প্রভৃতি এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তগণের প্রতি মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "বলরামের কাছে বলরামের ভাব, গিরিশের কাছে গিরিশের ভাব।" গিরিশ বাবুর কি অকপট সরল ভালবাসা ছিল তাহারই এইটি উদাহরণ,—সে ভাব শুচি অশুচির অতীত অবস্থা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে আহার করা।।

ক্রমশঃ গিরিশবাবুর শ্রদ্ধা ভক্তির ভাব আরও গুরুতর হইয়া উঠিল। তিনি ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলিতে লাগিলেন, "আপনাকে আমার ছেলে হয়ে জন্মাতে হবে। সামান্য একটু খাইয়ে, তুটো কথা কয়ে আমার ভালবাসা বা আনন্দ পরিপূর্ণ হচ্ছে না। ছেলে হয়ে জন্মালে আমি সর্ব্বদা কোলে নিয়ে বুকে নিয়ে রাখ্‌বো।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব হাস্যচ্ছলে, একটু মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "যা তোর ছেলে হব কেন? তুই মোদো—আবার বুঝি তোর পচা দেহের ভিতর দিয়ে আস্‌বো? আমি তা পার্‌ব না। আমার বাপ ঋষি ছিল তাই তাঁর দেহের ভিতর দিয়ে এসেছিলুম" এইরূপ ঐকান্তিক ভালবাসা ও আনন্দপূর্ণ কথাবার্ত্তার পর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যোগেন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রদ্ধেয় গিরিশ চন্দ্র ঘোষ।

মহারাজ ও নিরঞ্জন. মহারাজ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া বলরাম বাবুর বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

একদিন যোগেন মহারাজ ও বর্ত্তমান লেখক গিরিশ-বাবুর বাড়ীতে গেলেন। গিরিশবাবু ও বর্ত্তমান লেখক চা পান করিবার পর গিরিশবাবু যোগেন মহারাজকে দেখিয়া প্রফুল্ল হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হ্যাঁরে যোগে, সেই ষ্টার থিয়েটারে লুচি খাওয়াটা কি হয়েছিল বল্‌তো?" যোগেন মহারাজ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "দূর শ্যালা, তুই তখন মাতাল হয়েছিলি, তোকে দেখে আমার প্রাণ আঁৎকে গেছ্‌লো। শ্যালা, আমি সাবর্ণ চৌধুরীর বাড়ীর ছেলে, ব্রাহ্মণ ছাড়া অপরের বাড়ীতে খাইনে, তুই কিনা সেদিন আমায় থিয়েটারে বসে লুচি খাওয়ালি! সেদিন আমার তুই জাত মেরে দিয়েছিলি।" গিরিশ বাবুর পূর্ব্ব কথা স্মরণ হওয়ায় খুব আনন্দ করিতে লাগিলেন ও পরে নিজেই বলিলেন, "ছাখ্‌ একদিন বিকাল বেলা ষ্টার থিয়েটারে ষ্টেজে বসিয়া আছি, অভিনেতৃগণ আশেপাশে বসিয়া সকলেই হাসি কৌতুক করিতেছে। চৈতন্যলীলা তখন দুএকবার অভিনয় হইয়াছে। এমন সময় ষ্টেজের উপর একজন ভদ্র লোক আসিয়া বলিলেন, 'দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস মশাই চৈতন্যলীলা দেখিতে আসিবেন।' তখন আমি চৈতন্যলীলা লিখেচি,—খুব নাম বেরিয়েছে, খুব অহঙ্কারও ভেতোরে। আমি বল্লুম, 'পরমহংস মহাশয়ের টিকিট লাগ্‌বে না—আর সকলের টিকিটের দাম লাগ্‌বে।' সকলে সন্ধ্যার

শ্রদ্ধেয় গিরিশ চন্দ্র ঘোষ ও যোগানন্দ স্বামী।



শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

।মেয় অভিনয় দেখিতে আসিলেন। অভিনয় সমাপ্ত হইলে আমি দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণপরমহংসের সহিত দেখা করিবার জন্য উপরে বসিবার স্থানে গেলাম। তিনি প্রীত হইয়া আমায় বলিলেন, 'এইবার তোমার পর্দ্দা উঠে যাবে' অর্থাৎ অভিনয়ের বিরামে ও প্রারম্ভে যেমন পর্দ্দা উঠে যায় এবং নূতন প্রকার দৃশ্য দর্শকের সাম্‌নে প্রকাশ হয় মনের আবরণি পর্দ্দাও সেইরূপ উঠে যাবে।' তখন মাল টেনে ছিলুম, কথাটার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু ভিতরে যেন একটা আশ্বাস ও আনন্দ উঠিতে লাগিল—এলো-মেলো অবস্থা। সামাজিকতা হিসাবে সাধু ও অভ্যাগত আসিলে কিছু মিষ্টমুখ করাইতে হয়। নূতন ভাবে প্রবোধিত হইয়া বাজার থেকে লুচি তরকারি ও কিছু মিষ্টি আনাইয়া সকলকে খাইতে বলিলাম।" গিরিশবাবু এই বিষয়টি এত উত্তেজিত হইয়া ও অভিনয় ভাবে বলিতে লাগিলেন যে প্রত্যেক কথাটি স্মরণ রাখা সম্ভবপর নয়, এইজন্য মর্ম্মার্থ দেওয়া হইল, কারণ সেইরূপ প্রাঞ্জল ভাষা অপরের পক্ষে সম্ভবপর নয়। সকলে একটু একটু লুচি মিষ্টি খাইল। যোগেন মহারাজ অপরের স্পর্শিত বিশেষতঃ থিয়েটারের স্থলে খাইতে সঙ্কোচ করিতে লাগিলেন। গিরিশবাবু তখন বিস্ফারিত নেত্রে আহ্লাদ ও গাম্ভীর্য্য মিশ্রিত স্বরে বলিলেন, "তুমি কেন খাচ্চ না হে? খেয়ে নাও?" গিরিশবাবুর সেই বিরূপাক্ষ নেত্র ও জগাই মাধাইয়ের ভাব দেখিয়া যুবক যোগেন মহারাজ ভয়ে ত্রস্ত হইয়া একবার লুচি খাইতে

ষ্টার থিয়েটারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রদ্ধেয় গিরিশ চন্দ্র ঘোষ।

লাগিলেন ও একবার গিরিশ বাবুর দিকে দেখিতে লাগিলেন তিনি লুচি চিবাইয়া খাইতে অবসর পাইলেন না কোঁৎ কোঁৎ করে গিলিয়া খাইতে লাগিলেন। গিরিশবাবু এইসময় একটু কৌতুক করিয়া যোগেন মহারাজকে বলিলেন, "কিরে যোগে তুই লুচিটা কি করে খেতে লাগ্‌লি?" যোগেন মহারাজ বলিলেন, "আমার খালি ভয় হতে লাগ্‌লো পাছে তুই কাম্‌ড়ে দিস্! তুই শ্যালা যে হাঁ কর্‌তে লাগ্‌লি, আর মুখ দিয়ে যে ভর ভর করে মদের গন্ধ বেরুতে লাগ্‌লো আমি লুচি মুখে দিয়েছি কি চোখে দিয়েছি তা বুঝ্‌তে পারিনি—শুধু একবার তোর মুখের দিকে চেয়েছি আর কখন পাতটা খালি হয় তাই দেখেচি।" এই সব কথার পর গিরিশ বাবু অতি আনন্দিত হইয়া খানিকক্ষণ খুব হাসিলেন, তারপর তিনি একেবারে স্থির ও গম্ভীর হইয়া রহিলেন যেন ভিতরে কিছু গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মজুমদার কথিত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

ইটালির দেবেন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয় তখন গিরিশ বাবুর কাছে লেখকের কার্য্য করিতেন। গিরিশবাবুর অনেক গ্রন্থই তাহার হস্তে লিখিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন অভিনয় দেখিতে যান। সম্ভবতঃ পূর্ব্ব কথিত যোগেন মহারাজকে লুচি খাওয়ান সেই একই উপাখ্যান হইবে, আমার ঠিক স্মরণ না থাকায় উপাখ্যানটি আমি দুই ভাগে বিভক্ত করিলাম। দেবেনবাবু বলিতে লাগিলেন, "অভিনয়ের পর গিরিশবাবু খুব মাল টেনেচেন এবং পরমহংস মহাশয়কে দেখিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছিলেন কিন্তু

কি বলিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি দেখাইবেন তাহা কিছু ঠিক করিতে পারেন নাই সেইজন্য মুখে যা এসেছে গাল দিয়া স্তবস্তুতি করিয়াছেন ;—উদ্দেশ্য প্রগাঢ় ভক্তি, ভাষা রূঢ় ও অশ্রাব্য। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে এরূপ পরুষ ভাষায় স্তবস্তুতি করিবার পর তিনি দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলেন এবং পরদিন একটু উত্তেজিত হইয়া ১০টার সময় আহারান্তে অনবরত ঘরের বারান্দার সম্মুখেতে পাইচারি করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "এ শ্যালা কোন থাকের ভক্ত ? আমার বাপ ঋষি তপস্বী ছিলেন আমার বাপকে গালি দিলে ?" পরদিন গিরিশবাবু স্নান আহার কিছুই করেন নাই, একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে, আকাশ মেঘলা—তিনি বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া আছেন ও মাঝে মাঝে চোখের জল পড়িতেছে। দেবেনবাবু বুঝাইতে লাগিলেন, "তুমি মদ খেলে যে কি হও তা বলা যায় না ; তোমার মুখের দৌড় থাকে না,—তোমার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। তোমার একেবারে জিবের বাঁধন থাকে না। যাকে যা বল্‌বার নয় তাই বল। চল দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তাঁর কাছে মাপ চাইবে চল।" গিরিশ বাবু জিদ্ করিয়া ঘরে বসিয়া রহিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দিকে মাঝে মাঝে তাকাইতে লাগিলেন। দেবেন বাবুর কথা শুনিয়া গিরিশ বাবু বলিলেন, "ব'লে বেশ ক'রেছি, আমার ভিতর যে ভাব উঠেছিল আমি তাই ব'লেছি, আমি অত ভাষা বুঝিনি। আর তুমি ব'লছো যে তাঁর কাছে মাপ চাইতে, তা কখন হ'তে পারে না। সে শ্যালা যদি

শ্রদ্ধেয় গিরিশ চন্দ্র ঘোষ ও দেবেন্দ্রনাথ

অন্তর্য্যামী হয় তাহলে কি সে বুঝ্‌তে পাচ্ছে না যে আমি সারাদিন নাইনি খায়নি, ব'সে ব'সে কাঁদ্‌ছি? সে শ্যাল যদি এইখানে এসে আমায় সান্ত্বনা করে তাহলে আমি খাব, নহিলে শুকিয়ে প্রাণত্যাগ ক'র্‌ব।" এমন দৃঢ়তা নির্ভরের সহিত গিরিশ বাবু এই কথাগুলি বলিলেন যে দেবেন বাবু আর প্রত্যুত্তর করিতে পারিলেন না। উভয়ে বসিয়া এই সব কথাবার্ত্তা কহিতেছেন এমন সময় দেখিলেন গলির মোড়ে একখানি ছ্যাক্‌ড়া গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। গিরিশ বাবু গলির দিকে চাহিয়া দেখেন যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ত্বরিতপদে গিরিশ বাবুর বাড়ীর দিকে আসিতেছেন। তাহা দেখিয়া গিরিশ বাবুর আর আনন্দের সীমা রহিল না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে আগমন।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যতই বলিতে লাগিলেন "গিরিশ শ্যালা মাতাল, আমার বাপকে গাল দিল ও শ্যালা কোন্ থাকের ভক্ত" ইত্যাদি ততই তিনি ভাবান্তর হইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল দাদাকে বলিলেন, "আমি বাগবাজারে গিরিশের বাড়ী যাব, সে বড় কাঁদছে।" অনেকে তাঁহাকে গিরিশ বাবুর বাড়ীতে যাইতে বারণ করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া রামলাল দাদাকে দৃঢ়স্বরে গাড়ী আনিতে আদেশ করিলেন। তখন দক্ষিণেশ্বর অঞ্চলে ভাড়া গাড়ী পাওয়া যাইত না। গাড়ী আনিতে হইলে বরাহনগরের বাজারের নিকট হইতে আনিতে হইত, সে

জন্য বিলম্বও হইত। ৺কালী বাড়ীতে গাড়ী আসিলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বিভোর অবস্থায় গাড়ীতে উঠিয়া কোচোয়ান্‌কে বলিতে লাগিলেন, "চালাও, খুব জোর্‌সে চালাও।" যেন গিরিশ বাবুর বাড়ীতে যাইবার বিলম্ব তাঁহার আর সহ্য হইতেছে না। অবশেষে বেলা ৪৷৷টা বা ৫টার সময় গিরিশ বাবুর বাড়ীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নাগ মহাশয় একবার গিরিশ বাবুর ঘরে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে গিরিশ বাবু নাগ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ নাগ মশাই, আপনার পিতার সহিত কি আপনার ধর্ম্মমতের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে?" এই কথা শুনিয়া নাগ মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "না, না, সে সব প্রভেদ মিটিয়া গিয়াছে; আমার পিতাও সারাদিন জপ করেন।" নাগ মহাশয় আরও বলিলেন, তাঁর পিতা যদিও সব সময় জপ করেন কিন্তু এখনও তাঁর ছেলের উপর যথেষ্ট ভালবাসা রয়েছে,—নিজের ছেলে এ জ্ঞানটা এখনও রয়েছে।" গিরিশ বাবু বলিলেন, "আপনার মতন এমন সন্তানকে স্নেহ ক'র্বে এত সৌভাগ্যের কথা।" নাগ মহাশয় তখন বুক ও মাথা দোলাইয়া বালকের ন্যায় অঙ্গভঙ্গী করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তাতে কি হলো মশাই, এ যে নঙ্গর ফেলে দাঁড়টানা হচ্ছে; ছেলের উপর ভালবাসা রেখে জপ ক'ল্লে মনটা কতদূর আর এগোয়?" নাগ মহাশয় কথাগুলা এমন মিষ্ট ও

দুর্গাচরণ নাগ।

স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বরে বলিতে লাগিলেন যে সকলেই স্থিরচিত্তে এক মন হইয়া তাঁহার কথাগুলি শুনিতে লাগিল। যদিও তখন নাগমহাশয়ের দেহ কৃশ, মাথায় কতকগুলি চুল ছিল কিন্তু তাঁহার মানসিক শক্তি জ্যোতিঃপূর্ণ নেত্রেই প্রকাশ পাইতেছিল। এরূপ তীব্র অন্তরভেদকারী, স্নিগ্ধ, মধুর আকর্ষণকারী চক্ষুর চাহনি খুব কম লোকের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ দৃষ্টির সাম্‌নে পাণ্ডিত্য, তর্ক বিতর্ক বা অন্য কোন প্রকার চাপল্যভাব স্থান পায় না। ইহা কেবল উচ্চাবস্থায় মহাত্মাদিগেরই ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ কথিত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্য নাগ মহাশয়ের আমলকী আনয়ন করা।

কাশীপুরের বাগানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একবার আমলকী খাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু তখন আমলকীর সময় ছিল না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব আমলকী খাইতে ইচ্ছা ক'রেছেন শুনিয়া নাগ মহাশয় দ্বিধা না করিয়া আমলকীর অন্বেষণে বেরিয়ে গেলেন। তিন দিন নানা স্থান ঘুরিয়া শেষে গুটি কতক আমলকী লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ইচ্ছা বা আজ্ঞা নাগ মহাশয়ের নিকট বেদ বাক্যের মতন ছিল। কঠোর তপস্যা করা আর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্য আমলকীর অন্বেষণ করা তাঁহার কাছে উভয়ই সমান ছিল। এইরূপ গুরুভক্তি জগতে বিরল এবং চিরকাল আদর্শ হইয়া থাকিবে।

একদিন সন্ধ্যার সময় বলরাম বাবুর বড় ঘরটিতে অনেকে বসিয়া আছেন। এমন সময় গিরিশ বাবু ডান্

দিক্‌কার কাপড়ে কতকগুলি পান রাখিয়া কাপড়ের কসিটী ট্যাঁকে গুঁজিয়া পূর্ব্বদিক হইতে দ্বিতীয় দরজার কাছে আসিয়া বসিলেন। গিরিশ বাবু বড় পান খাইতে ভাল বাসিতেন, সেইজন্য যেখানে যাইতেন সঙ্গে করে পান নিয়ে যেতেন। সেদিন তিনি বড় প্রফুল্ল, উত্তেজিত ও আপনভাবে বিভোর ছিলেন। গরমকাল, রাস্তার দিকের বারান্দা হইতে বেশ ফুর্‌ফুরে হাওয়া আসিতেছিল। গিরিশ বাবু ঘরে বসিয়াই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। সম্ভবতঃ শরৎ মহারাজকে লক্ষ্য ক'রে বলিতে লাগিলেন, "দেখ্ একদিন বিকাল বেলা বোস পাড়ার গলির মোড়ে গোঁসাইদের রকে ব'সে আছি দেখি যে বাগবাজার ষ্ট্রীট থেকে একখানি ভাড়াগাড়ী বলরামের বাড়ীর দিকে যাচ্ছে। গাড়ীখানার ভেতরে পেছন্‌কার গদীতে একটি লোক আর সাম্‌নের গদীতে দুটি কি একটি লোক বসেছিল। গোঁসাইদের রকে যারা ব'সে ছিল তারা ব'লে উঠ্‌ল, "ইনিই হচ্ছেন দক্ষিণেশ্বরের রাম-কৃষ্ণ পরমহংস।" আমিও মুখ ফিরিয়ে তাঁকে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম এবং তিনিও আমার দিকে তাকাইলেন। তখন প্রণাম পদ্ধতি বিশেষ কিছু জান্‌তুম না। তিনি প্রথমে গাড়ী থেকে দুহাত তুলে আমাকে প্রণাম করিলেন, আমিও তাঁহাকে প্রণাম কল্লুম। তিনি আবার আমায় সেই রকম করে প্রণাম করিলেন আমিও আবার তাঁহাকে প্রণাম কল্লুম। এইরূপে পরস্পর দুজনায় প্রণাম চলিল, শেষকালে আমি

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে প্রথম দর্শন করা।

বেদম্ হয়ে গেলুম আর তাঁহার প্রণামের সংখ্যা অধিক হলো। মনে মনে আমি ভাব্‌লুম এ পাগলটা আবার কি রকম! তিনি সকরুণ ভাবে আমার দিকে একবার চাহিলেন, আমার বুকের ভেতরটা যেন চন্ চন্ ক'রে উঠ্‌ল! তিনি তখন গাড়ী করে বলরামের বাড়ীর দিকে চলে গেলেন। আমি সেই রকে বসে রইলুম কিন্তু বুকের ভেতরটা তাঁর সঙ্গে বলরামের বাড়ীর ভিতর চলে গেল। তখন মন অভিমানে পূর্ণ, বলরাম ডাকেনি তার বাড়ীতে যাব? কিন্তু প্রাণটা অস্থির হয়ে উঠ্‌লো, যদি একবার কেউ মুখে বলে তা'হলে যাই। আমার মনটা তখন বড় অস্থির হয়ে উঠেছিল, কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলুম না। একটা গুরু বা যা হউক একটা কিছু পেলে বুকটা ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু সকলের উপরেই অবিশ্বাস—আর সকলের চেয়ে যে আমি বেশী বুদ্ধিমান ভিতরে এই অহঙ্কার। খানিকক্ষণ বাদে বলরামের বাড়ী থেকে একজন আমায় ডাক্‌তে এসে ব'ল্লে, 'আপনাকে পরমহংস মশাই ডাক্‌ছেন?' আমি ত চটি জুতা পায়ে দিয়ে খালি গায়ে দৌড়ে গেলুম। যাইবামাত্র আবার সেই আগেকার মতন প্রণাম চলিল, এবারও আমি পরাস্ত হলুম। আমি জিজ্ঞাসা কল্লুম, 'গুরুর আবশ্যক কি?' তিনি শুনিবামাত্র বল্লেন, "তোমার হয়ে গেছে! তোমার হয়ে গেছে! আর তোমার কিছু আবশ্যক নেই।" আচম্বিতে এই কথাটা শুনে আমার বুকে হঠাৎ একটা শান্তি এলো, আহ্লাদে আমার চোখে জল এসে পড়্‌লো।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রশ্ন করা।

এক নূতন ভাব যেন আমার বুকে এলো—জ্বলন্ত আগুন যেন জল দিয়ে নিভিয়ে দিলেন। খানিকক্ষণ নিজেকে সাম্‌লাইয়া ফের জিজ্ঞাসা কল্লুম, 'গুরু কি ?' তিনি বল্লেন, "সংযোজক অর্থাৎ ইষ্ট ও ভক্তের মিলন করিয়া দিয়া স্বয়ং অন্তর্দ্ধান হন।" জানত আমি থিয়েটারের লোক,—সেজন্য থিয়েটারের ভাষায় বলেছিলুম। সেইদিন থেকে আমার ভিতরে আর এক ভাব বহিতে লাগিল। প্রণামের কথা বলিতে বলিতে গিরিশ বাবু বলিয়া উঠিলেন, 'দেখ রাম অবতারে ধনুক বাণে জগত জয় হয়েছিল, কৃষ্ণ অবতারে বংশীধ্বনিতে জগত জয় হয়েছিল, এবার প্রণাম অস্ত্রে জগত জয় হবে।' গিরিশ বাবু কথাগুলি এমন ওজস্বি-ভাবে বলিতে লাগিলেন যে তাহা শুনিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল গিরিশ বাবু নূতন ভাবে প্রণামের ব্যাখ্যা করিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রণামে ও বিনয়ে যে একটা বিশেষ লক্ষণ ছিল এইটাই তিনি সেদিন সকলকে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। গিরিশ বাবুর কথা শুনিয়া সেইদিন সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন।

১৯০৮ বা ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে গিরিশ বাবুর বাড়ীতে খাওয়ান হয় ; তাহাতে অনেক লোক সমাগত হইয়াছিল। কথাপ্রসঙ্গে যীশুর কথা উঠিল। বাইবেলে একটি উপাখ্যান আছে যে কোন একটি স্ত্রীলোক অনেক দিন হইতে প্রদর রোগে ভুগিতেছিল। তাহার মনে ধারণা জন্মিল যে সে যদি একবার কোন রকমে যীশুকে ছুঁইতে

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের যীশুর উপাখ্যান শুনা।

পারে তা'হলে তাহার রোগ নিশ্চয়ই ভাল হইয়া যাইবে। এইরূপ মনে মনে করিয়া সেই স্ত্রীলোকটি একদিন যীশুর সঙ্গে দেখা করিতে যায়। গিয়া দেখে যে যীশু যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তাহার চতুর্দ্দিকে লোকে লোকারণ্য, ভিড়েতে লোকে ঠেলাঠেলি করিতেছে। কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটি যীশুকে সিদ্ধপুরুষ বা অবতার জ্ঞানে কোন রকমে যীশুর বস্ত্রাপ্রান্ত ছুঁয়ে যীশুকে স্পর্শ করেছিল, তাহাতে তাহার রোগ তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হয়। কিন্তু ভিড়ের ভিতর যীশুকে ছুঁতে তাঁহার শক্তি ক্ষয় হওয়াতে তিনি মুখ ফিরাইয়া পিটারকে (পাতর) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে আমায় স্পর্শ করিয়াছে? আমি টের পাচ্ছি কেহ আমাকে স্পর্শ করিয়াছে।' পিটার বলিলেন, 'এত ভিড়ের ভিতর কিছু কি স্থির ক'রে বলা যায়?' যীশু তখন বলিলেন, 'আমোদ দেখ্‌তে অনেকে ধাক্কা মেরেছে কিন্তু ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে একজন আমায় স্পর্শ করিয়াছে এবং তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।' এই ভাবের কথা-বার্ত্তা হইতে লাগিল। এই উপাখ্যানটি লইয়া উপস্থিত ব্যক্তিদিগের ভিতর আলোচনা হইতেছে এমন সময় সহসা গিরিশ বাবুর ভাবান্তর হইল। তিনি অপর এক ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন, ঘাড়ে মাথা যেন রাখিতে পারিতেছেন না, অনবরত এধার ওধার মাথা ঢুলাইতেছেন, চক্ষু নিমীলিত ও বাক্য শ্লথ হইয়া আসিল। তিনি ঐকান্তিক জ্বলন্ত ভক্তির সহিত মৃদু অস্পষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন, "বাঃ কি সুন্দর

যীশুর উপাখ্যানটি! ঠিক কথাই বটে, ঠিক কথাই বটে, হাজার হাজার লোক আমোদের জন্য যায়, একজন কি দু'জন দেখ্‌বার জন্য যায়। খুদিরাম চাটুজ্জের ব্যাটা গদাই চাটুজ্জেকে হাজার লোক দেখেছিল কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ক'টা লোক দেখেছিল? ওরে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ক'টা লোক দেখেছিল রে?" এই কথাটি বলিতে বলিতে তিনি স্থির হইয়া গেলেন,—যেন মহা গভীর চিন্তার ভিতর চলিয়া গেলেন। তাঁহার সেদিনকার ভাব দেখিয়া সকলেই বেশ অনুভব করিতে লাগিলেন যে রামকৃষ্ণ পরমহংস স্বতন্ত্র, গদাই চাটুজ্জে স্বতন্ত্র। অল্প কথার ভিতর তিনি একটা জ্বলন্তভাব জাগ্রত করিয়াছিলেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে গিরিশ বাবুর বিজ্ঞান শিখিবার ভারি ঝোঁক উঠিল। তিনি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের electricityর বক্তৃতা শুনিতে বৌবাজারে Science Associationএ যাইতেন এবং অতি মনোযোগ করিয়া experiment গুলা দেখিতেন। তখন তিনি ঠিক যেন বিদ্যার্থী বালক হইয়া যাইতেন। তিনি যে জগতের বহু বিষয় জানিতেন এবং স্বয়ং যে বহু পুস্তক লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন সে সব বিষয় তখন তাঁহার মনে থাকিত না। পণ্ডিত লোকদিগের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, সকল বিষয়ই তাঁহারা মনোযোগ এবং শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া শোনেন্। একদিন experimentএর পর মহেন্দ্রলাল সরকার খুব প্রফুল্ল হইয়া গিরিশ বাবুকে বলিলেন, "দেখ্‌লে, কেমন

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের বিজ্ঞান শিখিবার ইচ্ছা।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার।

cell battery থেকে electricity বেরিয়ে Magnetic needleটীকে বোদ্‌লে দিলে ?" গিরিশ বাবুর সহিত মহেন্দ্র লাল সরকারের পূর্ব্ব থেকেই বিশেষ জানাশুনা ছিল এবং কথার জবাবও চলিত। গিরিশ বাবু ফস্ ক'রে মহেন্দ্রলাল সরকারকে বলিলেন, "আপনার ঐ ভাঁড়টা (cell battery) যদি পৃথিবীর মত হ'ত আর ছুঁচ্‌টা যদি সুমেরু পাহাড়ের মত হ'ত তাহ'লে আপনার উত্তর দক্ষিণ কি ক'রে ঠিক হ'ত ?" তাহা শুনিয়া মহেন্দ্রলাল সরকার মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যাও, তোমার কেবল ঐ সব খুঁত ধরা।" কারণ পৃথিবীর বাহিরে যাইলে, অর্থাৎ অনন্ততে মিশে গেলে উত্তর দক্ষিণ বা উঁচু নীচু ব'লে কোন শব্দ থাকে না।

গিরিশ বাবু প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার ঔষধ দিবার এবং বই লিখিবার প্রথা অনেকবার বলিয়াছিলেন। নাটকের যে চিত্রটি বর্ণনা করা হইবে তিনি স্থির হইয়া সেই বিষয়টি ভাবিতেন। ভাবিতে ভাবিতে সেই দৃশ্যগুলা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত এবং কার্য্য-কারণ ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাহা প্রকাশ করিতেন। গিরিশ বাবু হাওয়ার ভিতর অলক্ষিত-লক্ষিত বস্তুকে দেখিতেন এবং বিভোর হইয়া ভাষায় তাহা বলিয়া যাইতেন। এইজন্য অপর ব্যক্তিকে তাঁহার কথাগুলি লিখিয়া লইতে হইত। তাঁহার বলিয়া যাইবার সময় লেখক যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেন তাহা হইলে তিনি বড় বিরক্ত হইতেন, এমন কি পরে লেখককে ভর্ৎসনা করিতেন। তিনি পশ্চিমদিকের

উপরকার ছাদেতে পায়চারি করিতেন এবং কি যেন দেখিতেছেন এইরূপ ভাবে বিভোর হইয়া অনর্গল বলিয়া যাইতেন। এই ভাবটি তিনি তাঁহার পুস্তকেতেও প্রকাশ করিয়াছেন। "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে" উত্তরা দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"সঙ্গীতের আছে কি আকার ?" অর্থাৎ প্রত্যেক ভাবের (idea) একটা স্পষ্ট রূপ আছে। ভাবের এই রূপটি স্পষ্টাক্ষরে না দেখিতে পাইলে উপলব্ধি হয় না। সেইজন্য এই দার্শনিক তথ্যটি গিরিশবাবু তাঁহার পুস্তকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিবার প্রথা।

গিরিশ বাবু হোমিওপ্যাথিক ঔষধে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। পাড়ার লোকদিগকে তিনি ঔষধ দিতেন। পীড়ার কারণটি সমস্ত শুনিয়া স্থির হইয়া ভাবিতেন এবং সেই পীড়াটি প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইত। সেই ভাবটি রোগীর কোন্ যায়গাটায় ক্ষত হইয়াছে বা বিপর্য্যস্তভাব ধারণ করিয়াছে স্পষ্ট দেখাইয়া দিত এবং কি ঔষধ ও উপকরণ দিলে সেই স্থানটি পরিপূর্ণ হইবে তাহাও প্রত্যক্ষ করাইয়া দিত। গিরিশ বাবু তদনুযায়ী ঔষধ রোগীকে দিতেন। এই একাগ্রতা ও প্রত্যক্ষদর্শন ক্ষমতা থাকায় তিনি সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠতালাভ করিয়াছিলেন।

একদিন গিরিশ বাবু গঙ্গার ধার হইতে বেড়াইয়া বাগ বাজার ষ্ট্রীট্ দিয়া নিজের বাড়ীতে ফিরিতেছিলেন, সঙ্গে কেহ ছিল না, একাকী আপন মনে স্বচ্ছন্দে পাইচারি করিতে করিতে আসিতেছিলেন। খানিকটা আসিলে বর্ত্তমান লেখক

গঙ্গার দিক হইতে আসিয়া পাছে গিরিশ বাবুর কোন চিন্তায় ব্যাঘাত জন্মায় তজ্জন্য তাঁহার কিছুদূরে পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলেন। গিরিশ বাবু ধীর পদবিক্ষেপে রেলের অপর পার্শ্বে বুড়ো ভট্‌চার্জ্জি কেমন ক'রে খড়ম পায়ে দিয়ে ঘটি ক'রে তুলসী গাছে জল দিচ্ছে, ঘরের ভিতর গিয়ে লোককে ব'ক্‌ছে আর সেই সময় কেমন ক'রে চোখ মুখ ঘোরাচ্ছে এবং নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি ক'চ্ছে সেই সমস্ত ঘটনাটি তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিজের মনের মধ্যে ফটোর মত তৎক্ষণাৎ যেন তুলে নিচ্ছেন। আবার কিছুদূর গিয়া একটি মুদীর দোকানে কেমন ক'রে মুদী ধামার চালগুলা দু'হাতে উঁছলে উঁছলে চূড়োপানা ক'চ্ছে, দাঁড়িপাল্লাটি কি ক'রে ঝাড়্‌ছে ও একটির উপর আর একটি দিয়ে কি ক'রে ঘুরিয়ে পাতার উপর ডাণ্ডিটা কাৎ ক'রে রাখ্‌ছে, কেমন ক'রে মুদীর দোকানের জিনিষপত্তর সব একটির পর একটি সাজিয়ে রাখ্‌ছে গিরিশবাবু সেই সমস্তগুলা স্থিরচিত্তে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর একটি ফুলুরির দোকানের কাছে দাঁড়াইয়া তাহারা কেমন ক'রে মেঝেতে মাতুর পেতে সকলে মিলে ব'সে একটি পিঁড়ে বার ক'রে তাতে পাশা চাল্‌ছে এবং সেই পাশা চালা ও তার দান পড়্‌বার সময় সকলে কেমন মুখভঙ্গি করিয়া হর্ষ ও শোকের চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে সেই সমস্তগুলি তিনি তথায় দাঁড়াইয়া ফুলুরির দোকানের আড্ডার ব্যাপারখানা স্থির মনে দেখিতে লাগিলেন, তাহাদের কথাবার্ত্তাগুলি যেন চুষে নিতে

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের মানব-জীবন দেখিবার প্রণালী।

লাগিলেন। সম্ভবতঃ ফুলুরির দোকানের লোকেরা তাঁহাকে চিনিত না সেইজন্য তাহারা গিরিশ বাবুকে ভ্রূক্ষেপও করিল। তাহার পর গিরিশ বাবু ধীরে ধীরে পুনরায় চলিতে লাগিলেন এবং পরে বর্ত্তমান লেখকের সহিত কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

গিরিশ বাবুর ভাব ছিল—'কোন জিনিষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বলিয়া গণ্য করিও না; প্রত্যেক জিনিষটিকে শ্রদ্ধা করিয়া দেখিবে কারণ তাহার ভিতর অনেক জানিবার ও শিখিবার জিনিষ আছে এবং এক সময়ে সেই সমস্ত জিনিষ কোন না কোন বিশেষ কাজে লাগিবে।' যে মহৎ সে প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক কার্য্যের ভিতর মহৎকে দেখিতে পায়। যে নিজে হীন সে জগতের প্রত্যেক বস্তুকে হীন ও তুচ্ছ বলিয়া দেখে। গিরিশ বাবু সকল কার্য্যে ও কথাতে এই ভাবটি প্রকাশ করিতেন।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবনের বিশেষত্ব।

গরমকালে গিরিশ বাবুর বাড়ীর পশ্চিম দিকের দোতলার খালি ছাদের উপর মাদুর পাতিয়া অনেকে বসিতেন। বাড়ীর পশ্চিম দিকে তখন অনেক খালি জায়গা পড়িয়াছিল এবং কোণের দিকে পুকুরে তখনও জল ছিল ও তাহার ঘাট বাঁধান ছিল। কতকগুলি রাস্তার খোয়াপেটা উড়ে পুকুর পাড়ের খালি জমিতে কুঁড়ে বাঁধিয়া বাস করিত। একদিন বৈকাল বেলা মাদুর পেতে সকলে ব'সে আছে ও নানা রকম কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় পুকুর পাড়ের দিকের উড়েগুলো খচমচ ক'রে বাজনা বাজিয়ে যাত্রা সুরু ক'ল্লে।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের উড়ের যাত্রা শুনা।

উপস্থিত সকলেই উড়েদের বাজনা ও যাত্রা শুনিয়া বিরক্ত হইয়া গালমন্দ করিতে লাগিল। গিরিশ বাবু কিন্তু হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া পশ্চিম দিকের গোল থামের উপর বাম হাতটা রাখিয়া এবং তাহার উপর বাম গালটা পাতিয়া এক দৃষ্টিতে নিস্পন্দ হইয়া স্থিরভাবে উড়েদের যাত্রা প্রকরণ দেখিতে লাগিলেন। ছাদেতে কেহ নূতন লোক আসিল, কি কেহ চলিয়া গেল সে বিষয়ে কোন হুঁস নাই। কে কি গল্প করিতেছে বা কে কি বলিতেছে সে সব বিষয়ে তিনি যেন কিছুই শুনিতে পাইতেছেন না। উড়ে যাত্রাতে তাঁহার মন একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। এমনিভাবে প্রায় এক ঘণ্টা উড়ে যাত্রা শুনিয়া তিনি পুনরায় মাদুরে আসিয়া বসিলেন। কিন্তু অন্য ভাব, যেন কোন গভীর চিন্তায় রহিয়াছেন আর সেই ভাবটি কি ভাবে কার্য্যে লাগাইবেন সেইটি যেন তাঁহার মুখে বিকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার গ্রন্থে যে এই প্রকার বহুবিধ ভাব আছে তাহা তিনি এইভাবেই শিখিয়াছিলেন।

একদিন দুপুরবেলা বর্ত্তমান লেখক গিরিশ বাবুর বাড়ীতে গিয়াছিলেন। শরৎ মহারাজ সেদিন গিরিশ বাবুর বাড়ীতে আহার করিয়াছিলেন। গিরিশ বাবু বাড়ীর ভিতরে, শরৎ মহারাজ সবে আঁচাইয়া ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন এমন সময় বর্ত্তমান লেখককে দেখ্‌তে পেয়ে ব'লে উঠ্‌লেন, "ওহে, যদি আর একটু আগে আস্‌তে তা হ'লে জি, সির একটা

রগড় দেখ্‌তে পেতে। ভাত বাড়্‌তে একটু দেরী হ'য়েছিল সেই সময়ে জি, সি দুটো হুলো বেড়াল কেমন ক'রে ঝগড়া করে সেইটি দেখাতে লাগ্‌লো।" তখন বাহিরে কেহ ছিল না এইজন্য শরৎ মহারাজ উত্তেজিত স্বরে নিজেই গিরিশ বাবুর বেড়ালের ঝগড়ার অভিনয় করিতে লাগিলেন। উপুড় হ'য়ে শুয়ে মুখটা উপর দিকে বাঁকিয়ে ডান হাতে থুলো মারিতে লাগিলেন এবং মাঝে মাঝে নানারূপ স্বর করিয়া ম্যাউ ম্যাউ করিয়া আওয়াজ করিতে লাগিলেন। শরৎ মহারাজের অভিনয়টি বেশ সুন্দর হইয়াছিল, তাহা হইলে গিরিশ বাবুর অভিনয় কত সুন্দর হইয়াছিল তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। এই উপাখ্যানটির উদ্দেশ্য এই যে, গিরিশ বাবু অতি সামান্য জিনিষকেও শিখিবার ও সাধনার জিনিষ বলিয়া লইতেন। এইজন্য তাঁহার নাটকগুলিতে এই রকমের চিত্রগুলি অতি নিখুঁত ও নির্ভুল হইয়াছে।

স্বামী সারদানন্দ ও বর্ত্তমান লেখক।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের অষ্টমী পূজার দিন বর্ত্তমান লেখক যখন গাজীপুরের মুন্সেফ্ শিরিশ চন্দ্র বসুর সহিত্ পাওহারি বাবাকে দর্শন করিতে যান তখন পাওহারি বাবার প্রধান শিষ্য একটি উপাখ্যান বলিয়াছিলেন। পাওহারি বাবার আশ্রমে তখন দুইজন লোক থাকিতেন, একটি তাঁহার ভ্রাতা— খুব দীর্ঘাকৃতি পুরুষ এবং আর একটি তাঁহার শিষ্য, অধিকতর দীর্ঘাকৃতি এবং তাহার হাত, পা, বুকও সেই পরিমাণে দীর্ঘ ও প্রশস্ত। শিষ্যটি সাধু ছিলেন এবং অতি বিনীতভাবে

পাওহারি বাবার শিষ্যের আত্মকাহিনী।

আত্মকাহিনী কহিতে লাগিলেন। "তিনি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিয়াছিলেন। গঙ্গার ওপারের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে আমার জন্মস্থান ছিল। সংসার করিয়াছিলাম। অর্থ উপার্জ্জনের কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ডাকাতি করিতে সুরু করি। একদিন মনে করিলাম যে গঙ্গার ওপারে একটা বোকা সাধু (পাওহারি বাবা) থাকে তাহার কাছে চাল, ডাল, লোটা, কম্বল প্রভৃতি নিশ্চয়ই কিছু না কিছু আছে, সেই সব জিনিষ নিশ্চয় আনা যাইবে। গঙ্গায় তখন অল্প জল ছিল, ডাণ্ডাটা নিয়ে ত গঙ্গার খানিকটা হেঁটে, খানিকটা বা সাঁত্‌রে পার হয়ে পাওহারি বাবার ঘরে এসে উপস্থিত হইলাম। অন্ধকারে হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে একখানা কম্বল পাওয়া গেল। সেই কম্বলখানা মাটিতে বিচিয়ে চাল, ডাল আর সব যা কিছু পাওয়া গেল সেই সমস্ত একসঙ্গে বেঁধে নিয়ে বড় একটা গাঁটরি ক'রে পুনরায় গঙ্গা পার হইতে লাগিলাম। গঙ্গা পার হইয়া যেমনি ওদিক্‌কার কিনারায় গেছি এমন সময় পেছন ফিরে দেখি যে আর একটা লোক আমার মতন একটা পুঁটুলি লইয়া আমার পেছুনে পেছুনে আসিতেছে। তখন পালাবার জন্য আমি হন্‌হন্ ক'রে চল্‌তে লাগিলাম। সেও আমার পেছনে খুব জোরে চল্‌তে লাগ্‌ল। শেষে আমি দৌড়াইতে লাগিলাম সেও সেই দেখে দৌড়াইতে লাগিল। খানিকক্ষণ এইরূপ দৌড়াইয়া আমি হাঁফিয়ে পড়্‌লাম আর দৌড়াইতে পারিতেছিলাম না, তখন সেই লোকটি স্নেহভরে

পাওহারি বাবা

অতি মধুর কণ্ঠে আমায় পেছন থেকে বলিতে লাগিল, "দাঁড়াও দাঁড়াও, দৌড়াচ্ছ কেন? হাঁফিয়ে গেছ যে?" তাঁর গলার আওয়াজ শুনে আমি এক জায়গায় থেমে গেলুম, তখন পেছনকার লোকটি আমার কাছে এলো। আমি চোর কাজেই আমার প্রাণে ভয় হলো, তখন আমি চোরা গাঁটুরি রাখিয়া বলিলাম, "আমায় পুলিশের হাতে দেবেন না—আমায় মারবেন না—আপনার গাঁটুরি নিন আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার উপর দয়া করুন।" পেছনের লোকটি বলিলেন, "তুমি এত ভয় খাচ্ছ কেন? এত উদ্বিগ্ন হয়েছ কেন? অচেনা জায়গা কোথায় কি থাকে তুমি ত জানতে না সেইজন্য অনেক জিনিষ ফেলে এসেছ। তোমার ছেলেপুলে আছে তোমার ত জিনিষ পত্রের বিশেষ আবশ্যক তাই আমি বাকী জিনিষ সব তোমার বাড়ীতে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি—তা তুমি অত দৌড়িলে কেন? আমি আর তোমার সঙ্গে যেতে পাচ্ছি না, তুমি একটু ধীরে ধীরে চল জিনিষগুলি তোমার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসি।" পেছনকার লোকটি যখন আমার প্রতি ক্রোধ না করিয়া এমন স্নেহপূর্ণ স্বরে এই সব কথা কহিতে লাগিলেন তখন আমার বুকের ভেতরটা যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কি করেছি? কার বাড়ীতে চুরি কর্ত্তে গিয়াছিলাম? এরূপ সাধুর মনে আমি কষ্ট দিয়াছি? ধিক্ আমার ঘর সংসার। তখন আমি সাধুটির পায়ে জড়িয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, "আমায় একটু আশ্রয় দিন, এ

সংসারে আমায় দয়া করিবার কেহ নাই; আপনি আমায় কৃপা করে কাছে রাখুন।” অনেক অনুনয়ের পর তিনি সম্মত হইলেন এবং গাঁটরি লইয়া আমরা পুনরায় এইখানে ফিরিয়া আসিলাম। সেই থেকে আমি এখানেই আছি আর এঁর সেবা করিয়া থাকি। পূর্ব্বে আমি একজন চোর ছিলাম; সেই কথাই আপনাদিগকে শুনাইলাম—ইহাই আমার পূর্ব্বকাহিনী। শিষ্যটির বয়স তখন আন্দাজ ৫৫। ৬০ বৎসর হইয়াছে। তিনি এমন সরলভাবে আত্মকাহিনী বলিয়া গেলেন যে তাহা শুনিয়া মনে হইল যে লোকটী প্রকৃতই সাধু হইয়াছে এবং প্রাণে পরম শান্তি পাইয়াছে।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নবদ্বীপে গমন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী একবার নবদ্বীপ দর্শন করিতে যান, সঙ্গে শরৎ মহারাজ, যোগেন মহারাজ, প্রভৃতি ছিলেন। নবদ্বীপে শরৎ মহারাজ শুনিলেন যে, একজন ন্যায়রত্ন বা ন্যায়বাগীশ খৃষ্টান হইয়া গিয়াছেন। শরৎ মহারাজ বিস্মিত হইয়া সেই ন্যায়রত্নের সহিত দেখা করিতে যান। শরৎ মহারাজ তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে সেই পণ্ডিতটি সাদর সম্ভাষণ করিয়া শরৎ মহারাজকে বসাইলেন। ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যেমন হইয়া থাকেন তিনিও সেই রকমের লোক, বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না। বয়সে প্রবীণ এবং নানা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি ধর্ম্মপিপাসু হইয়া কোন শাস্ত্রে শান্তি না পাইয়া অবশেষে যীশুর ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তদবধি শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে বাইবেল

ও অপর ধর্ম্মগ্রন্থগুলি পাঠ করিতেন। তিনি খুব উদার এবং সাধক ছিলেন। শরৎ মহারাজ তাঁহার প্রতি প্রীত হইলেন এবং মনে মনে দুঃখ করিতে লাগিলেন যে নবদ্বীপের পণ্ডিত হইয়া শেষে তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। যাহা হউক ধর্ম্ম বিষয়ে খুব উচ্চ স্তরের কথাবার্ত্তা হইতেছিল এমন সময় জানালার ভিতর হইতে একটি মুরগি বাহির হইয়া ভট্টাচার্য্যের গায়ের উপর দিয়া, ঘর দিয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া পালক ও বিষ্ঠা ত্যাগ করিতে লাগিল। তাহার পর একটি স্ত্রীলোক সেই মুরগিটীকে ধরিবার জন্য এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল ও শেষে ধরিয়া লইয়া যাইল।

ভট্টাচার্য্য খানিকক্ষণ গুম হইয়া থাকিয়া সক্রোধে শরৎ মহারাজকে বলিতে লাগিলেন, "ইহাকেই বলে জ্যান্ত নরক ভোগ। আমি ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে, শিব পূজা, নারায়ণ পূজা না ক'রে ছেলে বেলায় কখন জল খাই নি। কপালের বিপাকে খৃষ্টান হইলাম এবং এই মুসলমান মাগীটাকে বিবাহ ক'র্‌তে হ'লো। বৃদ্ধ বয়সে এই মুসলমানের হাতে অন্ন খাইতে হইতেছে, আর ঘর-দোর, পুঁথীর উপর মুরগি বিচরণ করিতেছে, পালক ও বিষ্ঠা ত্যাগ করিতেছে এমন কি থালার ভাতেতেও মুরগি এসে ঠুক্‌রে যাচ্ছে। কথা কহিলে মহা ঝগড়া হয়; এর চেয়ে আর নরক যন্ত্রণা কি ব'লতে পারেন? গঙ্গার তীরে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মে এই দুর্গতি! আত্মহত্যা মহাপাপ, এই

স্বামী সারদানন্দ ও জনৈক ভট্টাচার্য্য।

জন্য করি নাই” এইরূপ কথা বলিতে বলিতে ভট্টাচার্য্য কাঁদিতে লাগিল। তাহার হৃদয়ের যন্ত্রণা দেখিয়া শরৎ মহারাজ বড় ব্যথিত হইয়াছিলেন। আলমবাজারের মঠে ফিরিয়া আসিয়া শরৎ মহারাজ অনেকের কাছে এ কথা বলিয়াছিলেন এবং মনে মনে ভট্টাচার্য্যের দুঃখের কথা ভাবিতেন।

নিরঞ্জন মহারাজ ও সত্যচরণ মিত্র।

নিরঞ্জন মহারাজ ও তুলসী মহারাজ একদিন সত্যকে (রাখাল মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের পুত্র) লইয়া ৭নং রামতনু বসুর গলির বাড়ীতে নরেন্দ্রনাথের মাতার সহিত দেখা করিতে আসেন। আত্মীয় হিসাবে নরেন্দ্রনাথের মাতা সত্যর দিদিমা হইলেন। নিরঞ্জন মহারাজ ও তুলসি মহারাজ সত্যকে রাগাইবার জন্য বলিতে লাগিলেন, “তুই ব্যাটা রাহুল” অর্থাৎ বুদ্ধদেবের ছেলে রাহুল যেমন ছিল রাখাল মহারাজের ছেলেও সেই রকম। তোর বাপ্‌কে সন্ন্যাসী করেচি তোকেও কোর্ব্বো। চল্ বেটা তোকে নিয়ে গিয়ে মঠে রেখে আসি।” সত্য বালক ছিল বটে কিন্তু তার গায়ে খুব সামর্থ্য ছিল। সে ত এই কথা শুনে রেগে নিরঞ্জন মহারাজ ও তুলসী মহারাজকে ছোট ছোট হাত দিয়া মারিতে লাগিল। সেদিন রাস্তায় খোয়া ঢালা ছিল সেই সব ঝামা খোয়া তুলিয়া তুলসী মহারাজ ও নিরঞ্জন মহারাজকে মারিবার উদ্যোগে ছুটিল এবং ইঁহারা দুজনায় “বেটা রাহুল, তোকে মঠে নিয়ে যাব” বলে ক্ষেপাইতে লাগিলেন। অবশেষে নরেন্দ্রনাথের মাতা আসিয়া সত্যকে কোলে লইয়া সান্ত্বনা করিলেন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে খেলিতে খেলিতে সত্যের বুকে একটা আঘাত লাগে তাহাতেই তার হৃদ্‌রোগ হয়। চিকিৎসার জন্য তাহাকে কাঁসারিপাড়ার সেনেদের বাড়ীতে, অর্থাৎ রাখাল মহারাজের মাতুলের বাড়ীতে রাখা হয়। শীতকাল, রাখাল মহারাজ অতি প্রত্যূষে বলরাম বাবুর বাড়ী হইতে রামতনু বসুর গলির বাড়ীতে আসিতেন এবং বর্ত্তমান লেখককে সঙ্গে লইয়া নিকটবর্ত্তী সেনেদের বাড়ীতে যাইয়া সন্তানকে দেখিয়া আসিতেন। এইরূপে তিনি নিত্যই দেখিয়া যাইতেন। যদিও তিনি বাহ্যিক কোন ভাব প্রকাশ করিতেন না এবং নবাগত ব্যক্তিরাও কিছু বুঝিতে পারিত না কিন্তু ভিতরে তাহার মন বড় চঞ্চল হইয়া থাকিত। আত্মগোষ্ঠীরা ইহা বেশ বুঝিতে পারিত। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল বা মে মাসে ছেলেটির মৃত্যু হয়। ইহাতে রাখাল মহারাজ বড়ই ব্যথিত হইয়াছিলেন। ইহার পর আর তিনি তাঁহার জন্মভূমি, বৈমাত্র ভাই বা আত্মীয় স্বজনের কোন উল্লেখ করিতেন না বা সংশ্রব ও রাখিতেন না।

স্বামী-ব্রহ্মানন্দ ও সত্যচরণ মিত্র।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোভাবের পর যোগেন মহারাজ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে লইয়া বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে সেই সময় কয়েকটি স্ত্রীলোকও গিয়াছিল। যোগেন মহারাজ ও অপর সকলে বলরাম বাবুর কুঞ্জে বাস করিতেন এবং একান্ত মনে জপ তপ ও সাধন ভজন করিতেন। যোগেন মহারাজ অতীব কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। চোবে ও পাণ্ডা

বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পাণ্ডাদের ভোজন করান।

ভোজন প্রথানুযায়ী একদিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী গুটি কতক চোবে ও পাণ্ডা নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশের লোকেরা তরকারি অতি আহ্লাদ করিয়া আহার করে সেইজন্য নিমন্ত্রিতদের তরকারি, ছোলার ডাল ও আলুর দম করিয়া ভোজন করাইতে আরম্ভ করেন। তারা চোবে লোক, লাড্ডু, পেঁড়া বর্‌ফি বোঝে—তরকারির তত ধার্ ধারে না। প্রথমতঃ তরকারি দিয়েছে, ক্ষুধার্ত্ত চোবে বাবাজীরা ত হাপ্‌রে দুগালেই তা মেরে দিয়েছে। গোলাপ মা পরিবেশন করিতেছিলেন। তিনি মনে করিলেন তরকারি ছোলার ডাল এরা ত কখন খেতে পায় না সেইজন্য অত চেটে-পুটে খাইতেছে। গোলাপ মা সেইজন্য আহ্লাদ ক'রে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "আর একটু ডাল দোবো কি বাবাজী?" এইকথা শুনিয়া চোবে বাবাজী অগ্নি মূর্ত্তি হয়ে ব'লে উঠ্‌লেন, "হাম ক্যেয়া বয়াল হ্যায় যে বয়ালকা খোরাক খিলাতা" অর্থাৎ ছোলা বয়াল খায় সেইজন্য ছোলার ডালটা বয়ালের খোরাক। ইহা শুনিয়া সকলেই ত অপ্রতিভ হইয়া হাসিতে হাসিতে সেস্থান হইতে পলাইয়া আসিলেন। অবশেষে সেই দেশের একজন আচার অভিজ্ঞ ব্যক্তি আঁচ্‌লা আঁচ্‌লা ক'রে লাড্ডু পেঁড়া প্রভৃতি কতকগুলা তাদের পাতে ঢেলে দিলে তবে চোবে বাবাজীরা একটু ঠাণ্ডা হয় ও মুখে হাসি আসে এবং সুস্থির হইয়া ভোজন করে। এইজন্য কৌতুকচ্ছলে যোগেন মহারাজ ছোলার ডাল প্রভৃতিকে বয়ালকো খোরাক্ বলিতেন।

যোগেন মহারাজ বরাহনগর বা আলমবাজার মঠ হইতে তীর্থ দর্শন করিতে চলিয়া যান। কিছুদিন তাঁহার আর কোন খবর পাওয়া যায় নাই। বাবুরাম মহারাজের মাতা ও আর কতকগুলি স্ত্রীলোক বৈদ্যনাথ তীর্থ দর্শন করিতে যান। স্ত্রীলোকের স্বভাবই এই—ঠাকুর দর্শন ও সাধু দর্শন করিবে। বৈদ্যনাথে বাবুরাম মহারাজের মাতা শুনিলেন যে কয়েক মাইল দূরে একজন ত্যাগী যুবা-সাধু এসেছেন; তাঁহার খুব উন্নত অবস্থা এবং অনেকেই তাঁহকে দর্শন করিতে যাইতেছে। বাবুরাম মহারাজের মাতা অতি সরল প্রাণ—সঙ্গে কিঞ্চিৎ মিষ্ট লইয়া এক পাণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া সেই সাধুর আশ্রমে চলিলেন। পাণ্ডা পথে ত্যাগী বাবাজীর অনেক গুণ-কীর্ত্তন করিতে লাগিল। বাবুরাম মহারাজের মাতা মনে করিলেন না জানি কি রকমই বা সাধু হবে; কত বড়ই না তার জটা হবে! তিনি যতই সাধুটির নিকটবর্ত্তী হইতেছেন পাণ্ডা ততই সাধুর বেশী করিয়া প্রশংসা করিতেছে। অবশেষে দু'জনায় একটি বাগান বা তপোবনে পৌঁছিলে পাণ্ডাটি তৎক্ষণাৎ সাধুর নিকট চলিল ও হাত মুখ নাড়িয়া বাবুরাম মহারাজের মাকে সাধু কোথায় বসিয়া থাকেন তাহা দেখাইতে লাগিল। বাবুরাম মহারাজের মাতা সাধুর কাছে গিয়াই সাধুটিকে চিনিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওগো এ যে আমাদের যোগীন, এ আবার সাধু হবে কেন? এ যে আমাদের বাড়ীর ছেলে! হ্যাঁরে যোগীন তুই বুঝি এখানে এসে সাধু হয়েছিস্ আর মেড়োদের

বৈদ্যনাথধামে যোগেন মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজের মাতা।

কাছে রুটি খাচ্ছিস্‌ ? কোথায় আছিস খবর দিস্‌নি কেন ? বাড়ী চ, খাবি চ, তোর ভাত্‌ না খেলে পেটের অসুখ হয় আর রো'দ্দুরে ব'সে সাধুগিরি কর্ত্তে হবে না।” যোগীন মহারাজ এই সকল কথা শুনিয়া না পারে গম্ভীর ভাবে থাকিতে না পারে হাসিতে। অবশেষে বদ্যিনাথে আসিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। যোগেন মহারাজ হাসিতে হাসিতে অভিনয়চ্ছলে সমস্ত ঘটনাটি মঠে নকল করিয়া বলিতেন।

যোগানন্দ স্বামী ও বর্ত্তমান লেখক।

বর্ত্তমান লেখক প্রত্যহ বৈকালে ৪টার পর বলরাম বাবুর বাড়ীতে যাইতেন ও যোগেন মহারাজের কাছে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকিতেন। যোগেন মহারাজের আনন্দ হইলেই গালি পাড়িতেন। কিন্তু গালিতে কোন তীব্রতা বা দুষ্যভাব থাকিত না। এমন মিষ্ট ভালবাসা পূর্ণ ভাব ছিল যে তাহা ভাষায় বলা যায় না—খালি তাঁহার ভাষাটা ছিল গালের ছন্দ। গাল একটু কমিলেই নিবন্ত প্রদীপকে উস্কাইয়া দিবার মত আবার একটু ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইত তাহলেই নানাবিধ ভাল প্রসঙ্গ শুনিতে পাওয়া যাইত—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশের মর্ম্ম ব্যাখা করিয়া বলিতেন। হাসি তামাসা চলিতেছে আবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চাঙ্গের সাধন ভজনের কথাও হইতেছে। এইরূপ উচ্চমনা, সরল প্রাণ, হাস্য কৌতুকপূর্ণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। যদি একদিন বর্ত্তমান লেখক তাঁহার নিকট না যাইতেন তাহা হইলে পরদিবস আহারের পর যোগেন মহারাজ দৌড়াইতে দৌড়াইতে ৭নং রামতনু বসুর

গলির বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং সমস্ত সংবাদ লইয়া বর্ত্তমান লেখককে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া যাইতেন। একদিন বলরাম বাবুর বাড়ীর বারান্দাতে বিকাল্ বেলা যোগেন মহারাজ পায়চারি করিতে করিতে বর্ত্তমান লেখককে বলিলেন, "তুই শ্যালা ত খুব বই পড়িস্, শ্যালা বল্ দিকিনি বাইবেলের শ্রেষ্ঠ কথা কি? যীশু তাহার শিষ্যদিগের শেষ কি কথা ব'লেছিল?" বর্ত্তমান লেখক কথাটা ভাল রকম বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। যোগেন মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "Love each other well." জানিস্ শ্যালা সব বাইবেলটা পড়াও যা আর এই কথাটা বোঝ্‌বার চেষ্টা করাও তা। যীশু এই জন্য শেষ সময় তাঁর শিষ্যদের এই কথাটি বলে গেছ্‌লেন। পরস্পরের প্রতি এই ভালবাসার জন্য গুটিকতক জেলে মালা লোক খৃষ্টান ধর্ম্মটা ছড়িয়েছিল। প্রথম খৃষ্টান দলের এইটাই ছিল মূলমন্ত্র, তাই তারা দাঁড়াতে পেরেছিল।" কথাটি অতি সত্য। যোগেন মহারাজ নিজে অতি উন্নত অবস্থার লোক ছিলেন বলিয়া তাহার চক্ষে এই কথাটি প্রথম ঠেকিয়াছিল।

যোগানন্দ স্বামীর যীশুর উপদেশ বলা।

সকলেই পশ্চিমে বাহির হইয়া যাইতেছে দেখিয়া শশী মহারাজেরও তীর্থ পর্য্যটনে যাইবার ইচ্ছা হইল। একদিন আলমবাজারের মঠ হইতে শশী মহারাজ অদৃশ্য হইলেন। মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল, সকলেই চিন্তিত হইলেন কারণ শশী মহারাজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবা ছাড়া অপর কোন জায়গায় যাইতেন না। কয়েকদিন কোন

খবর পাওয়া গেল না। অবশেষে শুনা গেল যে তিনি পদব্রজে মানকুণ্ড পর্য্যন্ত যাইয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন তখন আবার তাঁহাকে ফিরাইয়া আনা হইল।

রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীর তীর্থ যাত্রা।

শশী মহারাজ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে দুপুর বেলা একখানা লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া থাকিতেন। একে দারুণ গরম তাতে আবার লেপ মুড়ি, গা দিয়ে দর্দর্ করে ঘাম বেরুত; তাহা না হইলে শশী মহারাজের আরাম বোধ হইত না। সেইজন্য বর্ত্তমান লেখক তাঁহাকে ঠাট্টা করিতেন, "পোষে পোষকাম্ড়ি আর বৈশাখে ঝ্যাত্লা মুড়ি।" সেই কথা শুনিয়া বর্ত্তমান লেখককে শশী মহারাজ বলিতেন, "যা ছোঁড়া যা, ঠাট্টা কর্ত্তে হবে না; আমায় লেপ না মুড়ি দিলে ঘুম হয় না।"

সারদা মহারাজ অনেক জায়গায় যাতায়াত করিয়াছিলেন। তিনি কোন্ কোন্ স্থানে গিয়াছিলেন তাহা কাহারও বিশেষ স্মরণ নাই তবে যেটুক স্মরণ আছে তাহাই এখানে লিখিত হইল। একবার ৺কাশীধামে তিনি শিবানন্দ স্বামীর নিকট ছিলেন। একদিন জ্বর হওয়ায় খুব বমি করিতে লাগিলেন। বমির সময় তিনি বিকৃতস্বরে "আমি গেলাম, আমি গেলাম" না বলিতে পারিয়া "গিলি গিলি" করিয়া রব করিয়াছিলেন। সেইজন্য শিবানন্দ স্বামী আদর করিয়া তাঁহাকে "গিলি গিলি" বলিয়া ডাকিতেন। তাহার পর সারদা মহারাজ অন্য কয়েক স্থান ভ্রমণ করিতে করিতে খবর পাইলেন যে নরেন্দ্রনাথ

তখন গুজরাটে জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বেহারিদাসের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। সেই খবর পাইয়া সারদা মহারাজ সেইদিকে চলিলেন। নরেন্দ্রনাথ সারদা মহারাজকে ধরা দিবেন না এই উদ্দেশ্যে আগে আগে চলিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথের তখন ঘোর বৈরাগ্য, কাহারও সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা করিতেন না। অবশেষে কয়েকদিন সারদা মহারাজের সহিত দেখাশুনা না করায় তাঁহার পূর্ব্ব স্নেহ পুনরায় ফিরিয়া আসিল ; তখন তিনি সারদা মহারাজকে কাছে ডাকিয়া আনিয়া যত্ন করিয়া রাখিলেন।

নরেন্দ্রনাথ ও স্বামী ত্রিগুণাতীত।

নরেন্দ্রনাথের পিতা একখানি মলিদা চাদর ব্যবহার করিতেন। নরেন্দ্রনাথও পরে সেই মলিদা চাদরখানি ব্যবহার করিতেন। নরেন্দ্রনাথ গুজরাটে অবস্থানকালে নিজের চিহ্ন স্বরূপ সেই জীর্ণ চাদরখানি সারদা মহারাজকে পরাইয়া দিলেন। সারদা মহারাজ সেই জীর্ণ চারদখানি অমূল্য মনে করিয়া আলমবাজারে লইয়া আসিলেন। সেই সময় গরমকাল, দিনের বেলায় ট্রেনে করিয়া রাজপুতানার মধ্য দিয়া আসিবার কালে তিনি অজ্ঞান হইয়া গাড়ীর ভিতর পড়িয়া যান তাহাতে তাঁহার মাথায় আঘাত লাগিয়াছিল। তিনি আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসিয়া গুজরাট ও অন্যান্য দেশের নানাবিধ কথা বলিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথের প্রদত্ত চিহ্নস্বরূপ সেই জীর্ণ মলিদাখানি কখন মাথায় দিয়া, কখন বা বগলে লইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেন। একদিন আলমবাজার মঠের ভিতরদিক্‌কার পূর্ব্বদিকের খোলা ছাদে

ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাঁড়ার ঘরের সম্মুখে সকলে সমবেত হইয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। শশীমহারাজ কৌতুক করিয়া বলিলেন, "আরে সারদা, নরেন তোকে দেয় নাই আমাকে সবচেয়ে ভালবাসে তাই তোকে দিয়ে আমায় দিয়েছে।" নিরঞ্জন মহারাজ হাস্য করিতে করিতে গম্ভীর-ভাবে বলিলেন, "দূঃ শ্যালা তোকে দেবে কেন রে? তুই শ্যালা বেঁটে, তিন তাল মোহনভোগ খাস্, এ কি তোর উপযুক্ত? এ তোকে দেয় নি, শশীকেও দেয় নি, নরেন আমাকে কত ভালবাসে সেইজন্য তোর হাত দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে" এইরূপে সকলে বালকের মত নৃত্য ও আনন্দ করিতে লাগিলেন। জিনিষটি সামান্য হইলেও নরেন্দ্রনাথের ব্যবহৃত জিনিষ বলিয়া সকলে এত আনন্দ করিতে লাগিলেন। পরে সেই মলিদা চাদরখানির কি হইল তাহার কোন খবর জানা নাই।

ত্রিগুণাতীত স্বামীর মঠে পুনরাগমন।

সারদা মহারাজ আলমবাজার মঠে আসিয়া যদিও সাধারণের মত কাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার মাথার একটু ব্যারাম হইল। মাথায় রৌদ্র লাগিলেই কখন তিনি কাঁদিয়া উঠিতেন, কখন চীৎকার করিয়া উঠিতেন কখন বা রাগিয়া উঠিয়া একটু আধটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতেন। শশী মহারাজ ও নিরঞ্জন মহারাজ তাহাকে লইয়া বালকের ন্যায় কখন বা কৌতুক করিতেন, কখন বা আবার ধমকাইতেন। এইরূপে মাস কয়েক যাইবার পর সারদা মহারাজের "কাক চরিত" অর্থাৎ কাকেরা কতপ্রকার

ডাকে ও তাহার কি অর্থ ও ফল হয় তাহা জানিবার ইচ্ছা হইল। তিনি নানা স্থানে ঘুরিয়া কাক চরিতের ও ফলিত জ্যোতিষ বা গণৎকারের অনেক বই সংগ্রহ করিয়া বার-বাড়ীর এঁদো ঘরটিতে দোর বন্ধ করিয়া সেই সকল পুস্তক পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও একাগ্রতা অদ্ভুত ছিল। তিনি এক মনে সেই অন্ধকার ঘরটিতে বসিয়া সারাদিন কাকের নানা রকম ডাক্ এবং কোন্ দিনে কোন্ মুখে বসিয়া ডাকিলে তাহার কিরূপ অর্থ হয়, কোন্ গাছের ডালে বসিয়া কিরূপ ডাকিলে তাহারই বা কি অর্থ হয় এই সব অতি মনোযোগ সহকারে শিখিতে লাগিলেন। শশী মহারাজ ও কালীবেদান্তী কৌতুক করিয়া সারদা মহারাজকে পুকুরের পাড়ে নিমগাছের ডালে বসিয়া কাক ডাকিলে তাহার কি অর্থ হয়, করিতে বলিতেন আর সারদা মহারাজও পুস্তক লিখিত কাকের ডাক স্মরণ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতে থাকিতেন। এইরূপে তাঁহাকে লইয়া সকলে কৌতুক করিতেন। কিন্তু তিনি ফলিত জ্যোতিষ ও গণৎকারী বেশ শিখিয়াছিলেন এবং অনেকের ঠিকুজি দেখিয়া ফলাফল বলিয়া দিতেন। ব্যাপারটা যাহাই হউক না কেন সারদা মহারাজের অধ্যবসায় অদ্ভুত ছিল। শরৎ মহারাজ তাঁহাকে আহ্লাদ করিয়া সারদা নামটা পরিবর্ত্তন করিয়া সারিপুত্র (বুদ্ধদেবের শিষ্য) নামে ডাকিতেন।

ত্রিগুণাতীত স্বামীর "কাক চরিত" শিক্ষা।

প্রায় এক বৎসর পরে সারদা মহারাজ দার্জ্জিলিংয়ে যাইয়া সেখানকার উকিল শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। বাঁড়ুজ্জে গৃহিণী তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন, এবং তৎপরিবারে কিছুদিন বাস করিবার জন্য সারদা মহারাজকে অনুরোধ করিয়া রাখিলেন। তখন তাঁহার শরীর বেশ সুস্থ হইয়াছিল। কয়েক মাস পরে তিনি পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

ত্রিগুণাতীত স্বামীর আলমোড়ায় গমন।

কলিকাতায় কিছুদিন থাকিয়া সারদা মহারাজ আলমোড়ায় চলিয়া যাইলেন। তথা হইতে ধীরে ধীরে আস্‌কটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার মানস-সরোবরে যাইবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। আস্‌কটের রাজার বাড়ীতে কিছুদিন থাকায় রাজার মাতাঠাকুরাণী এরূপ সাধুর সহিত মানস সরোবর দর্শন করিতে যাওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া যাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন; কাজেই সারদা মহারাজেরও যাইবার বড় সুবিধা হইল। কিছুদূর যাইয়া বৃদ্ধা রাণীঠাকুরাণী কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু সারদা মহারাজের তীর্থ যাত্রার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়ায় তাঁহার যাইতে বিশেষ অসুবিধা হইল না। আস্‌কট ও আর দু'একটি যায়গা হইতে সারদা মহারাজ আলমবাজার মঠে চিঠি লিখিয়াছিলেন। বহুকালের ঈপ্সিত হর-পার্ব্বতীর বাসস্থান কৈলাস দর্শন করিতে যাইতেছেন,—কি আনন্দ—কি উৎসাহ—কি উল্লাস—কি শ্রদ্ধাভক্তি—বালকের ন্যায় আনন্দ করিতে করিতে তিনি হর-পার্ব্বতী,

দর্শন করিতে যাইতেছেন; প্রাণের আবেগ, সরল বিশ্বাস, ঐকান্তিক শ্রদ্ধাভক্তি—এই সকল ভাবগুলি তিনি চিঠিতে লিখিতেন। যথার্থই তাঁহার চিঠিগুলি অতিশয় হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল। তিব্বতের পথের সামান্য জিনিষটীও তাঁহার নিকট মহা পবিত্র বলিয়া বোধ হইত। কয়েক মাস পরে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। বলরাম বাবুর বাড়ীতে বসিয়া ইংরাজীতে তাঁহার তিব্বত ভ্রমণ কাহিনী কিছু লিখিয়া তিনি Indian Mirror পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ ছাপাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার লেখা সমাপ্ত হয় নাই।

ত্রিগুণাতীত স্বামীর ৺পুরীধামে গমন।

সারদা মহারাজ যখন কোন কার্য্যে হাত দিতেন তখন তিনি নিজের স্বাস্থ্য আহার ও নিদ্রা সব ভুলিয়া যাইয়া সেই কার্য্যে মাতিয়া যাইতেন। বরাহনগর মঠে অল্পদিন থাকিবার পরই তাঁহাকে B. A. পরীক্ষা দিবার জন্য তাঁহার পিতা অতিশয় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার ঘোর বৈরাগ্য, সেইজন্য তিনি ৺পুরীধামে চলিয়া যান। সেই সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, তাহাতে তিনি কোন প্রকার বিচলিত হন নাই। ৺পুরীধামে অবস্থান কালে তিনি বৈষ্ণবভাবে সাধন করিতে লাগিলেন অর্থাৎ গলায় কন্ঠি ও বহুমালা এবং তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তি ছোট একটু কাপড়ে বাঁধিয়া গলায় রাখিতেন। পরে একদিন প্রাতে এই অবস্থায় সারদা মহারাজ ৩নং গৌরমোহন মুখুজ্জের গলির বাড়ীতে নরেন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া ও আশ্বাস দিয়া

বরাহনগর মঠে যাইতে বলিলেন। নরেন্দ্রনাথের যখন পাথুরীর অসুখ হয় তখন ৭নং রামতনু বসুর গলির বাড়ীতে সারদা মহারাজ শুশ্রূষার জন্য আসিয়া থাকিতেন। তিনি Casselএর মুদ্রিত ছবিওয়ালা Shakespeareএর গ্রন্থগুলি পড়িয়া নরেন্দ্রনাথকে শুনাইতেন এবং নরেন্দ্রনাথ একটু সুস্থ বোধ করিলে সারদা মহারাজকে Shakespeareএর নানা গ্রন্থ ও কাব্যের বিষয় বুঝাইয়া দিতেন। বালক সারদা মহারাজ সম্মুখে বইখানি খুলিয়া রাখিয়া এক মনে নরেন্দ্রনাথের নিকট Shakespeareএর কাব্যের সহিত সংস্কৃত কাব্যের কোথায় মিল ও বৈষম্য আছে সেই সমস্ত স্থির হইয়া বসিয়া শুনিতেন। শুনিতে শুনিতে সারদা মহারাজের মুখে ধ্যানের ভাব ফুটিয়া উঠিত। তখন তিনি আর পড়িতে পারিতেন না, বইখানি বন্ধ করিয়া স্থির মনে জপ করিতেন। তিনি যখন বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন তখনও ঠিক এই রকম এক মন-প্রাণ হইয়া পড়িতেন। বৈকাল হইল, সূর্য্য অস্ত গেল, কিন্তু সারদা মহারাজের কোন হুঁস থাকিত না। অন্ধকার হইয়া আসিলে আলো জ্বালিয়া আবার পড়িতে বসিতেন এবং গভীর রাত্র পর্য্যন্ত পাঠ করিতেন। এইরূপে তিনি সংস্কৃত ও ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র বিশেষভাবে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার একটি বিশেষ গুণ ছিল যে, তিনি তিরস্কার, বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গে কখন ধৈর্য্যচ্যুত হইতেন না। সকল কাজই তিনি নিষ্ঠা করিয়া করিতেন

নরেন্দ্রনাথ ও ত্রিগুণাতীত স্বামী।

এবং তাহাই সাধনার পথ এইটি তাঁহার প্রবল ধারণা ছিল।

ত্রিগুণাতীত স্বামীর মোহন-ভোগ ভোজন।

সারদা মহারাজ অপূর্ব্ব ভাবে গঠিত হইয়াছিলেন। তিনি যেমন অল্প আহার করিতে পারিতেন, আবার তেমনি অধিক আহারও করিতে পারিতেন। কাশীপুরের বাগানে একদিন এককড়া মোহনভোগ তৈয়ারী হইয়াছিল। বেলা ৪ টা বা ৪॥ টার সময় উপস্থিত সকলেই যাহার যেমন ক্ষমতা তদনুযায়ী মোহনভোগ খাইলেন। সকলের খাইবার পরও কড়ায় অনেকটা মোহনভোগ পড়িয়া রহিল। ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছে না; এমন সময় দেখা গেল যে একটি খর্ব্বাকৃতি বালক স্কুলের বই হাতে উপস্থিত রহিয়াছে। নিরঞ্জন মহারাজ বালকটিকে শালপাতা করিয়া এক তাল্ মোহনভোগ খাইতে দিলেন। বালকটি ঠোঁটটি বুজিয়া তখনই মোহনভোগটুকু খাইয়া ফেলিল, দাঁত বা মুখ বেশী নাড়িল না। তখন আবার একতাল্ দিলেন, বালকটি সে টুকুও ঠোঁট বুজিয়া খাইয়া ফেলিল। বালকটি লাজুক ছিল, কথা কহিতে তত ইচ্ছুক নয়। তখন নিরঞ্জন মহারাজ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি রে এই বাকী মোহনভোগটুকু খেতে পারিস্?' বালকটি মাথা নাড়িয়া সম্মতি প্রকাশ করিল। তখন নিরঞ্জন মহারাজ বলিলেন, 'তবে খা দিকিনি?' বালকটিও তৎক্ষণাৎ বাকী সবটুকু খাইয়া ফেলিল।

একদিন সারদা মহারাজ ও আর দু'একজনের বলরাম

বাবুর বাড়ীতে বাবুরাম মহারাজের মাতার নিকট খাইতে যাইবার কথা ছিল। বাবুরাম মহারাজের মাতা তিন জনের মতন রুটী ও কুমড়ার ছোঁকা তৈয়ারী করিয়াছিলেন। কার্য্যগতিকে সারদা মহারাজ ছাড়া কেহই যাইতে পারেন নাই। অগত্যা সারদা মহারাজ একাই খাইতে বসিলেন। শরৎ মহারাজ ও অন্য কেহ না যাওয়ায় বাবুরাম মহারাজের মাতা বকাবকি করিতে লাগিলেন। পাছে রুটি ও তরকারী নষ্ট হইয়া যায় সেইজন্য সারদা মহারাজ একাই তিনজনের সমস্ত খাবার খাইয়া ফেলিলেন। বাবুরাম মহারাজের বৃদ্ধা মাতা সারদা মহারাজের এরূপ খাওয়া দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, পাছে অসুখ হয়। এইরূপ নানা প্রকার ভয়েতে বৃদ্ধা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিলেন। পরদিন প্রাতে সারদা মহারাজকে সুস্থ দেখিয়া তাঁহার উদ্বিগ্ন ভাব কমিল। নারীসুলভ স্নেহপূর্ণভাবে বাবুরাম মহারাজের মাতা বলিতেন, "সারদা কি খায়রে! ও অনেক পাহাড় পর্ব্বত ঘুরে বেড়িয়েছে, ও অনেক মোন্তর শিখেছে তাই উড়ো মোন্তরে উড়িয়ে দেয়, তা না হ'লে মানুষে কি অত খেতে পারে?"

ত্রিগুণাতীত স্বামীর বাবুরাম মহারাজের মাতার নিকট ভোজন।

এক সময় সারদা মহারাজের মনে কি হইল তিনি আহার কমাইয়া দিলেন। তিনি কয়েক মাস এক ছটাক চাউলের ভাত ও এক ছটাক লঙ্কাবাটা তাহাতে মাখিয়া আহার করিতেন। এইরূপ অল্প আহারে তিনি কয়েক মাস রহিলেন।

মানস সরোবর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সারদা মহারাজ তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত Indian Mirror পত্রিকায় কয়েকবার লিখিয়াছিলেন। সারদা মহারাজ যখন তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিতেছেন সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় বিজয় ও কৃতকার্য্যের সংবাদ কলিকাতায় আসিল। এই খবর শুনিবামাত্র সারদা মহারাজ অপর সকলের সহিত বিশেষ উল্লসিত হইয়া উঠিলেন।

দক্ষিণেশ্বরের উৎসব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব দক্ষিণেশ্বর ৺কালী বাড়ীতে তাঁহার গৃহী-শিষ্যেরা করিতেন। মনোমোহন মিত্র, হরমোহন মিত্র, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল ও রামদয়াল চক্রবর্ত্তী (দয়াল বাবু) প্রভৃতি এ বিষয়ে বলরাম বাবুর বাড়ীর বড় ঘরটিতে বসিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্যাগী শিষ্যেরা এ সমস্ত বিষয়ে বিশিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিতেন না। উৎসব উপলক্ষে সমস্ত ব্যয়-ভার গৃহী ভক্তেরা লইতেন এবং উৎসবের পর যে অর্থ উদ্বৃত্ত হইত তাহা পর বৎসরের জন্য জমা থাকিত। তখনকার কালে এখনকার হিসাবে লোকজন খুবই কম হইত অর্থাৎ ১ শত হইতে ৫ শত পর্য্যন্ত লোক হইত। তখনকার দিনে ঐ ভক্তমণ্ডলীর সমাবেশ অতি আনন্দপ্রদ ছিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের উৎসবের ভার সারদা মহারাজ নিজে সমস্ত লইলেন। এই বৎসর হইতে এক অদ্ভুত ব্যাপার হইতে লাগিল; সারদা মহারাজ গৃহী-ভক্তদের কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়া নিজে স্বাভাবিক অধ্যবসায়

ও অমানুষিক পরিশ্রম সহকারে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে লাগিলেন। অন্যান্য গৃহী-ভক্তরা দয়াল বাবুর সহিত মিলিত হইয়া "হোর মিলারের জাহাজ" ভাড়া করিয়া লইলেন। রাস্তার চারিদিকে বড় বড় প্লাকার্ড দড়ি দিয়া বাঁধিয়া টাঙাইয়া দেওয়া হইল। কীর্ত্তন ও অপর সকল বাদ্য সম্প্রদায়কে নিমন্ত্রণ করা হইল। পত্র ছাপাইয়া সর্ব্বত্র ভদ্রলোকদিগের বাড়ীতে পাঠান হইল। প্রসাদেরও সেইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল। মন্দিরের দক্ষিণদিকের বাগানে রন্ধনশালা হইল এবং তাহার সন্নিকটস্থ গৃহাদি ভাণ্ডার করা হইল। এই বৎসরের উৎসবে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অনেক ব্রাহ্ম-ভক্ত উপস্থিত ছিলেন এবং সুবিখ্যাত N. Ghoseও গিয়াছিলেন। ৺কালী মন্দিরের সম্মুখে 'নাটমন্দিরে' কালী কীর্ত্তন হইতে লাগিল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তখন ব্রাহ্ম-সমাজের সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার মাথায় জটা হইয়াছিল, কণ্ঠে অনেক মালা ধারণ এবং গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছিলেন। হুট্‌কো গোপাল ও বর্ত্তমান লেখকের প্রতি গোস্বামী মহাশয়ের লোকদিগের তত্ত্বাবধানের ভার ছিল। গোস্বামী মহাশয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বলিলেন, "নগেন, চল মা জগদম্বাকে প্রণাম করে' আসি" এই বলিয়া তিনি সকলকে লইয়া ৺কালী মন্দিরে প্রবেশ করিতে যাইলেন। গোস্বামী মহাশয় ৺কালী মন্দিরে ঢুকিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অতি ভক্তিভাবে

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং অপর সকলে নিজ নিজ ইচ্ছামত যথাযথ শ্রদ্ধাভক্তি দেখাইতে লাগিলেন। তাহার পর মন্দিরের উঠানে বসিয়া সকলে প্রসাদ পাইলেন। নানা শ্রেণীর পুরুষ ও পল্লীস্থ স্ত্রীলোকেরাও একসঙ্গে প্রসাদ পাইলেন। এইবারই প্রথম দেখা গেল যে সকল বর্ণের লোক একসঙ্গে প্রসাদ পাইতে কুণ্ঠিত হয় না। দুইজন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ প্রসাদ পাইতেছিলেন; একজন প্রসাদ পাইবার পর অপরকে বলিলেন, "এটা কেমন হ'লো হে? গঙ্গার ধার, কৈবর্ত্তর বাড়ী, উনছত্রিশ জাত একসঙ্গে বসে অন্ন খাইলাম—আমি ত কখন অপরের ছোঁয়া লেপা অন্ন খাই নি, কিন্তু আজ ত এই ছত্রিশ জাতের ছোঁয়া লেপা অন্ন খাইলাম। কি রকম হ'লো বল দিকিনি?" অপর ব্রাহ্মণটি বেশ ভক্তিমান লোক ছিলেন তিনি বলিলেন, "আচ্ছা খাইতে কি আপনার কোন দ্বিধা হইয়াছিল?" প্রথম ব্যক্তিটি বলিলেন, "তাহা হইলে খাইলাম কেন?" দ্বিতীয় ব্যক্তিটি বলিলেন, "কি জানেন এটা এ যুগের শ্রীক্ষেত্র—এ মহা প্রসাদ—ইহাতে কোন জাতিভেদ নাই এবং উচ্ছিষ্টও হয় না।" প্রথম ব্যক্তিটি পরম আহ্লাদিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক্ বলেছ, এই কথাটাই ঠিক্! এখন আমার মনের সন্দেহ গেল।"

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রসাদ ভোজন।

জাহাজ যখন বহু সংখ্যক নিশান উড়াইয়া ভরাভর্ত্তি লোক লইয়া ঘাটে আসিতে লাগিল তখন সকলেই উল্লাসে

জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। প্রতিবাসী মুসলমান স্ত্রীলোকেরা ছোট ঘাটটিতে জল আনিতে আসিয়া কল্‌সি কাঁকে করিয়া জন সংখ্যা ও বহু নিশান উড়ান জাহাজ দেখিতে লাগিল; তাহাদের মধ্যে একজন প্রবীণা অপর একজনকে বলিতে লাগিল, "ওগো জান, সেই গদাই ঠাকুর! গঙ্গার পাড়ে বসে···ক'রতো আর কাঁদ্‌তো। পাগ্‌লার ছেলেপুলে ছিল না তাই এখন জাহাজ ভরে সব ছেলেরা আস্‌চে।" স্ত্রীলোকটি কথাগুলি এমন মিষ্টভাবে বলিয়াছিল যে সেই শুনে সকলেই তাহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

মুসলমান স্ত্রীলোকদের উৎসব দর্শন

এই সময় স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে মাসিক সংবাদ পত্র স্থাপন করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। মান্দ্রাজে "ব্রহ্মবাদিন" নামক ইংরাজী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিবার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল এবং কলিকাতায়ও একখানি পত্র প্রকাশের কথা হইতে লাগিল। গুপ্ত মহারাজ উর্দ্দূ জানিতেন, তিনি উর্দ্দূ পত্র লিখিতে উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু অধ্যবসায়ী সারদা মহারাজ নিজেই এই সংবাদপত্রের ভার লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি অতি কঠোর পরিশ্রম করিয়া "উদ্বোধন" পত্রিকা স্থাপন করেন। বর্ত্তমান লেখক এই সময় উপস্থিত ছিলেন না সেইজন্য সমস্ত বিষয় পরিজ্ঞাত নন।

ত্রিগুনাতীত স্বামীর আমেরিকায় গমন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে স্বামী ত্রিগুণাতীত আমেরিকার কালি-ফোর্ণিয়া সহরে যাত্রা করেন এবং তথায় স্যানফ্রান্‌সিস্কো নামক স্থানে আশ্রম স্থাপন করেন। কিছুকাল তিনি তথায়

প্রচার কার্য্য করিবার পর জনৈক পাগল তাঁহাকে বোমা দ্বারা আঘাত করে এবং তাহাতে ক্ষতস্থান বিষাক্ত হইয়া কিছুদিন পরে তিনি দেহত্যাগ করেন।

একদিন বেলা ৯-৩০টা বা ১০টার সময় আলমবাজার মঠের রান্না-ঘরের ছাদের উপর সিঁড়ির দরজার সম্মুখে গরাদের কাছে কালীবেদান্তী দাঁড়িয়ে আছেন। কখন কাঠের গরাদের ভিতরে হাত দিচ্ছেন, কখন বা গরাদের উপর হাত দুটি রাখ্‌ছেন। ঠাকুরের ভাঁড়ার ঘরের কাছে অনেকে বসিয়া কুট্‌নো কুটিতে ছিল। কথা প্রসঙ্গে বলরাম বাবুর কথা উঠিল। তখন বলরাম বাবুর দেহত্যাগ হইয়াছে। সকলেই বলরাম বাবুর খুব সুখ্যাতি করিতে লাগিল। সম্ভবতঃ বাবুরাম মহারাজ কথা উঠাইলেন যে, 'বলরাম বাবু মঠে অনেক সাহায্য করিতেন এইজন্য তাঁহার প্রতি সকলের বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকা আবশ্যক।' এইভাবের কথা সকলেই কহিতে লাগিলেন। কালীবেদান্তী গরাদের নিকট দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া সকলের কথা শুনিতেছিলেন। তিনি কথাবার্ত্তায় প্রথমে যোগদান করেন নাই। তাহার পর একটু বিরক্ত ও দৃঢ়ভাব ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হ্যাঁ বলরাম বাবু তাঁহার ভক্ত ও আশ্রিত সেইজন্য আমাদের সকলের বলরাম বাবুর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ও সম্মান দেখান উচিত; কিন্তু দু'মুটো কে অন্ন দিয়াছে তার জন্য আমি কারুর কাছে মাথা হেঁট কর্ত্তে পারি না। তোদের হচ্ছে কি না 'অন্নদাতা ভয়ত্রাতা।' দু'মুঠো কে অন্ন দিয়েছে তার কাছে যোড়হাত

অভেদানন্দ স্বামীর আত্মনির্ভর ভাব

ক'রে থাক্‌বি, তার সুখ্যাতি কর্‌বি, তার খোসামোদ কর্‌বি— যাতে পরে সে আবার ভাত দেয়। আমি সন্ন্যাসী—দু'মুঠো ভাতের জন্য মাথা হেঁট কর্ত্তে পারি না। দু'মুঠো ভাত বা দু'খানা রুটী, এ দোরে না দেয় ও দোরে দেবে, সে দোরেও না দেয় ত তৃতীয় দোরে দেবে; তা বলে দুটি ভাতের জন্য কাহার নিকট মাথা হেঁট কর্ত্তে পারি না" এইভাবের কথা বলিতে লাগিলেন। কথাটা বাবুরাম মহারাজের উপর লক্ষ্য করিয়া হইতে লাগিল।

কালীবেদান্তী তখন আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া এমন ভাবে বলিয়া যাইতে লাগিলেন যে কেহ দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। কালীবেদান্তী যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও স্বাধীনচেতা লোক সকলেই সেদিন বেশ বুঝিতে পারিলেন। কালীবেদান্তীর সহিত যদি কাহারও কোন কথা না মিলিত তাহা হইলে তিনি স্পষ্টভাবে তাহার মুখের উপর বলিয়া দিতেন কোনরূপ দ্বিধা করিতেন না। এই স্বাধীনচেতা আত্মনির্ভরশীল ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ভাবগুলি কালীবেদান্তীর জীবনে বিশেষভাবে লক্ষিত হইত। এই সময় কালীবেদান্তীর তীব্র বৈরাগ্যভাব ছিল।

হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্প বলা।

যেদিন হৃদু মুখুজ্জ্যে শিবানন্দ স্বামীর সহিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও কেশব বাবুর কথা কহিয়াছিলেন, তখন তিনি নিম্ন লিখিত বিশেষ ঘটনাও বলিয়াছিলেন,— "একদিন নরেন দক্ষিণেশ্বরে গেছে। বিকেলে মামাকে জলখাবার জন্য গুটিকতক সন্দেশ দিয়েছে। মামা কোন জিনিষ নিবেদন না করিয়া খাইতেন না এবং অগ্রভাগও

কাহাকে দিতেন না। কিন্তু সেদিন নরেনকে আগে সন্দেশ খাওয়াইয়া পরে তিনি নিজে খাইলেন। এই কাজ দেখে ত আমি চম্‌কে উঠ্‌লুম এবং নহবতখানার উপরে শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণী ছিলেন তাঁকে বলিতে তিনিও চম্‌কে উঠ্‌লেন। কারণ মামা আগে থেকেই বলেছিলেন যে, 'ছাখ্‌ যখন আমি খাবারের আগ্‌ভাগ অপরকে দিয়ে পরে আমি খাব তখন জান্‌বি যে আমার দেহ আর বেশী দিন থাক্‌বে না।' একথা আমি ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী জান্‌তেম, তাই আমরা এত চঞ্চল হয়ে পড়লুম। সত্যি সত্যিই তাই হ'লো, কয়েক বৎসর পরই মামার দেহ গেল।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সন্দেশ খাওয়া।

শরৎ মহারাজ উত্তরাখণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আমাশয়রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, শরীর কৃশ ও দুর্ব্বল। একদিন প্রাতে চা পান করিয়া বর্ত্তমান লেখক ও শরৎ মহারাজ আলমবাজার মঠ হইতে পায়চারি করিতে করিতে বরাহনগর বাজারের নিকট চলিলেন। পথে রাধামঞ্চের কাছে একজন লোক একখানি খাঁড়া সানাইতেছিল। বর্ত্তমান লেখক খাঁড়া দেখিয়া বলিলেন, "বলি করা ঠিক নয়।" শরৎ মহারাজ বলিলেন, "কেন মাংস খেতে পার আর বাড়ীতে বলি করিলেই যত দোষ।" বর্ত্তমান লেখক বলিলেন, "মাংস খাওয়া এক ভাবের, আর ধর্ম্মের নামে জীব হত্যা করা অন্য ভাবের। ধর্ম্মটা হচ্ছে দয়া—সকলের প্রতি ভালবাসা থেকে উৎপত্তি। দয়া ভালবাসা যত বাড়ে, ধর্ম্মের মাহাত্ম্যও সেই ভাবে বাড়ে। কিন্তু ধর্ম্মের নাম ক'রে আর

একটা জীবের প্রাণ নাশ করা ইহা ভাল নয়। একটা জীব প্রাণরক্ষার জন্য যখন ব্যাঁ ব্যাঁ কচ্ছে তখন লোকের মনে কোথায় ভক্তি থাকে? কোথায় ভালবাসা থাকে? মাংস খাওয়া সে ত শরীরের কার্য্য, এর সঙ্গে ধর্ম্মের কি সম্পর্ক আছে? পশুবধ করিবার জন্য ত স্বতন্ত্র স্থান আছে, সেখানে করিলেই ত হয়; ধর্ম্মের নাম দিয়া অপরের প্রাণ নাশ করিবার কি আবশ্যকতা আছে?" শরৎ মহারাজ বলিলেন, "ধর্ম্মের সঙ্গে বলির সম্পর্ক আছে, শাস্ত্রে বলে 'দেবার্থে পশু হননম্।' শাস্ত্রে যেরূপ আছে তার খানিকটা ইচ্ছামত বাদ দিয়া ধর্ম্ম করিতে গেলে ধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হইতে পারে এইজন্য কোন অংশ বাদ দেওয়া উচিত নয়, পশু বলিরও আবশ্যকতা আছে।" শরৎ মহারাজ যদিও মুখে শাস্ত্র সমর্থন করিয়া তর্ক করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বেশ স্পষ্ট বোধ হইতেছিল যে তখন তিনি পশুবলি পছন্দ করিতেছিলেন না, তবে শাস্ত্র মর্য্যাদা রাখিবার জন্য এত যুক্তি দেখাইতেছিলেন। যাহা হউক এই কথা বলিতে বলিতে দু'জনায় বরাহনগর বাজারে আসিলেন। তখন তিনি ম্যালেরিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন, সেইজন্য ডাক্তারেরা তাঁহাকে পায়চারি করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।

স্বামী সারদানন্দ ও বর্ত্তমান লেখক।

একসময় নরেন্দ্রনাথ ও কয়েক জনে মিলিয়া হিমালয়ের কোন উচ্চস্থানে ভ্রমন করিতেছিলেন। সহসা তথায় বরফ বৃষ্টি হইতে লাগিল। গুর্জ্জর বা ভেরাওয়ালারা পাকদণ্ডি বা

সান্ন্যাল মহাশয় কথিত।

পাহাড়ি পথ দিয়া পলায়ন করিল। যুবক সন্ন্যাসী কয়েকটি পথ স্থির করিতে না পারিয়া শিলা বৃষ্টিতে ভিজিতে লাগিলেন। গাত্রে বস্ত্রাদিও বিশেষ কিছু ছিল না—মৃত্যু অনিবার্য্য। এইরূপ বিপদ দেখিয়া সকলেই স্থির করিলেন যে, ভালই হইয়াছে—দেহ ত্যাগ করা যাইবে। পাহাড়ে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে নিকটে একটি গুহা দেখিতে পাইয়া তাহার ভিতরে সকলে গিয়া ধ্যান করিতে বসিলেন এবং ধ্যান করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিবেন এরূপ স্থির করিলেন—মৃত্যু সম্মুখে। সান্ন্যাল মহাশয়ের নিকট তখন কিছু কাল-মরিচ বা গোল-মরিচ ছিল। তিনি সেইগুলি বাহির করিয়া সকলকে দিলেন। সকলেই সেইগুলি চিবাইয়া খাইয়া একটু গরম হইলেন। যাহা হউক সেই রাত্রে সকলের কোন ক্রমে জীবন রক্ষা হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীদের হিমালয় ভ্রমণ কালে বিপদ।

শরৎ মহারাজ একবার হিমালয় ভ্রমণ করিতে করিতে পাহাড়ের কোন স্থানে যাইয়া উপস্থিত হন এবং তথায় এক গৃহস্থের ঘরে ভিক্ষা করেন। শরৎ মহারাজের তখন জ্বলন্ত বৈরাগ্য, তিনি গৃহস্থদিগকে বলিলেন,—রুটী লইয়া তিনি আপন মনে নদীর ধারে বসিয়া ভোজন করিবেন। গৃহস্থ তাহাতে সম্মত হইলেন এবং তদ্রূপই ব্যবস্থা করিলেন। শরৎ মহারাজ নদীর ধারে বসিয়া আহার করিয়া থালা ঘটিগুলি স্বহস্তে মাজিয়া লইয়া আসিয়া গৃহস্থকে ফিরাইয়া দিলেন। সেই গৃহস্থের একটি অল্প বয়স্কা পুত্রবধূ ছিল। সে সাধু দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়া সরল ভাবে হাসিতে

সারদানন্দ স্বামী কথিত।

সারদানন্দ স্বামীর হিমালয় ভ্রমণ।

হাসিতে শরৎ মহারাজকে বলিল, "মহারাজ, আপনি কষ্ট করিয়া কেন থালা-ঘটি মাজিয়া আনিলেন ? নদীর ধারে থাকিলেই হ'ত আমি এক সময় গিয়া মাজিয়া আনিতাম।" শরৎ মহারাজ বলিলেন, "অপরে যে চুরি করিয়া লইবে ?" এই কথা শুনিয়া সরল পাহাড়ি মেয়েটি বলিয়া উঠিল, "কেন একজনের জিনিষ অপরে নেবে কেন ? আমাদের দেশে অমন ক'রে কেউ কাহার ও জিনিষ তো নেয় না।" শরৎ মহারাজ বলিতেন যে, মেয়েটির মুখে ও কথাবার্ত্তায় এমন একটা দেবভাব ছিল যে, তাহা বিস্মৃত হইবার নহে।

এই সময় বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল মহাশয় ও কয়েকজনে মিলিয়া "নারায়ণতীর্থ" দর্শন করেন। সম্ভবতঃ কালী-বেদান্তীও এই সঙ্গে ছিলেন, কারণ তিনি উত্তরাখণ্ড হইতে ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া আলমবাজার মঠে কয়েকখানি পত্র দিয়াছিলেন।

দীন মহারাজ কথিত।

৺কাশীধামে অভেদানন্দ স্বামী, দীন মহারাজ ও স্বামী নির্ম্মলানন্দ।

একবার ৺কাশীতে অভেদানন্দ স্বামী, তুলসী মহারাজ ও দীন মহারাজ তিনজনে মিলিয়া পরিক্রমা করিতে বাহির হইলেন। তিনজনেরই হাতে কমণ্ডলু। গ্রাম থেকে এক জন দই লইয়া আসিয়া তাঁহাদের দই লইবার জন্য অনেক অনুনয় করিল। প্রথমে সকলেই লইতে অনিচ্ছুক হইলেন, কারণ সঙ্কল্প করা বস্তু ; অর্থাৎ লোকটি সঙ্কল্প করিয়াছে যে সাধুদের দই খাওয়াইলে তার অভিষ্ট-বস্তু লাভ হইবে এই জন্য সকলেই অনিচ্ছুক হইলেন। কিন্তু আহারের কোন বন্দোবস্ত না থাকায় অবশেষে কমণ্ডলুতে সকলেই দই

লইলেন। চলিতে চলিতে ক্রমেই বেলা হইতে লাগিল। অভেদানন্দ ও তুলসী মহারাজ উভয়েই বলবান, তাঁহারা আগে আগে চলিতে লাগিলেন। দীন মহারাজ পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন ও একমনে জপ করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। ক্রমেই জপ গভীর হইতে লাগিল এবং তাঁহার গতিও শ্লথ হইয়া পড়িল, অবশেষে এক জায়গায় হাত পা আর চলিল না—স্থির হইয়া রহিলেন। তখন দীন মহারাজ স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে জগত চূর্ণ হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমানু হইয়া গলিয়া গিয়াছে। আদান প্রদান, আকাঙ্খা বা অন্য কোন ভাব আর কিছুই নাই। সমস্ত স্থির ও নিস্পন্দ—আনন্দ বা নিরানন্দ তথায় কিছুই নাই। শ্বাস প্রশ্বাস তাঁহার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, দারু পুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সমাধি যে কি জিনিষ তাহা তিনি এই সময় প্রথম উপলব্ধি করিলেন। কিছুক্ষণ পরে দীন মহারাজ শুনিলেন যে অভেদানন্দ স্বামী ও তুলসী মহারাজ উভয়ে দূর থেকে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "বুড় শ্যালা স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন? শ্যালা মোলো না কি?" তাহার পর একটু সংজ্ঞালাভ করিয়া আবার সকলে চলিতে লাগিলেন। বেলুড় মঠে সন্ধ্যার পর দীন মহারাজ যখন তাঁহাদের কাশী পরিক্রমা ও সমাধির কথা বলিতেন তখন তাঁহার মন এত উঁচুতে উঠিয়া যাইত যে বক্তা ও শ্রোতা বহুক্ষণ সে তেজঃপুঞ্জ ভাব সহ্য করিতে পারিতেন না।

দীন মহারাজের সমাধির জ্ঞান।

৺কাশীধামে ৯০ বৎসরেরও অধিক এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ

বাস করিতেন। চক্ষু নাই কেবল শ্বাস প্রশ্বাস আছে। সকালে তাঁহাকে বাহিরে বাহির করিয়া একখানি পিঁড়েতে বসাইয়া আর একখানি পিঁড়া পিঠে ঠেস্ দিয়া রৌদ্রে রাখিয়া তাঁহার আত্মীয়েরা চলিয়া যাইতেন। কুলীন ব্রাহ্মণ, বহু বিবাহ করিয়াছিলেন এবং নামগুলি পাছে বিস্মৃত হন সেইজন্য একখানি খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। "বৃদ্ধের বিবাহ" মানে ছিল অর্থ উপার্জ্জন। কালীবেদান্তী ও অপর সকলে যাইয়া সেই জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধকে বলিতেন, "একটা বে ক'রবে? ভাল সম্বন্ধ আছে।" বৃদ্ধ ক্ষীণ অস্পষ্ট-স্বরে বলিতেন, "কত দেবে?" তাহা শুনিয়া সকলে সময়োপযোগী গালিগালাজ দিয়া তাঁহাকে বলিতেন, "খাট দেবে, কাঠ দেবে, প্যাঁকাটি দেবে?" কিন্তু বৃদ্ধটি শুনিতে না পাইয়া পুনঃপুনঃ বলিতেন, "কত দেবে?" আর কালীবেদান্তী এবং অন্যান্য ব্যক্তিরাও বলিতেন, "খাট দেবে, কাঠ দেবে, প্যাঁকাটি দেবে?" আলমবাজারের মঠে ফিরিয়া আসিয়া কালীবেদান্তী কিছুদিন এই কথা লইয়া কৌতুক রহস্য করিতেন।

৺কাশীধামে অভেদানন্দ স্বামীর হাস্য কৌতুক।

৺কাশীধামে অবস্থান কালে কালীবেদান্তী ৺দুর্গাবাড়ীর নিকট স্বামী ভাস্করানন্দজীকে দর্শন করিতে যান। স্বামী ভাস্করানন্দজী তখন উলঙ্গ অবস্থায় থাকিতেন এবং প্রসিদ্ধ সাধু বলিয়া সর্ব্বত্র পূজিত হইতেন। কালীবেদান্তীর তখন মহা বৈরাগ্য ভাব, বয়স যদিও অল্প কিন্তু বিশেষ পণ্ডিত হইয়াছিলেন ও কঠোর তপস্যা করায় ভিতরে একটা নির্ভীক.

৺কাশীধামে স্বামী ভাস্করানন্দজী ও স্বামী অভেদানন্দ।

বৈরাগ্যের ভাব ও শক্তি জাগ্রত হইয়াছিল। কালীবেদান্তী বৃদ্ধ, সর্ব্বপূজিত স্বামী ভাস্করানন্দজীর সহিত সমান ভাবে তর্ক করিয়াছিলেন এবং অনেক সময় তর্কে বৃদ্ধ স্বামী ভাস্করানন্দজীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ৺কাশীধামে অবস্থান কালে কালীবেদান্তী একটা বাগানে পড়িয়া থাকিতেন ও কঠোর তপস্যা করিতেন।

এলাহাবাদে, ঝুসিতে ও গোবিন্দ ডাক্তারের বাড়ীতে কালীবেদান্তী কিছুদিন ছিলেন। এইস্থানে তিনি খুব কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। রাত্রে যখন ধ্যান করিতে বসিতেন তখন ধ্যান এত গভীর হইত যে যখন ওপারের কেল্লাতে শেষ রাত্রে তোপ পড়িত তখন তাঁহার চৈতন্য হইত যে রাত্রি পোহাইয়া গেল।

হৃষিকেশে কালীবেদান্তী এক কুটীরে বা কুশ ঘাসে ঘরেতে (উটজ) থাকিতেন এবং কম্বুলি বাবার ছত্র হইতে রুটী আনিয়া গঙ্গার কিনারায় এক অশ্বত্থগাছের তলায় যাইতেন এবং তথায় অনেক পাথর পাতা ছিল সেই পাথর ধুইয়া তাহাতে রুটী রাখিয়া খাইতেন ও আহারান্তে বৃক্ষমূলে বসিয়া জপ ধ্যান করিতেন। বর্ত্তমান লেখক যখন প্রথমবার হৃষিকেশে যান তখন সেই অশ্বত্থগাছটি দেখিয়াছিলেন ও তাহার তলায় বসিয়া থাকিতেন। এক্ষণে সেই গাছটি জলে ভাসিয়া গিয়া সেই স্থানটি একটি ছোট চড়ায় পরিণত হইয়াছে। একটি হিন্দুস্থানী সাধু তথায় বসিয়া গীতা পাঠ করিতেন ও ব্যাখ্যা করিতেন যে, "স্থানে হৃষিকেশ" অর্থাৎ

অভেদানন্দ স্বামীর হিমালয় ভ্রমণ।

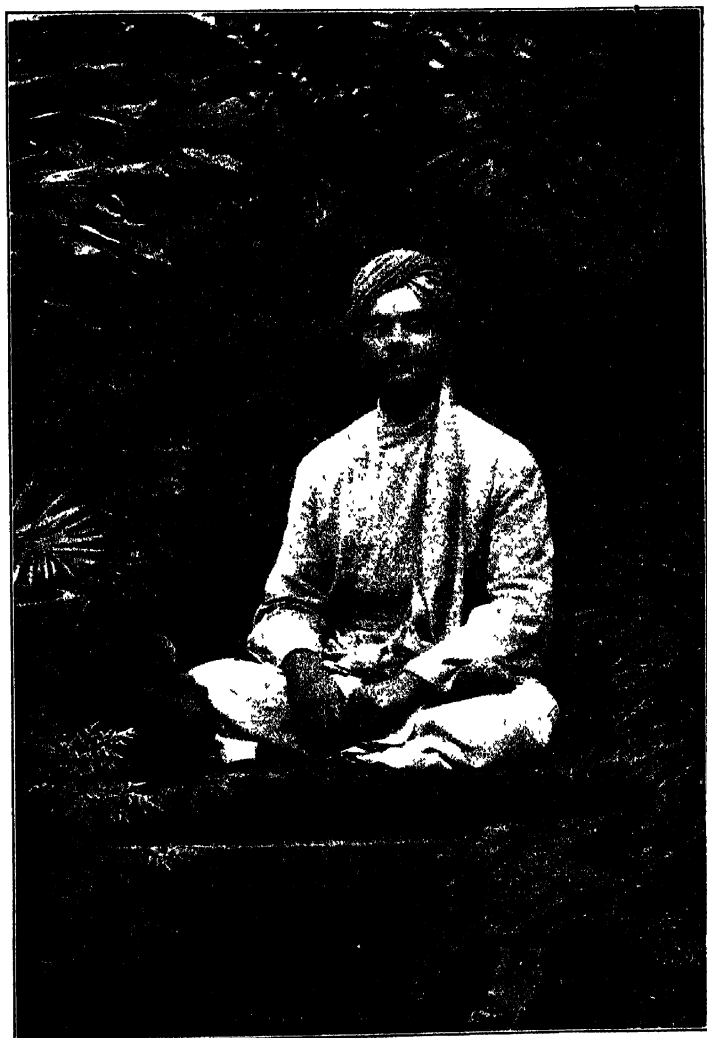
হৃষিকেশই হচ্ছে একমাত্র স্থান। আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসিয়া কালীবেদান্তী সাধুটির নানা রকম কথাবার্ত্তা ভাব-ভঙ্গি দেখাইয়া কৌতুক রহস্য করিতেন।

রাজপুতানায় অভেদানন্দ স্বামী ও অখণ্ডানন্দ স্বামী।

হৃষিকেশ ও অন্যান্য স্থান পর্য্যটন করিয়া কালীবেদান্তী রাজপুতানায় যান এবং তথায় গঙ্গাধর মহারাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কালীবেদান্তী গঙ্গাধর মহারাজকে আলমবাজার মঠে ফিরিয়া যাইতে অনেক অনুরোধ করেন। কারণ গঙ্গাধর মহারাজ কয়েক বৎসর বাঙ্গালা দেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিতেছিলেন এবং তাঁহার আলমবাজার মঠে ফিরিবার কোনই ইচ্ছা ছিল না। রাজপুতানায় অবস্থান কালে কালীবেদান্তী আজমীড় ও পুষ্কর যান। পুষ্করের জলে স্নান করিয়া সম্ভবতঃ তাঁহার "নাহারু" বা tape warm রোগ উৎপন্ন হয়।

অভেদানন্দ স্বামীর গুজরাট ভ্রমণ।

নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া কালীবেদান্তী অবশেষে গুজ-রাটের দ্বারকা ও বেট দ্বারকায় যান। এই স্থানে অবস্থান কালে তিনি এক ওয়াঘির বা জঙ্গলি দস্যু দেখিয়াছিলেন। ওয়াঘির এক জাতীয় লোক, যাহারা চিরকাল দস্যুবৃত্তি করিয়া থাকে। দেখিতে অতিশয় বলিষ্ঠ ও ভীষণ সাহসী —এক প্রকার বন্য পশু বিশেষ। একবার এক ওয়াঘির ধৃত হইয়া জেলে যায়। কিছুদিন পরে জেলের সিপাহির তরোয়াল খানি কাড়িয়া লইয়া প্রাচীর টপ্‌কাইয়া সহরে চলিয়া আসে। বাজারের মাঝে খোলা তরোয়াল খানি পার্শ্বে রাখিয়া বসিল এবং ক্ষৌরকারকে দাড়ি মুড়াইয়া দিতে



শ্রীমৎ অভেদানন্দ স্বামী

আদেশ করিল। ওয়াঘির দেখিতে জনতা অধিক হইল এবং ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনেক পুলিশের লোকও জমায়েৎ হইল কিন্তু কাহারও সাহস হইল না যে ওয়াঘিরকে ধৃত করে। নির্ভীক ওয়াঘির ক্ষৌর হইয়া স্বচ্ছন্দে ইচ্ছামত আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল।

অভেদানন্দ স্বামীর বোম্বাই ও মাদ্রাজ ভ্রমণ।

তাহার পর কালীবেদান্তী বোম্বাইয়ে পর্য্যটন করিতে যান। বোম্বাইয়ে খাবারের দোকানে গিয়া তিনি কিছু খাবার কিনিতে চাহিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের ২২তোলা সের না জানা থাকায় তিনি একটু অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। হালুইকর বিদেশী লোক বুঝিতে পারিয়া তাহা সংশোধন করিয়া দেন। বোম্বাই থেকে তিনি মাদ্রাজের দিকে যান এবং দক্ষিনি ভাষা না জানায় তাঁহাকে অনেক সময় কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল। ইংরাজী জানা লোক মারফৎ দ্রব্যাদি ক্রয় বা লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে হইত। মাদ্রাজ হইতে জাহাজ করিয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। জাহাজে খাইবার জন্য তিনি চিঁড়ে, গুড়, দই এই সব জিনিষ লইয়াছিলেন। অনভিজ্ঞতাবশতঃ চিঁড়েগুলি সমুদ্রের জলে ধুইয়া লইয়াছিলেন সেইজন্য তাহা এত তিক্ত হইয়া গিয়াছিল যে আহার উপযোগী আর রহিল না। অবশেষে তিনি আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসেন। কালীবেদান্তী কতবার তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন এবং কোন্‌বার কোথায় তাঁহার কি ঘটনা হইয়াছিল তাহা বিশেষ স্মরণ নাই। তবে যাহা কিছু উপাখ্যান শুনিয়াছিলাম তাহাই সন্নিবেশিত হইল।

স্বামী নির্ম্মলানন্দের ভ্রমণ।

তুলসী মহারাজ একবার পদব্রজে জামতাড়ার ভিতর দিয়া ৺কাশীধামে যাইতেছিলেন। সম্ভবতঃ কালীবেদান্তীও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। পথে চলিতে চলিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়, গ্রাম বা লোকালয় কিছু দেখিতে পাইতেছিলেন না। অবশেষে এক বৃদ্ধা সাঁওতাল স্ত্রীলোক তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। তাহাকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করায় বৃদ্ধা সাঁওতাল রমণী যুবক সন্ন্যাসীদ্বয়কে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল, "কথ্যাকে যাবি, দিহাতকে যাবি না জামতড়াকে যাবি।" অবশেষে তাঁহারা পথ স্থির করিয়া স্থানীয় রাজা বা সাঁওতাল জমীদারের বাড়ীতে সে রাত্রে আশ্রয় নেন ও তথায় আহারাদি করিয়া রাত্রি যাপন করেন। তুলসী মহারাজ আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত এই কথাটি লইয়া কৌতুক রহস্য করিয়াছিলেন।

অখণ্ডানন্দ স্বামীর ভ্রমণ।

সম্ভবতঃ ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মের শেষ বা বর্ষার প্রথমে রবিবার গঙ্গাধর মহারাজ নরেন্দ্রনাথের সহিত তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হন। প্রথমে দেওঘরে গিয়াছিলেন। তথায় সুবিখ্যাত রাজনারায়ণ বাবুর সহিত তাঁহাদের নানা বিষয় কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তাহার পর গঙ্গাধর মহারাজ পশ্চিমের নানা-স্থান ও উত্তরাখণ্ডের পার্ব্বতীয় দেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে মিরাটে আসিলেন। এইখানে নানাস্থান হইতে সকলে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিলেন। মিরাট হইতে আবার সকলে পৃথক হইয়া যান। গঙ্গাধর মহারাজ রাজপুতানার দিকে গমন করেন। জয়পুরের অন্তর্গত খেতড়ি রাজ্যের

রাজা অজিত সিংহের কাছে তিনি কিছুদিন ছিলেন। রাজা অজিত সিং গঙ্গাধর মহারাজকে খুব যত্ন করিয়া কিছুদিন রাখিয়াছিলেন। তিনি রাজপুতানার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি রাজ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং উদয়পুরেও একবার গিয়াছিলেন।

অখণ্ডানন্দ স্বামীর গুজরাট ভ্রমণ।

রাজপুতানা হইতে তিনি গুজরাটে যান। গুজরাটের কোন সহরে তিনি এক কবিরাজের বাড়ীতে বাস করিতেন। গঙ্গাধর মহারাজ বড় চা প্রিয় ছিলেন এবং অধিক পরিমাণে বহুবার চা পান করিতে পারিতেন। সহরে বাস করিবার কালে এক ধনী লোকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়। বৃদ্ধ ধনীব্যক্তি যুবা গঙ্গাধর মহারাজকে খুব স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার কাছে আসিয়া চা পান করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। সরল গঙ্গাধর মহারাজ বিভবশালী ব্যক্তির নিকট চা পান করিতেন ও ধর্ম্ম বিষয়ে নানা কথাবার্ত্তা কহিতেন। অবশেষে বৃদ্ধের ইচ্ছা হইল যে পুত্রের হাতে সমস্ত বিষয় দিয়া তিনি তীর্থে গিয়া বাস করিবেন। কিন্তু তাহার দুর্ম্মতি পুত্রবধূ মনে করিল যে বৃদ্ধ এই সাধুটিকে অনেক বিষয় দিয়া দিবে। ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া সেই পুত্রবধূ একদিন গঙ্গাধর মহারাজের চা'র বাটিতে অল্প পরিমাণে বিষ দিয়াছিল।

গঙ্গাধর মহারাজ চা পান করিয়া শরীর অসুস্থ বোধ করায় তিনি শীঘ্র কবিরাজের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার অনবরত ভেদ হইতে লাগিল। কবিরাজ

অখণ্ডানন্দ স্বামীর চায়ের সহিত বিষ খাওয়া।

মহাশয় রোগ বুঝিতে পারিয়া ঔষধ দিয়া পীড়া উপশম করিলেন এবং গঙ্গাধর মহারাজকে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিয়া দিলেন যে যেন তিনি আর কাহারও বাড়ী গিয়া চা পান না করেন। চা, দুধ, চিনি যাহা আবশ্যক হইবে তাহা সমস্তই তিনি আয়োজন করিয়া দিবেন। কিন্তু ভিতরকার কথা কবিরাজ মহাশয় কিছু বলিলেন না। কয়েক সপ্তাহের পর গঙ্গাধর মহারাজ আবার বৃদ্ধের বাড়াতে গিয়া চা পান করিতে থাকেন। পুনরায় দুষ্ট পুত্রবধূ চায়ের সহিত বেশী পরিমানে বিষ মিশাইয়া দিয়াছিল। চা পান করিয়া কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া গঙ্গাধর মহারাজ শরীর অসুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন এবং অনবরত ভেদ হইতে লাগিল। ক্রমশঃ বিষের অন্যান্য চিহ্নও প্রকাশ পাইল এবং ভয়ের কারণ দেখা যাইতে লাগিল। এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া কবিরাজ মহাশয় ভীত হইলেন এবং গঙ্গাধর মহারাজের জীবন সঙ্কটাপন্ন ভাবিয়া চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। অবশেষে গঙ্গাধর মহারাজ অনেক কষ্টে সে যাত্রা রক্ষা পাইয়া দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়া কয়েক মাস কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে রহিলেন। কবিরাজ মহাশয় তখন বিষ প্রয়োগের সমস্ত কথা গঙ্গাধর মহারাজকে বলিলেন। ধনী বৃদ্ধ ঐ সকল কথা শুনিয়া পুত্রবধূকে বিশেষ ভর্ৎসনা ও অভিসম্পাৎ করিতে লাগিলেন।

কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে কিছুদিন থাকিয়া গঙ্গাধর

মহারাজ অন্যত্র চলিয়া যান। নরেন্দ্রনাথের এই সময় তীব্র বৈরাগ্য, কাহার সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিতেন না। পাছে পূর্ব্ব পরিচিত কোন ব্যক্তি নিকটে আসে এবং মনকে বৈরাগ্য হইতে ভ্রষ্ট করে সেইজন্য সর্ব্বদাই তিনি একাকী থাকিতে ইচ্ছা করিতেন। গঙ্গাধর মহারাজ বালকস্বভাব নরেন্দ্রনাথকে অনেক দিন দেখেন নাই সেইজন্য ব্যগ্র হইয়া তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইলেন। তিনি যে যে স্থানে যাইলেন তথায় গিয়া শুনিলেন যে নরেন্দ্রনাথ তথা হইতে চলিয়া গিয়াছেন। খুঁজিতে খুঁজিতে তিনি এক মরুস্থলের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। গ্রামবাসী সকলেই তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিল এবং বলিল যে তৎস্থানে মন্বন্তর হইয়াছে, আহার্য্য দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য এবং ডাকাতেরা দলে দলে বাহির হইয়া লুঠ তরাজ করিতেছে। গঙ্গাধর মহারাজ তাহাদের নিষেধ না শুনিয়া বহির্গত হইলেন, সঙ্গে পরিধেয় বস্ত্র, কম্বল ও এক পুঁট্‌লি বই। যাইবার সময় গ্রামবাসীরা গঙ্গাধর মহারাজকে তদ্দেশীয় "আমি সাধু" ইত্যাদি দু'একটি ভাষা শিখাইয়া দিয়াছিল। কয়েক মাইল যাইবার পর একদিন ডাকাত আসিয়া তাঁহাকে ঘেরোয়া করিল। কেহ কাহারও ভাষা জানে না। ডাকাতেরা তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল, জিনিষ পত্তর সব কাড়িয়া লইল এবং পুস্তকের প্রত্যেক পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল যে তাহার ভিতর "নোট" আছে কি না এবং অল্প বিস্তর ভয় দেখাইয়াছিল। অবশেষে ডাকাতেরা গঙ্গাধর

অখণ্ডানন্দ স্বামীর ডাকাতের হাতে পড়া।

মহারাজকে এক গাছেতে পেছন দিকে হাত করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া যাইল। গঙ্গাধর মহারাজ তখন আকার ঈঙ্গিতে বলিতে লাগিলেন, 'আমায় মেরে ফেল কিন্তু বাঁধিও না।' যাহা হউক ডাকাতেরা তো বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। এদিকে বৈকাল হইয়াছে, সন্ধ্যা হইলে ডাকাতের সর্দ্দারের মনে একটু দয়ার উদয় হইল। গুজরাটের ঐ স্থানে বন্য সিংহের ভয় আছে, রাত্রে বন্য জন্তু আসিয়া লোকটাকে খাইয়া যাইতে পারে এই ভাবিয়া ডাকাতের সর্দ্দার আবার ফিরিয়া আসিয়া বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল এবং প্রণাম ও অনেক মিনতি করিতে লাগিল। অবশেষে গঙ্গাধর মহারাজকে সঙ্গে লইয়া নিকটবর্ত্তী এক নগরের দিকে চলিল। নগর দূরে দেখা যায় এইরূপ স্থলে দাঁড়াইয়া ডাকাতের সর্দ্দার গঙ্গাধর মহারাজকে নগরে যাইতে বলিল। গঙ্গাধর মহারাজ তাহাকে নগর পর্য্যন্ত যাইতে বলায় পুলিশ তাহাকে ধৃত করিবে এই বলিয়া ডাকাতের সর্দ্দার চলিয়া যাইল।

অখণ্ডানন্দ স্বামীর আলমবাজার মঠে পুনরাগমন।

রাজপুতানা ও গুজরাটে অবস্থান কালে তাঁহার কালী-বেদান্তী ও তুলসী মহারাজের সঙ্গে দেখা হয়। ইঁহারা দুইজনে আলমবাজারের মঠে ফিরিয়া যাইতে অনুনয় করায় ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসের উৎসবের পূর্ব্বে গঙ্গাধর মহারাজ আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসিলেন এবং খেতড়ির রাজা অজিত সিংহের কথা, গুজরাট ও অন্যান্য স্থানের বিষয় তিনি বলিতে লাগিলেন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে যোগেন মহারাজ পরিভ্রমণ করিতে করিতে প্রয়াগে সন্ন্যাসী অবস্থায় ডাক্তার গোবিন্দচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করেন। কিছুদিন পরে যোগেন মহারাজ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। কথাপ্রসঙ্গে গোবিন্দ বাবু জানিতে পারিলেন যে যোগেন মহারাজ পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য এবং তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ, ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ও পরমহংসদেবের নানা কথাবার্ত্তায় বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় গোবিন্দ বাবু অতিশয় চিন্তিত হইলেন এবং যোগেন মহারাজের অনুজ্ঞাক্রমে বরাহনগর মঠে সংবাদ পাঠাইলেন। তার পাইয়া নানাস্থান হইতে নরেন্দ্রনাথ, স্বামী শিবানন্দ, কালীবেদান্তী ও নিরঞ্জন মহারাজ প্রভৃতি তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন ও যোগেন মহারাজের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

প্রয়াগে যোগানন্দ স্বামীর বসন্ত রোগ।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মের শেষ বা বর্ষার প্রারম্ভে নরেন্দ্রনাথ তীর্থ পর্য্যটনে যাইলেন। গঙ্গাধর মহারাজ সেবা করিবার জন্য আগ্রহ করিয়া সঙ্গে চলিলেন। হরমোহন মিত্র ও উপেন মুখুজ্জে ষ্টেসনে পোঁছাইয়া দিয়া আসিলেন। রবিবার সকালের ট্রেনে উভয়ে পশ্চিমে যাত্রা করিলেন। দেওঘরে তাঁহারা দু'একদিন ছিলেন। তথায় সুবিখ্যাত রাজনারায়ণ বসুর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ ও নানা প্রসঙ্গ আলোচনা হয়। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় অতি সরল ও উচ্চমনের লোক ছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের তীর্থ যাত্রা।

প্রয়াগে অবস্থানকালে নরেন্দ্রনাথের সহিত শিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় নানা বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। জ্ঞান-মার্গের নানা প্রসঙ্গ ও উচ্চাবস্থার কথাবার্ত্তা নরেন্দ্রনাথের নিকট শুনিয়া শিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "স্বামিজী ক'র্‌লে কি ? আমার দশ বৎসরের পরিশ্রম পণ্ড ক'র্‌লে।" অর্থাৎ শিরিশচন্দ্র বসু পূর্ব্বে থিওযফিষ্টদের সঙ্গে মিশিতেন ও তৎভাবে সাধন ভজন করিতেন। সেইজন্য নরেন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে আসিয়া থিওফির বিষয় নানা প্রকার ব্যাখ্যা ও চর্চ্চা করিতেছিলেন। শিরিশচন্দ্র বসুর কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার দশ বৎসরের ভাব পণ্ড হলো বা না হলো তাতে আমার কি ?"

প্রয়াগে নরেন্দ্রনাথ

ডাক্তার গোবিন্দ বসু নরেন্দ্রনাথকে লইয়া সিন্দুক সা নামক জনৈক সাধুকে দেখিতে যান। সিন্দুক সা ত্রিবেণীর নিকটস্থ বাঁধের উপর থাকিতেন। ত্রিবেণী ও প্রয়াগে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। ইঁহার বিষয় পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

নরেন্দ্রনাথ ও সিন্দুক সা।

একদিন এক বাঙ্গালী সাধু বৈরাগী, নাম মাধব দাস বাবা (যিনি চিটগঞ্জে এক বাড়ীর মধ্যে এক গণ্ডির মধ্যে ৪০ বৎসর ছিলেন) নরেন্দ্রনাথ ও তদীয় গুরু ভাইদিগকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, নরেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখীন হইতে পারিলেন না। মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য সর্পের ন্যায় মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন—বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে

নরেন্দ্রনাথ ও মাধবদাস বাবা।

পারিলেন না। বৈরাগী মহাশয় অতীব হর্ষিত হইয়া গোবিন্দ ডাক্তারকে বলিলেন, "গোবিন্দ তুমি কি সৎসঙ্গই না কচ্চ!"

নরেন্দ্রনাথ, তদীয় গুরুভাই ও গোবিন্দ ডাক্তার ঝুসি দর্শন করিতে দয়ারামের আশ্রমে যান। তথায় নানারূপ সৎপ্রসঙ্গে ও মাঝে মাঝে হাস্যোদ্দীপক কৌতুক রহস্যে দিনটা অতিবাহিত করিয়া সকলে সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিলেন।

একদিন অপরাহ্নে নরেন্দ্রনাথ ও অপর সকলে একত্রিত হইয়া ভজন ও সঙ্গীত করিতেছিলেন। ভাব জমিয়া গেল। সঙ্গীত ও ভজনাদি কিছুক্ষণ চলিতে লাগিল। গোবিন্দ ডাক্তারের মনে বিশেষ ভক্তি ও আনন্দ উদ্দীপিত হইল এবং মধুর সঙ্গীতে মনের আবেগ অধিকতর বৃদ্ধি হওয়ায় ভাব সম্বরণ করিতে না পারিয়া দুই নয়নে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি গানে বিশেষ আবিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু গোবিন্দ ডাক্তারের চক্ষে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ আত্মভাব সম্বরণ করিয়া গোবিন্দ ডাক্তারকে উপহাস ও ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন, "তোর ত বড় পান্‌সে চোক।" (নরেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দ ডাক্তার।)

একদিন নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার গুরুভায়েরা গোবিন্দ ডাক্তারের গৃহে রাত্রে আহার করিতেছিলেন। তথায় গুরুজী অমূল্যর সাথে নরেন্দ্রনাথের শুক্‌না লঙ্কা খাওয়ার রহস্য হইয়াছিল, সে বিষয় পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। (নরেন্দ্রনাথ ও গুরুজী অমূল্য।)

আহারান্তে নরেন্দ্রনাথ ডাক্তার গোবিন্দ বাবুকে একান্তে বলিলেন, "অমূল্য যদি মঠে যায় তাহলে তুমি তাহাকে বরাহনগর মঠে পাঠাইয়া দিও।"

নরেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দ।।

প্রসঙ্গক্রমে গোবিন্দ ডাক্তার একদিন নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৎস্য ও মাংস আহার করা মনুষ্যের পক্ষে উচিত বা অনুচিত?" কারণ গোবিন্দ ডাক্তার নিরামিষভোজী; মৎস্য মাংস কখনও ব্যবহার করেন নাই এবং অপরের পক্ষে ইহা অপ্রয়োজনীয় ও ধর্ম্মপথের অন্তরায় তাঁহার এরূপ ধারণা ছিল। নরেন্দ্রনাথ প্রশ্ন শুনিয়া সহাস্যবদনে স্নেহপূর্ণ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "দেখ গোবিন্দ, সিংহ ব্যাঘ্র মাংসাশী এবং চটক পক্ষী (চড়াই) ইহারা তণ্ডুলকণা ও কাঁকর খাইয়া জীবন ধারণ করে কিন্তু সিংহ ব্যাঘ্রাদির বৎসরান্তে সন্তান উৎপাদনের প্রবৃত্তি (self procreation) একবার হইয়া থাকে এবং চটক প্রভৃতি নিরামিষভোজীরা সততই সন্তান উৎপাদনে ব্যগ্র। মাংসাহার ধর্ম্মপথের কোন অন্তরায় নহে।"

নরেন্দ্রনাথের প্রয়াগ পরিত্যাগ।

একদিন নরেন্দ্রনাথ গোবিন্দ ডাক্তারকে বলিলেন, "আমরা আজ রওনা হব।" গোবিন্দ ডাক্তার কাতর হইয়া নরেন্দ্রনাথকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন যে নরেন্দ্রনাথ যেন অন্ততঃ আর একটা দিন থাকিয়া যান। কারণ তাঁহাদের সঙ্গ বিচ্যুত হইতে গেবিন্দ ডাক্তারের্ প্রাণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। নরেন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে গোবিন্দ ডাক্তারকে বলিলেন, "ইহাতে সত্যের অপলাপ

হইবে আমি আজকেই যাইব।" তাঁহারা সেই দিনই তথা হইতে গাজীপুরে রওনা হইলেন। ঝুসিতে নরেন্দ্রনাথ ও শিবানন্দ স্বামী কিছুদিন ছিলেন।

গাজীপুরে নরেন্দ্রনাথ।

নরেন্দ্রনাথ গাজীপুরে কয়বার গিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান লেখকের স্মরণ নাই। সম্ভবতঃ দুই বা তিনবার। নরেন্দ্রনাথ গাজীপুরে পাওহারী বাবাকে দর্শন করিতে যাইলেন এবং পরে শিবানন্দ স্বামী ও বাবুরাম মহারাজ গিয়াছিলেন। গাজীপুরে তখন মুন্সেফ্ শিরিশচন্দ্র বসুর বাড়ীতে বা গগনচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে অনেকেই গিয়া থাকিতেন। গাজীপুর হইতে নরেন্দ্রনাথ কিছুদিন পরে গোবিন্দ ডাক্তারকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। গোবিন্দ ডাক্তারের প্লেগের সময় গৃহ পরিত্যাগ করিবার কালে সেই পত্রখানি নষ্ট হইয়া যায়। তাহার মর্ম্ম ছিল "গোবিন্দ আমি গাজীপুরে পৌঁছিয়াছি ও পাওহারী বাবার সাথে দেখা করিতে যাইব। আশা করি তাঁহার কাছ থেকে কিঞ্চিৎ অমূল্য রত্ন পাইব ইত্যাদি।"

গাজীপুরে অবস্থান কালে নরেন্দ্রনাথের অমৃতলাল বসু, District Judge, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সাথে দেখা ও নানারূপ আলোচনা হইয়াছিল। পাওহারী বাবার সাথেও তাঁহার দেখা হইয়াছিল। এ সকল বিষয় পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।

৺কাশীধামে নরেন্দ্রনাথ।

৺কাশীধামেও নরেন্দ্রনাথ কিছুদিন ছিলেন। সে বিষয় পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। তখন তাঁহার ঘোর বৈরাগ্য।

নরেন্দ্রনাথের একটি বিশেষত্ব ছিল যে তিনি মাধুকরীই করুন বা উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে পথে পথে ঘুরেই বেড়ান একটু সুবিধা বা সময় পাইলেই পুস্তক খুলিয়া পড়িতেন। পড়া শুনা করা নরেন্দ্রনাথের বংশে নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় একটী স্বাভাবিক জিনিষ।

নরেন্দ্রনাথ, শরৎ মহারাজ ও আরও দু'একজন একত্রে যাইতেছেন। নরেন্দ্রনাথ অতিশয় তামাক প্রিয় ছিলেন এবং বহুবার খাইতেন। পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াইয়া তামাক খাইতে অসুবিধা হওয়ায় নরেন্দ্রনাথ চটিয়া যাইলেন। একদিন একস্থানে রাত্রি যাপন করিলেন। শরৎ মহারাজ নরেন্দ্রনাথের জন্য একটু দা-কাটা তামাক ও কোল্কে লইয়া সঙ্গে থাকিতেন। নরেন্দ্রনাথের তামাক খাওয়ার অসুবিধা হওয়ার জন্য ক্রোধে তামাক ও কোল্কে টেনে ছুঁরে ফেলে দিলেন, কোল্কেটা ভেঙে গেল, মহাবৈরাগ্য, তামাক আর খাবেন না। শরৎ মহারাজের একশীরা ফুলিয়াছিল এই জন্য তিনি সেই স্থানটিতে দোক্তাপাতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। খানিকবাদে শরৎ মহারাজ দোক্তাপাতা-গুলি টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সকলেই রাত্রিতে শুইয়া রহিলেন। খানিক রাত্রে নরেন্দ্রনাথ উঠিয়া বালকের মতন আব্দার ধরিলেন, "শরৎ তামাক খাওয়া, শরৎ তামাক খাওয়া।" শরৎ মহারাজও প্রণয় কোপে চলিতে লাগিলেন, "এখন তামাক কোথায় পাব? তুমি বল্লে তামাক আর খাবে না, টেনে সে সব ত ফেলে দিয়েছ

স্বামী সারদানন্দ কথিত। নরেন্দ্রনাথের তামাক খাওয়া।

তাতে কোল্কেও ভেঙ্গে গেছে।" নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দুঃ শ্যালা, আরে তখন বলেছিলাম এখন কি তার? আরে খোঁজ না সে সবগুলা কোথায় পড়ে আছে।" শরৎ মহারাজ তখন হাসিতে হাসিতে অন্ধকারে চারিদিকে হাত বুলাইতে বুলাইতে সেই ভাঙ্গা কোল্কেটা পাইলেন। শরৎ মহারাজ তখন নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "এই নাও তোমার ভাঙ্গা কোল্কেটা পেয়েছি, তামাক আর কোথায় পাব?" নরেন্দ্রনাথ তখন বলিলেন, "আরে তোর সেই পায়ের বাঁধা দোক্তাগুলা কোথায় খুঁজে দেখ্ না।" অবশেষে সেই দোক্তাপাতাগুলি হাত্‌রে হাত্‌রে খুঁজে পেয়ে হাতে রোগড়ে কোল্কেতে ভোরে দেশলাই জ্বেলে একটু আগুন করে দু'জনে হাতে করে সেই ভাঙ্গা কোল্কেতে টান্ মার্‌তে লাগিল—আর মহা আনন্দ যেন দিগ্বিজয় করিয়াছে। মনের আনন্দে দু'জনায় তামাক খাইয়া পাশাপাশি শুইয়া রহিল। একেই বলে সরল ভাবের ভালবাসা।

নরেন্দ্রনাথ এত তামাক প্রিয় ছিলেন যে চূণ দোক্তা দিয়ে হাতে মেরে খৈয়ানি করিয়া ঠোঁটের ভিতর রাখিতেন। যখন তামাক খাইবার সুবিধা হইত না তখন তিনি চাষাদের নিকট হইতে খৈয়ানি চাহিয়া লইয়া ঠোঁটে রাখিয়া দিতেন। নরেন্দ্রনাথের বংশে তামাক খাওয়াটা অত্যন্ত প্রবল। নরেন্দ্রনাথ বাল্যকালে সর্ব্বদা নস্য লইতেন এবং উড্-পেন্সিল দিয়া নস্য নাকে ঠেসিয়া দিতেন। রাত্রে ঘুমন্ত গয়ার ফেলিলে মশারির গায়ে নস্যশুদ্ধ গয়ের লাগিয়া

নরেন্দ্রনাথের নাকে নস্য লওয়া।

যাইত সেইজন্য নরেন্দ্রনাথের শিশু ভাইবোনেরা তাঁহার পার্শ্বে শুইতে চাহিত না। নরেন্দ্রনাথ ঘুমন্ত রাত্রে উঠিয়া নাকে নস্য দিয়া আবার তবে শুইতেন।

একবার নরেন্দ্রনাথ ও শরৎ মহারাজ দু'জনায় হেঁটে কোথায় যাচ্ছেন। রাত্রে একটা গ্রামে আশ্রয় লইলেন। গ্রামে কিছু আহার পাবার পর শুনিলেন যে সেই গ্রামে বড় কলেরা হচ্ছে। ইহা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথের মনটা বড় উদ্বিগ্ন হইল। তিনি সেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া দূরে একটা শিব মন্দিরে গিয়া শুইয়া রহিলেন—মনে করিলেন যে সেখানে কোন কলেরা রোগী নাই। কিন্তু প্রাতে উঠিয়া দেখেন যে তিনি যেখানে শুইয়াছিলেন ঠিক তাঁহারই পার্শ্বে একটি কলেরা রোগী শুইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ তখন একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "যে জিনিষকে ভয় করি সেই জিনিষই পেছনে চলে।"

নরেন্দ্রনাথ ও দেশাই।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে অবস্থান কালে গুজরাট দেশীয় দেশাই নামক জনৈক ব্যক্তি স্বামিজীর নিকট আসিতেন। কথাপ্রসঙ্গে একদিন স্বামিজী দেশাইকে বলিলেন, "ছ্যাখ সাধুর জীবন ভারতবর্ষে অতি কষ্টকর। ভিক্ষা করে খাওয়া আর স্যাঁতানে মেঝেতে পড়ে থাকা, সেইজন্য লম্বেগো বা গেঁটে বাত হইয়া যায়। ৺কাশীতে যখন ছিলুম মাধুকরী কত্তুম আর একটা ভূতের বাগানে পড়ে থাকতুম। সেই পোড়ো বাগানে স্যাঁৎস্যেঁতে জায়গায় শুয়ে থেকে গেঁটে বাত ধরে গেল। দেখলুম বাগানটাতে গাছে খুব,

লেবু ফলে রয়েছে। সেই লেবু পাড়তুম আর চুষতুম্ তাইতে অসুখটা অনেক কমে গিয়েছিল” এই বলিয়া দেশাইকে সাধুর জীবনে যে কি কষ্ট করিতে হয় তাহাই আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন। স্বামিজীর লণ্ডন অবস্থানকালেও মাঝেমাঝে এই রোগটা দেখা দিত।

আলমোড়ায় নরেন্দ্রনাথ।

একত্রে বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্ঘ আলমোড়ায় বদ্রিসার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং কয়েক মাস তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। আলমোড়ায় অবস্থান কালে নরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভগ্নী আত্মহত্যা করে এবং বর্ত্তমান লেখক সেই খবর শরৎ মহারাজের নামে তারযোগে নরেন্দ্রনাথের নিকট প্রেরণ করেন। শরৎ মহারাজ টেলিগ্রামখানি নরেন্দ্রনাথকে শুনাইলে, তিনি অত্যন্ত শোকার্ত্ত হন; ইহাতে তাঁহার প্রাণে বড় ব্যথা লাগিয়াছিল। তিনি একেবারে শরৎ মহারাজ প্রভৃতিকে কঠোরভাবে কহিয়াছিলেন যে তাহাদের স্থিতি গতির বিষয় বাঙ্গালাদেশে কেহ যেন খবর না দেয়। নরেন্দ্রনাথ সকলকে ত্যাগ করিয়া একাকী পর্য্যটন করিবেন স্থির করিলেন, কারণ পাঁচজনে একসঙ্গে থাকিলেই বাহির হইতে অনেক খবরা খবর হইয়া থাকে।

আলমোড়ায় অবস্থানকালে একবার একটি বড় মাছ সকলে পাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ মহাসের মাছ। মাছের পেট থেকে খানিক্‌টা ডিম বেরিয়েছিল। বাঙ্গালী, সেইজন্য মাছের ডিম পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইয়া রাঁধিয়া

খাইলেন। কিছুক্ষণ পরে নরেন্দ্রনাথের দাস্ত হইতে লাগিল এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন পরিচিত পাহাড়ীরা আসিয়া পীড়ার নানারকম প্রশ্ন করিতে লাগিল। অবশেষে বুঝিতে পারিল যে মাছের ডিম খাইয়াছে সেইজন্য দাস্ত হইতেছিল। তখন তাহারা বুঝাইয়াদিল যে পাহাড়ে মাছের ডিম খাওয়া নিষিদ্ধ এবং যতক্ষণ না ডিমের শেষ টুক্‌রা পর্য্যন্ত বাহির হইয়া যায় ততক্ষণ দাস্ত চলিবে। অবশেষে নরেন্দ্রনাথ সুস্থ হইলেন। ইংলণ্ডের লোকেরা মাছের ডিম (fish roe) খায় না বোধ হয় উহাদেরও এইরূপ কোন কারণ আছে সেইজন্য তাহারাও খায় না।

গাড়োয়াল পাহাড়ে নরেন্দ্রনাথ।

নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলে মিলিয়া একবার গাড়োয়াল পাহাড়ের কোন এক স্থানে যাইতেছেন। সন্ধ্যার সময় একটি গ্রাম দেখিতে পাইলেন। চার পাঁচ জন মিলিয়া গ্রামে গিয়া বসিলেন কিন্তু গ্রামস্থ কোন লোকই খবরা খবর লইল না। এক সময় এক সাধু গঙ্গাধর মহারাজকে বলিয়াছিল যে গাড়োয়ালদের গ্রামে গিয়া খুব চীৎকার না করিলে কেহ কিছু দেবে না। বালকস্বভাব গঙ্গাধর মহারাজ গল্পটি শুনিয়াছিলেন মাত্র কিন্তু কার্য্যে পরিণত করেন নাই। অবশেষে সাধুর উক্তিটি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সকলে চেষ্টা করিতে লাগিল। তাঁহারা গ্রামের মধ্যে একস্থলে বসিয়া কতকটা কৌতুক ও কতকটা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তারস্বরে সকলে মিলিয়া চীৎকার

করিতে লাগিলেন, "লেক্ড়ি লাও, আটা লাও, ডাল লাও" এইরূপ গগনভেদী চীৎকার করায় এক পাহাড়ি বৃদ্ধ বাহির হইয়া আসিল এবং গাঁয়ের মোড়লকে ডাকিতে লাগিল, "এ পার্‌ধান, বাবা লোক আয়া হ্যায়।" পাহাড়িরা মোড়ল বা প্রধানকে পার্‌ধান বলিয়া থাকে। এই কথাটি তাহাদের সম্মানসূচক শব্দ। পার্‌ধান আসিয়া কাঠ, ডাল, আটা, প্রভৃতি আবশ্যকীয় সমস্ত সামগ্রী দিল। পাহাড়ে একটি কথা প্রচলিত আছে যে—"গাড়োয়াল সরীখা দাতা নহী, বেগর লট্টা দেতা নহী।" অর্থাৎ জোর করিয়া লইতে পারিলে, গাড়োয়ালবাসীদের তুল্য দাতা নাই।

নরেন্দ্রনাথ ও অখণ্ডানন্দ স্বামী।

গঙ্গাধর মহারাজ নরেন্দ্রনাথকে গ্রামে বা পল্লীতে মাধুকরী করিতে যাইতে দিতেন না। তিনি নিজে বাহির হইয়া নরেন্দ্রনাথ ও নিজের জন্য ভিক্ষা করিয়া আনিতেন। শরৎ মহারাজ নিজের জন্য ভিক্ষা করিয়া আনিতেন। কালীবেদান্তী উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ে পর্য্যটন করিতে করিতে একবার এক গ্রামে ভিক্ষা করিতে যান। ভেড়াওয়ালাদের বড় বড় কুকুর তাঁহাকে তাড়া করিয়া আসিয়াছিল। কালীবেদান্তী নিরুপায় হইয়া গ্রামের লোকদিগকে ডাকা-ডাকি করাতে তবে তাহারা কুকুরটিকে ফিরাইয়া লইয়া যায়। এইজন্য সকলে ঠাট্টা করিত, "ভিক্ষাবাজে আসি কুত্তা বোলাই লে রাম।"

কালীবেদান্তী অতি প্রত্যুষে বা সন্ধ্যার সময় ভিক্ষা

করিতে যাইতেন কারণ গ্রামের পুরুষেরা সকাল হলেই আপন আপন কাযে চলিয়া যায় ও সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরিয়া আসে।

স্বামী সচ্চিদানন্দর (নং ১) ভ্রমণ।

দীন মহারাজ এক সময় পাহাড় পর্য্যটন করিতে করিতে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া নাইনিতাল জেলায় পোঁছিলেন। তথায় দেখিলেন যে দূরে একখানি গ্রাম এবং তাহাতে অনেক গুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শিবালয় রহিয়াছে। একটি শিবালয়ে একজন সাধু বসিয়া আছেন। দীন মহারাজ অপর একটি মন্দিরে বসিয়া বিশ্রাম করিবার অল্পক্ষণ পরেই এক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আসিয়া অতি বিনীতভাবে দীন মহারাজের কি কি প্রয়োজন জানিতে ইচ্ছা করিলেন। দীন মহারাজ তখন ক্ষুধার্ত্ত—কিছু খাদ্যদ্রব্য চাহিলেন,—"কুচ ভোজন মিল্ যায়?" স্ত্রীলোকটি ত্বরান্বিত হইয়া দীন মহারাজকে আহার্য্য আনিয়া দিলেন এবং আহারান্তে পুনরায় অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে তিনি যদি রেল ভাড়া, কম্বল বা অন্য কোন জিনিষ লইতে ইচ্ছা করেন। দীন মহারাজ ত্যাগী পুরুষ, তিনি কিছুই গ্রহণ করিলেন না। দূরের অপর সাধুটি সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাইবেন বলিয়া আর একটি স্ত্রীলোকের কাছ হইতে অনেক টাকা গ্রহণ করিলেন। অপর স্ত্রীলোকটি স্বচ্ছন্দে সেই সাধুটিকে পাথেয় দিলেন। দীন মহারাজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলে অপর গ্রামের লোকেরা বলিল যে পূর্ব্ব গ্রামখানি রমজানিদের গ্রাম ছিল অর্থাৎ পাহাড়ে নট ও

নটী বলিয়া এক জাতী আছে তাহাদেরই ঐ গ্রাম ছিল। দীন মহারাজ কিছুই জানিতেন না, সেইজন্য কোন বিশেষ কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলে পাহাড়ের অনেক স্থান একত্রে ভ্রমণ করিয়া সকলেই কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। সে সময় সকলের যেন ভগবান লাভের জন্য একটা উন্মত্তভাব আসিয়াছিল। জগত-সংসার আছে কি নাই তাহার কোন খোঁজ খবর থাকিত না। দেহটাকে তুচ্ছ মনে করিতেন, অনবরত মুখে শাস্ত্রালাপ ও কঠোর সাধনার কথা লাগিয়া থাকিত। অবশেষে সকলে হৃষিকেশে গমন করিলেন। হৃষিকেশ তখন মহা দুর্গম স্থান। রাস্তা ঘাট কিছুই তখন ছিল না, দু' একটি সত্র, দু' একটি মন্দির ব্যতীত সমস্তই জঙ্গলে পরিপূর্ণ। জঙ্গলে বুনো হাতী ও বাঘের বিশেষ ভয় ছিল। সকলেই প্রায় ঝুপড়ি বাঁধিয়া ইচ্ছামত স্থানে বাস করিতেন। সান্ন্যাল মহাশয় তখন সঙ্গে ছিলেন। রাখাল মহারাজ এবং হরি মহারাজও সঙ্গে ছিলেন। কারণ পাঁচ ছয়জনে একত্রিত হইয়া হৃষিকেশে বাস করিয়াছিলেন। কঠোর তপস্যা করিয়া যেটুকু সময় থাকিত তাহা শাস্ত্রালাপে ও ভগবৎ প্রসঙ্গে অতিবাহিত হইত। নরেন্দ্রনাথ এই সময় কেদারখণ্ড পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইয়া ছিলেন। সঙ্ঘের ভিতর একবার একজনের অসুখ করে, তখন সকলেই স্থির হইয়া তাহার সেবা করেন। তাহাদের অসুস্থ ব্যক্তির শুশ্রূষা দেখিয়া

হৃষিকেশে নরেন্দ্রনাথ।

হিন্দুস্থানী সাধুরা আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "এই বাঙ্গালী সাধুদের পরস্পরের প্রতি কি শ্রদ্ধা, কি.ভালবাসা ! অপর সাধুদের ভিতর এরূপ দেখা যায় না।" এই জন্য হিন্দুস্থানী সাধুরা এই সঙ্ঘকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন।

হৃষিকেশে নরেন্দ্রনাথের খিচুড়ি খাওয়া।

হৃষিকেশে অবস্থানকালে অতি কঠোর তপস্যা করায় ও নিরন্তর অল্প আহার ও অনাহারে থাকায় নরেন্দ্রনাথের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। কয়েক দিবস জ্বর হইল। জ্বর একটু কমিলে নরেন্দ্রনাথ খিচুড়ি খাইতে ইচ্ছা করিলেন। সকলে মিলিয়া সত্র বা অন্যান্য স্থান হইতে চাল ডাল প্রভৃতি যোগাড় করিয়া আনিয়া খিচুড়ি রাঁধিতে চেষ্টা করিলেন। অতি ধীর ও বালক স্বভাব রাখাল মহারাজ খিচুড়ি অতি সুস্বাদু হইবে, এই ভাবিয়া এক ডেলা মিছরি ফেলিয়া দিলেন। নরেন্দ্রনাথ লঙ্কা খাইতে ভাল বাসিতেন এবং তীব্র ঝালবস্তু তাঁহার প্রিয় ছিল। মিষ্ট দ্রব্য একেবারেই পছন্দ করিতেন না। প্রথম দিন পথ্যের সময় খিচুড়ি মুখে দিয়াই একেবারে মুখ সিট্‌কাইয়া উঠিলেন, তাহার পর খিচুড়ির ভিতর লম্বা একটা সূতা দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "খিচুড়িতে একটা সুতা কেন রে ? আর খিচুড়িটা এত মিষ্ট হয়েছে কেন ?" সকলে বলিল, "রাখাল মহারাজ খিচুড়িতে এক ডেলা মিছরি ফেলে দিয়েছে" নরেন্দ্রনাথ তখন বিরক্ত ও কৌতুকচ্ছলে রাখাল মহারাজকে বলিতে লাগিলেন, "দুঃ শ্যালা ! খিচুড়িতে কখন মিছরি দেয় রে ? শ্যালা তোর একটু আক্কেল নেই ?" রাখাল মহারাজ

অতি ধীর ও নম্র স্বভাব, কাচুমাচু করিয়া একেবারে নীরব রহিলেন—যেন কত অপরাধ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পর বলরাম বাবুর বাড়ীতে একবার কে একজন খিচুড়ি রাঁধিতে ছিল; রাখাল মহারাজ বড় ঘরটির পশ্চিমদিকের তাক হইতে এক ডেলা মিছরি খিচুড়িতে দিয়া আসিলেন। সান্ন্যাল মহাশয় তাই দেখিয়া কৌতুক করিয়া রাখাল মহারাজকে বলিলেন, "একি হৃষিকেশের খিচুড়ি রান্না হচ্ছে নাকি ?" বর্ত্তমান লেখক ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় সান্ন্যাল মহাশয় তখন এই উপাখ্যানটি বলিয়াছিলেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ও তৎপূর্ব্বে হরিদ্বার, কংখল, হৃষিকেশ প্রভৃতি স্থান অতি ভীষণ ছিল। তখন সাহারানপুর পর্য্যন্ত রেল হইয়াছিল এবং কয়েক বৎসর পর হরিদ্বারেতে নামে মাত্র একটি ষ্টেশন হইল। রাস্তা, ঘাট, পোল, বাড়ী তখন এসব কিছুই ছিল না। লাক্সারেও একটি ভাঙ্গা মাল-গাড়ীতে ষ্টেশন হইল। ভীষণ বন, তখন অতি অল্প লোকের বাস ছিল। বুনো হাতী ও বাঘের ভয়ে সর্ব্বদা লোককে শঙ্কিত থাকিতে হইত। সত্যনারায়ণের মন্দির গঙ্গা ও সং নদীর মাঝের একটা চড়াতে ছিল এবং সেখানে চার পাঁচ ঘর বসতিও ছিল। সে চড়াটি এখন মন্দির সমেত ভাসিয়া গিয়াছে। হৃষিকেশে কালী কম্বুলিবাবার সত্র এবং আর একটি কি দুইটি সত্র ছিল। দুটি সত্র সময় সময় বন্ধ থাকিত, শুধু কম্বলিবাবার সত্রই বারমাস খোলা থাকিত। আগেকার পথ মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া যাইতে হইত।

পূর্ব্বে হৃষিকেশ, কংখল প্রভৃতির অবস্থা।

এক্ষণে সেই স্থানকে ত্রিবেণীর ঘাট বলে। তখন বাজার হাট্ কিছুই ছিল না, দু'একখানি মুদির দোকান ও লাড্ডুর দোকান ছিল। পথ দুর্গম বলিয়া যাত্রী বড় যাইত না। সাধুরাই কেবল বাস করিতেন ও কম্বলিবাবার সত্র হইতে আহারাদি পাইতেন। তখন সত্রে সাধুর আবশ্যকীয় সমস্ত বস্তু চাহিলেই দিত এবং অভ্যাগত সাধুদিগকে অতি যত্ন ও শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে ভোজন করাইত। কম্বলিবাবা উদ্যমী ও মহা ত্যাগী সাধু ছিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে হৃষিকেশ হইতে উত্তরাখণ্ডে বদরিনারায়ণের পথে অনেক সদাব্রত, সত্র, রাস্তা, পোল ইত্যাদি স্থাপিত হয়। তিনি যেমনি ত্যাগী তেমনি কর্ম্মবীর ছিলেন।

কম্বলিবাবার সত্র।

নরেন্দ্রনাথ হৃষিকেশে অবস্থানকালে কম্বলিবাবার উভয়বিধ ভাব বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং আমেরিকা হইতে ফিরিয়া মাদ্রাজ অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে কম্বলিবাবার বিষয় অনেক উল্লেখ করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথের কর্ম্মের ভাব কম্বলিবাবার কার্য্য দেখিয়া অনেক পরিমাণে জাগ্রত হইয়াছিল ইহা অনেকটা বেশ অনুমান করিতে পারা যায়। হৃষিকেশে পীড়ার সময় ঔষধ ও চিকিৎসার বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল এবং সাধুদিগের শরীর অসুস্থ হইলে কিরূপ দুর্গতি হয় এই সকল বিষয় তিনি পরিদর্শন ও হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া সেবাশ্রম করিবার জন্য এত প্রয়াস করিয়াছেন।

রাখাল মহারাজ বৃন্দাবনে ও কুসুম সরোবর প্রভৃতি

স্থানে যে রকম তপস্যা করিয়াছিলেন হৃষিকেশে অবস্থান কালে তিনি একমনা হইয়া ততোধিক সাধনা করিয়াছিলেন। সারাদিন বসিয়া একনিষ্ঠ মনে জপ করিতেন। অল্পভাষী, ধীর, নম্র ও ঋজু স্বভাব বলিয়া তিনি কোন গোলমালে যাইতেন না। ইহা বলা বাহুল্য মাত্র যে এরূপ কঠোর তপস্যা না করিলে ভবিষ্যতে এরূপ উচ্চাবস্থার সাধক হইতেন না।

সারদানন্দ স্বামীর নরেন্দ্রনাথের কাপড় কাচা।

নরেন্দ্রনাথের শরীর বড় অসুস্থ, চলা ফেরা করিবার সামর্থ্য বড় ছিল না, প্রায়ই শুইয়া থাকিতেন। নরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বদিনের পরিধেয় কাপড়খানি কাচিতে হইবে, সেইজন্য শরৎ মহারাজ আগ্রহ করিয়া নিজে কাপড় খানি কাচিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস করিতে লাগিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ অনিচ্ছুক ও ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "সে কি হয়, তুমি সাধু; তুমি আমার কাপড় কাচিবে কেন?" তথাপি শরৎ মহারাজ আগ্রহান্বিত হইয়া কাপড়খানি লইয়া কাচিয়া দিলেন। কার্য্যটা সামান্য হইলেও পরস্পরের প্রতি কি একটা শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রকাশ পাইতেছে! প্রত্যেকেই প্রত্যেককে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের রূপান্তর দেখিতেন এবং সেইভাবে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। হাসি কৌতুক ও বিদ্রূপের ভিতরও একটা মাধুর্য্যভাব ছিল এবং পরস্পরের প্রতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, এক প্রাণ ও ভালাবাসা খুব প্রবল ছিল।

গঙ্গাধর মহারাজ বয়সে সর্ব্ব কনিষ্ঠ, এবং হাস্য কৌতুক

প্রিয় ও বালকোচিত চপল স্বভাব ছিলেন সেইজন্য নরেন্দ্রনাথ গিরিশবাবু প্রভৃতি তাঁহাকে লইয়া বিশেষ হাস্য কৌতুক করিতেন। বরাহনগর মঠে অবস্থান কালে শীতের সময়ে একবার নরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য অনেকে আঁটপুরে বাবুরাম মহারাজের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে সকলের খেয়াল উঠিল যে ধুনি জ্বালিয়া রাত্রিতে বসিয়া বাইবেল পড়িতে হইবে। উঠানের একটা স্থানে ধুনি জ্বালিয়া সকলে মণ্ডলাকারে বসিয়া বাইবেল পড়িতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে সেইদিন বড়দিন বা যীশুর আবির্ভাবের দিন ছিল। যদিও সকলে বাইবেল ও যীশুর উপাখ্যান লইয়া মাতোয়ারা হইয়া রহিয়াছেন, তথাপি নরেন্দ্রনাথের ও গঙ্গাধর মহারাজের কৌতুক প্রিয় এবং চাপল্যের ভাব গাম্ভীর্য্যের ভিতরেও প্রকাশ পাইতে ছিল। কথা প্রসঙ্গে Cervantes রচিত Don Quixote গ্রন্থের উল্লেখ হইল। Don Quixoteএর এক ভৃত্য ছিল তাহার নাম Sanka Panza। Sanka Panza এক পান্থশালায় আহারের মূল্য না দেওয়ায় পান্থশালার সকলে Sanka Panzaকে একখানি কম্বলে শোয়াইয়া কম্বলের চারিটি খুঁট ধরিয়া লুফিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিও গঙ্গাধর মহারাজকে এক কম্বলে ফেলিয়া কম্বলের চারি খুঁট ধরিয়া তদ্রূপ লুফিতে লাগিলেন। কৌতুকপ্রিয় গঙ্গাধর মহারাজও Sanka Panzaর মত হস্তপদাদি প্রসারণ ও মুখভঙ্গি করিয়া অভিনয় করিতে লাগিলেন এবং

নরেন্দ্রনাথের আঁটপুরে গমন ও অখণ্ডানন্দ স্বামীকে লইয়া কৌতুক রহস্য করা।



পশ্চাতে দণ্ডায়মান বামদিক হইতে—লাটু মহারাজ, যোগেন মহারাজ, কালী মহারাজ, সারদা মহারাজ, হরি মহারাজ, তুলসী মহারাজ, নিরঞ্জন মহারাজ।

মধ্যস্থানে চেয়ারে বসিয়া—রাখাল মহারাজ। নীচে বসিয়া খোকা মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ

তাহা দেখিয়া সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। ইহাই অকপট ভালবাসার লক্ষণ—চাপল্যের ভিতরেও সেই প্রগাঢ় ভালবাসা।

সকলের উত্তরাখণ্ডে বাসকালে সান্যাল মহাশয় বদরিনারায়ণ প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। গঙ্গাধর মহারাজ বরাহনগর মঠ হইতে যখন পাহাড়ে চলিয়া যান তখন কিছুদিন তাঁহার কোন খবর ছিল না। সকলেই তাঁহার শরীর আছে বা নাই সম্বন্ধে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। তিনি সেইবার প্রথম তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন, তথায় অল্পদিন থাকিয়া আবার ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং শিবানন্দ মহারাজ তাঁহাকে তিব্বতীয় পরিচ্ছদে বদ্রিনারায়ণে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে মঠে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করায় তিনি তাহাতে সম্মত না হইয়া পুনরায় তিব্বতে যাত্রা করেন।

হৃষিকেশে শারীরিক বিশেষ আরোগ্যলাভ না হওয়ায় সকলেই অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিলেন এবং অবশেষে সকলে মিরাটে আসিয়া পৌঁছিলেন। মিরাটে সকলের একত্রে আহার করার অসুবিধা হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আহার করিয়া একত্রে বাস করিতে লাগিলেন। স্থান পরিবর্ত্তন ও ঔষধ পথ্য পাওয়ায় যাঁহারা রুগ্ন হইয়াছিলেন তাঁহারা একটু সুস্থ হইয়া উঠিলেন। মিরাটে নরেন্দ্রনাথ।

মিরাটের উকিল কালীপদ বসু মহাশয়ের উদ্যোগে ডিউক অফ্ কনটকে দিয়া মিরাটে একটি পুস্তকাগার

প্রতিষ্ঠিত হয়। পুস্তকাগারটি অতি সুন্দর ও তথায় বহু পুস্তক আছে। এই পুস্তকাগার হইতে গঙ্গাধর মহারাজ নরেন্দ্রনাথকে অধ্যয়ন করিবার জন্য পুস্তক আনিয়া দিতেন। মোটা মোটা বড় বড় বই আনিতেন আর সেই সব বই নরেন্দ্রনাথের দু'একদিনের ভিতর পড়া হইয়া যাইলে তাহা ফেরৎ দিয়া আবার নূতন বই আনিয়া দিতেন। এইরূপে কিছুদিন চলিতে লাগিল। শেষে একদিন ঠাট্টা করিয়া লাইব্রেরীয়ান গঙ্গাধর মহারাজকে বলিলেন, "কি মশাই, আপনি যে বই নিয়ে যান সেই বইয়ের রংচঙে বাঁধাই দেখ্‌তে না পড়তে ?" গঙ্গাধর মহারাজ প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, তিনি স্বামিজী'র জন্যে বই নিয়ে যান, তিনি বইগুলি দু'একদিনের মধ্যেই সব পড়ে ফেলেন। তাহা শুনিয়া লাইব্রেরীয়ান বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "তাত বটেই ! বুঝেছি !" গঙ্গাধর মহারাজ লাইব্রেরীয়ানের বিদ্রূপ শুনিয়া মনঃক্ষুন্ন হইলেন কারণ তিনি নরেন্দ্রনাথকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। এইরূপ ব্যঙ্গোক্তি তাঁহার পক্ষে অতি কষ্টদায়ক হইল। গঙ্গাধর মহারাজ ফিরিয়া আসিয়া নরেন্দ্রনাথকে সমস্ত বিষয় বলিলেন। নরেন্দ্রনাথ সমস্ত শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "দ্যাখ্ লোক্‌টাকে ডেকে নিয়ে আসিস্ কি ক'রে পড়্‌তে হয় দেখিয়ে দোবো। দ্যাখ্, কেউ বা এক একটা কথা দেখে দেখে পড়ে, কেউ বা এক একটা sentence দেখে দেখে পড়ে আর আমি পড়ি কি রকম জানিস্ ? আমি প্যারাগ্রাফ্ দেখে পড়ি।" এই বলিয়া

অখণ্ডানন্দ স্বামী ও মিরাটের লাইব্রেরীয়ান।

তিনি গঙ্গাধর মহারাজকে বলিলেন, "তুই বইটা ধর না আমিসব বলে যাচ্ছি।" গঙ্গাধর মহারাজ বইটি ধরিলে নরেন্দ্রনাথ বইয়েতে যাহা লেখা ছিল তাহা হইতে স্থানে স্থানে সেই ভাষাতে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া গঙ্গাধর মহারাজ ও উপস্থিত ব্যক্তিরা সকলেই অতি আশ্চার্য্যান্বিত হইলেন। একগ্রতা থাকিলে ও ভাবের সহিত তন্ময় হইলে মানুষের এইরূপ হইয়া থাকে। পুস্তক পাঠ ও ধ্যান এক করিতে পারিলে পুস্তকস্থিত ভাবগুলি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

নরেন্দ্রনাথের বিত্তাচর্চ্চা।

বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথের বিদ্যাচর্চ্চায় বিশেষ আগ্রহ ছিল। পাঠ্যাবস্থা হইতেই তিনি নানাবিধ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। বি, এ, পরীক্ষার সময় তাঁহার পঠিত কোরিওলেনাস, মিল্টন, বাইরন, হ্যামিলটন প্রভৃতি পুস্তক-গুলি মঠের পুস্তকাগারে প্রদত্ত হইয়াছে। ইংরাজী কাব্যের ভিতর মিল্টন নরেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল এবং তিনি তাহা হইতে মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিতেন। মিল্টন-আবৃত্তি-পদ্ধতি তাঁহার অতি সুন্দর ছিল। গম্ভীর ও তরঙ্গায়মান শব্দে তিনি মিল্টনের শ্লোকগুলি অতি সুন্দর ভাবে আবৃত্তি করিতেন। বর্ত্তমান লেখক তাঁহার নিকট হইতে মিল্টনের আবৃত্তি পদ্ধতি শিখিয়াছিলেন। শেক্সপিয়ারের গ্রন্থগুলির সহিত তিনি বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন এবং আমেরিকায় বক্তৃতাকালে "রোমিও জুলিয়েট" ও "মিড সামার নাইটস্ ড্রিম্" হইতে উদ্ধৃত করিয়া

আবৃত্তি করিয়াছিলেন। বাইরন তিনি খুবই পড়িতেন এবং ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থ তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। ইহা ব্যতীত সাধারণ ইংরাজী কাব্য তিনি প্রবীণ অধ্যাপকের ন্যায় পড়াইতে পারিতেন। অর্থাৎ ইংরাজী সাহিত্যের অধিকাংশ পুস্তকই তাঁহার বিশেষ আয়ত্ত্ব ছিল। কলেজে তিনি Hamiltonএর Metaphysics পড়িয়াছিলেন। John Stuart Mill ও Herbert Spencer তিনি অতিশয় পড়িতেন। Mill ও Spencer এর প্রভাব প্রথম অবস্থায় তাঁহার জীবনের উপর বিশেষ কার্য্য করিয়াছিল। তিনি Herbert Spencerএর Education পুস্তকখানি বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত করিয়াছিলেন। এই সময় Herbert Spencer নিজ হস্তে অনুবাদের অনুমতি প্রদান ও বিশেষ উৎসাহ দিয়া একখানি পত্র লিখয়াছিলেন কিন্তু সেই পত্রখানি তখন বিশেষ আদরের জিনিষ না বিবেচনা করায় যত্ন করিয়া রক্ষা করা হয় নাই সেইজন্য পত্রখানি নষ্ট হইয়া যায়। Lockএর পুস্তকখানি তিনি খুব পড়িতেন, সম্ভবতঃ সেই পুস্তকখানিও মঠের পুস্তকাগারে প্রদত্ত হইয়াছে। প্লেটোর পুস্তকগুলিও তাঁহার বিশেষ পড়া ছিল। কারণ বর্ত্তমান লেখককে ও কালীবেদান্তীকে তিনি বলরাম বাবুর বাড়ীতে প্লেটোর Phaedon পড়াইয়াছিলেন। Uberwegএর History of philosophy, Kant ও ইংরাজী দর্শনশাস্ত্রগুলি তিনি প্রথমেই পাঠ করিয়া লইয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের বাল্যকালে ইংরাজি পুস্তক অনুবাদ করা।

ইতিহাস অধ্যয়নের বিষয় বিশেষ বলা বাহুল্য। কারণ নরেন্দ্রনাথের পিতা ইতিহাস বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিতেন। নরেন্দ্রনাথের বংশ সকলেই ইতিহাসে পারদর্শী। নরেন্দ্রনাথের খুল্লতাত তারকনাথ দত্ত গণিত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন কিন্তু নরেন্দ্রনাথের গণিত শাস্ত্র চর্চ্চা ইচ্ছাটা তত ছিল না। স্কুলে পড়া যতটুকু গণিত শাস্ত্র জানা আবশ্যক ততটুকু শিখিয়াছিলেন, তাহার বেশী আলোচনা করেন নাই। Political economy, Sociology তাঁহার প্রিয় জিনিস ছিল। এক সময় তিনি Pathology Zoology পড়িতে স্বরু করিলেন। তিনি ফিরিকর পুস্তক বিক্রেতার নিকট হইতে ফরাসী রন্ধনের পুস্তক ও Soldier Pocket Drill Book খরিদ করিয়া পড়িতে লাগিলেন। যখন Entrance পাশ করেন তখন নেপোলিয়নের ভাবটী বিশেষ জাগ্রত হইয়াছিল এইজন্য কয়েকখানি Drill book পড়ি লাগিলেন। আবার অন্য সময় Physiology প্রভৃতি নানা শাস্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রনাথের ইতিহাস অধ্যয়ন।

বাঙ্গালা পুস্তকের ভিতর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর এত মন দিয়া পড়িয়াছিলেন যে মাঝে মাঝে সেই পুস্তক হইতে স্থান উদ্ধৃত করিয়া আবৃত্তি করিতেন। হীরে মালিনীর কথা লইয়া মাঝে মাঝে কৌতুক করিতেন এবং মানসিংহের যশোর যাত্রা অতি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকাবলী ও

নরেন্দ্রনাথের বাঙ্গলা পুস্তক অধ্যয়ন।

মাইকেলের কাব্যগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। মেঘনাদবধ কাব্যখানি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। তিনি অনেক সময় বলিতেন, "মাইকেলই বাঙ্গালা দেশে একটা বিশেষ কবি জন্মে ছিল।" দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশীর কথা সর্ব্বদা তাঁহার মুখে লাগিয়া থাকিত। একটু হাসি তামাসার কথা হইলেই তিনি সধবার একাদশীর কোন না কোন বোল্ তুলিয়া ঠাট্টা করিতেন। নীলদর্পণ থেকেও তিনি মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিতেন। একথা এখানে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে দীনবন্ধু মিত্র ও ঈশ্বর গুপ্ত নরেন্দ্রনাথদের গৌর মোহন মুখার্জ্জির গলির বাড়ীতে সর্ব্বদা যাতায়াত ও বসা-দাঁড়া করিতেন। নরেন্দ্রনাথের খুল্ল পিতামহের সহিত ঈশ্বর গুপ্ত "ভাই" পাতিয়াছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথের পিতা তাঁহাকে খুল্লপিতার ন্যায় সম্মান করিতেন। যদিও ঈশ্বর গুপ্তের কথা নরেন্দ্রনাথ সর্ব্বদা বাড়ীতে শুনিতেন কিন্তু তাঁহাকে দেখেন নাই। দীনবন্ধু মিত্র পাড়া প্রতিবেশী সেইজন্য শৈশবে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কবিতা 'সুদর্শন সবিতা' কাব্যখানি তিনি বিশেষ পছন্দ করিতেন এবং ঐ ছন্দটী তাঁহার বিশেষ ভাল লাগিত। রামদাস সেনের গ্রন্থগুলি বিশেষতঃ "ভারত রহস্যখানি" খুব পছন্দ করিতেন।

কালীদাসের গ্রন্থের ভিতর কুমারসম্ভব, শকুন্তলা ও মেঘদূত তাঁহার প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁহাকে এফ, এ, পড়িবার সময় ভট্টি পড়িতে হইয়াছিল। সংস্কৃত

দর্শন শাস্ত্র ও কাব্যের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। হরমোহন মিত্র Asiatic Society হইতে বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি আনিয়া দিত আর নরেন্দ্রনাথ সেইগুলি পড়িয়া লইতেন। ললিত বিস্তরখানি তাঁহার বিশেষ জানা ছিল। একবার ন্যায় পড়িবার ইচ্ছা হওয়ায় সংস্কৃত ও ইউরোপিয় ন্যায় শাস্ত্রগুলি পাঠ করিয়া লইলেন। রাজপুতানায় অবস্থান কালে জৈনদের পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া লইয়াছিলেন এবং Englandএ বাসকালে ফরাশী ভাষা বেশ শিখিয়া লইয়াছিলেন। বেদ ও অন্যান্য সংস্কৃত শাস্ত্র তিনি যে জানিতেন সে বিষয় বলা বাহুল্য। পাঠ্যাবস্থায় তিনি খৃষ্টান ও ইহুদিদিগের অনেক বই পাঠ করিয়াছিলেন। Assarianদিগের বড় বড় নাম উচ্চারণ করিতে শুনিয়া বলরাম বাবু কৌতুক করিয়া বলিতেন, "নরেন বাবু, কি করে তোমরা এই বড় বড় নাম উচ্চারণ কর আর মনে রাখ ?"

নরেন্দ্রনাথের ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন।

ফরাসী বিপ্লববাদের বইগুলি তিনি বড় মন দিয়া পড়িয়া ছিলেন। এক সময় তাঁহার ঐ বইগুলি বড় ভাল লাগিত। Carlyleএর Hero and Hero worship এবং Emersonএর Representative men এই দুইখানি গ্রন্থ লইয়া তিনি অনেক তর্ক বিতর্ক করিতেন। রামায়ণ ও মহাভারত বিশেষ প্রিয় ছিল। যে সমস্ত বড় বড় পুস্তকের নাম করা গেল তাহা নরেন্দ্রনাথের বিদ্যার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। যাঁহাকে সমুদ্র বিশেষ পুস্তক পড়িতে হইয়াছিল তাঁহার এক গণ্ডূষ মাত্র পরিচয় দেওয়ায় বিদ্যাচর্চ্চার বিশেষ কিছু

পরিচয় দেওয়া হইল না। কেবল মাত্র এস্থানে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইল মাত্র।

হরি মহারাজের সহিত প্রথম যখন বাগবাজারে চিৎপুর রোডের ডাক্তারখানাটীতে দেখা হয়, তখন থেকেই তাঁহার ভিতর যে একটা বিশেষত্ব আছে তাহা স্পষ্ট বোঝা যাইয়াছিল। তখন তাঁহার বয়স অল্প হইলেও সাধারণ লোক হইতে তিনি সম্পূর্ণ পৃথক ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ ও বর্ত্তমান লেখক যখন ডাক্তারখানাটীতে যান তখন নরেন্দ্রনাথ চাপল্য ও কৌতুকভাব পরিত্যাগ করিয়া অতি গম্ভীর ও সংযত ভাবে হরি মহারাজের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। মিরাটে অবস্থানকালে একদিন নরেন্দ্রনাথ হরি মহারাজকে মাংস খাইতে দেন। নরেন্দ্রনাথের স্বহস্তে রন্ধন করা মাংস এবং স্বয়ং তিনি দিতেছেন এইজন্য অনভ্যস্ত হইলেও নির্ব্বিকার হরি মহারাজ আনন্দের সহিত সেই মাংস খাইলেন। এমন নির্লিপ্ত ও নির্ব্বিকার পুরুষ খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। শক্তিমান পুরুষ হইলেও তিনি শক্তিকে সংযত করিয়া অতি সামান্য ব্যক্তির ন্যায় সাধারণের সম্মুখে থাকিতেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দর মাংস আহার করা।

মিরাট অবস্থানকালে নরেন্দ্রনাথের নাম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল এবং অনেক ভদ্রলোক আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে মুসলমান সমাজের ভিতরেও তাঁহার নাম প্রচারিত হইল। মিরাটে কাবুলের রাজ্যচ্যুত বা তৎসম্পর্কীয় এক উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি রাজবন্দী হইয়া বাস

করিতেন। তিনি সাধারণ লোকের নিকট আমীর সাহেব বলিয়া অভিহিত হইতেন। আমীর সাহেবের কাছে কথা উঠিল যে একজন হিন্দু-ফকির মিরাটে আসিয়াছে। তিনি অনেক শাস্ত্র পড়িয়াছেন ও সকল ধর্ম্মের প্রতি সমান আস্থা দেখাইয়া থাকেন। মুসলমান লোক স্বভাবতঃই ধর্ম্মপরায়ণ ও ঈশ্বর অনুরাগী। ঈশ্বরের কথা ও ধর্ম্মের জন্য তাহারা প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে সঙ্কুচিত হয় না কিন্তু সাম্প্রদায়িক গোড়ামী হইলেই তাহারা বিরক্ত হইয়া যান ও বিদ্বেষী হইয়া উঠেন। তাহাদের শ্রদ্ধা ভক্তি তখন দ্বেষ ও ক্রোধে পরিণত হয়। আমীর সাহেব খবর পাঠাইলেন যে তিনি হিন্দু ফকিরটিকে দর্শন করিতে যাইবেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে মস্‌জিদ বা তীর্থদর্শন করিতে যাইলে যে প্রকার উজু বা হস্তপদাদি প্রক্ষালন বা অষ্ট অঙ্গে জল দিয়া স্নান করিতে হয় তদ্রূপ আমীর সাহেব শুদ্ধ পবিত্র হইয়া লোকজন সঙ্গে লইয়া হিন্দু-ফকির দর্শন করিতে আসিলেন। গুরুকে যে প্রকার সম্মান করিয়া তাঁহার আজ্ঞা লইয়া তবে বসিতে হয় আমীর সাহেবও সেইরূপ করিলেন। নরেন্দ্রনাথের সহিত ধর্ম্ম-বিষয়ে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিয়া বিশেষ প্রীত হইলেন এবং তিনি যে একজন সিদ্ধ পুরুষ বা আউলিয়া দর্শন করিয়াছেন তাহা তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা জন্মাইল এবং সকলকে বলিতে লাগিলেন। আরবী পাশা কলিকাতায় আসিয়া যেরূপ ভাবে কেশবচন্দ্র সেনকে সম্মান প্রদর্শন

আমীর সাহেব।

করিয়াছিলেন আমীর সাহেবও নরেন্দ্রনাথকে সেইভাবে শ্রদ্ধা ভক্তি দেখাইলেন।

নরেন্দ্রনাথ ও আমীর সাহেব।

নরেন্দ্রনাথ মুসলমান ধর্ম্মের বহু গ্রন্থপাঠ করিয়াছিলেন সেইজন্য আমীর সাহেবকে মুসলমান ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব ও অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথের মুখে মুসলমান ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া আমীর সাহেব তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। অতিথিসেবা করা মুসলমান ধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ, সেইজন্য আমীর সাহেব রাজোচিত এক সিধা নরেন্দ্রনাথকে পাঠাইয়া দেন। সহরের উৎকৃষ্ট খাদ্য সামগ্রী লোক দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ দ্রব্যগুলি গ্রহণ না করিয়া স্বয়ং পোলাও রন্ধন করিতে উদ্যোগী হইলেন। এইদিন হরি মহারাজ নরেন্দ্রনাথের সাথে মাংস খাইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই রন্ধন বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথের পিতার জীবিতাবস্থায় তাহাদের বাড়ীতে মাংস ও পোলাও সর্ব্বদাই হইত এবং অনেক লোকও খাইত। নরেন্দ্রনাথ পাঠ্যাবস্থায় ফরাসী রন্ধনের পুস্তক ক্রয় করিয়া নিজেও অনেক প্রকার রন্ধন শিখিয়াছিলেন। সেদিনকার রন্ধন অতি সুন্দর হইয়াছিল এবং তথায় আনন্দের স্রোত বহিয়াছিল।

মিরাট পর্য্যন্ত সকলে একত্রিত ছিলেন। এই স্থান হইতেই নরেন্দ্রনাথের ঘোর বৈরাগ্যের ভাব উদয় হইল। তিনি নিঃসঙ্গ হইয়া একাকী পর্য্যটন করিবেন স্থির করিলেন।

সসঙ্গ অবস্থা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। নির্ব্বাক রমতা সাধু হইয়া একাকী ভ্রমণ করিবেন স্থির করিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার খবর অতি বিরল হইল। এক সময় তিনি একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে কোথাও আশ্রয় না পাইয়া একটী বিদ্যার্থীদের পাঠশালায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। পাঠশালার ছাত্রেরা মনে করিল যে একটা রমতা এসেছে, দু'খানা রুটি পেলে চলে যাবে সেজন্য বিশেষ কিছু আদর বা সম্মান করিল না।

নরেন্দ্রনাথের মন তখন অতি বিষণ্ণ, দূরে একটা স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ছাত্রগুলি তখন ব্যাকরণ পড়িতেছিল। অধ্যাপক উপস্থিত ছিল না, ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করিবার সময় ভুল অর্থ করিতেছিল। নরেন্দ্রনাথ যদিও বিষণ্ণ ও মৌন হইয়া বসিয়াছিলেন কিন্তু এরূপ প্রমাদজনক ব্যাখ্যা শুনিয়া তিনি পাঠ্য স্থানটি সংশোধন করিয়া দিলেন। ছাত্রেরা তখন সাধুটির ব্যাকরণ জ্ঞান দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং পূর্ব্বে কোন সম্মান দেখায় নাই তাহার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। নরেন্দ্রনাথ তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া ব্যাকরণের অনেক স্থল সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিলেন। বালকগণ তখন তাঁহাকে থাকিবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিল কিন্তু তিনি আহার করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইলেন।

নরেন্দ্রনাথের ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়ান।

নরেন্দ্রনাথ আত্মগোষ্ঠী ত্যাগ করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত ও বিষণ্ণ ভাবে একাকী নানাস্থান ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই

সময়কার ঘটনা যদিও সকলে বিশেষভাবে জ্ঞাত নহে তবে যৎকিঞ্চিৎ ঘটনাক্রমে পরে জানা গিয়াছে তাহাই এখানে সন্নিবেশিত হইল। নরেন্দ্রনাথকে অনবরত প্রশ্ন করিতে বা সমানভাবে কথা কহিতে অপর কাহারও সাহস হইত না। গিরিশ বাবু অনুসন্ধিৎসু লোক। তীক্ষ্ণ-প্রতিভা গিরিশ বাবু হাস্য কৌতুকচ্ছলে নরেন্দ্রনাথকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। গিরিশ বাবু বলিয়াছিলেন যে, নরেন্দ্রনাথ একবার নগ্নপদে রাস্তা দিয়া একাকী চলিয়া যাইতেছেন। পথের ধারে কতকগুলি মেথর বা ভাঙ্গি বসিয়া তামাক খাইতেছে। ক্লান্ত ও তামাকপ্রিয় নরেন্দ্রনাথ মেথরদিগের প্রতি বারকতক চাহিয়া আপনার পথে চলিয়া গেলেন। কারণ সাধু হইয়া গৈরিক বসন পড়িয়া মেথরের হাত থেকে কেমন করে ছিলাম লইয়া তামাক খায়। কিছুদূর যাইয়া তাঁহার মনে অবসাদ আসিল, তিনি পথে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে মেথর ও সাধুর তফাৎ এখনও তাহার মনে রয়েছে। তিনি পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভাঙ্গিদের কাছে যাইয়া তাহাদের হস্তস্থিত ছিলাম লইয়া তামাক সেবন করিয়া তাহার পর আবার চলিতে লাগিলেন।" গিরিশ বাবু এই কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন, "তুমি বেজায় তামাক খোব নাকি তাই ঝোঁকের মাথায় ভাঙ্গিদের হাত থেকে তামাক খেয়েছ।" নরেন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তর করিলেন, "না তা নয় পাছে মনে ইতর বিশেষ ভাব জাগে ও অহঙ্কার আসে তাই তাদের হাতে তামাক খেয়েছিলুম।"

নরেন্দ্রনাথের মেথরদের হাতে তামাক খাওয়া।

নরেন্দ্রনাথ যখন একাকী ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন একটি থানাদার তাঁহার পেছন লইল ও নানারূপ রূঢ় প্রশ্ন করিতে লাগিল। অবশেষে কয়েদ করিবারও ভয় দেখাইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথের মন তখন অতি বিষণ্ণ, স্নিগ্ধ ও মধুরভাবে বলিলেন, "তা চলুন না এরূপ অনিশ্চিত অনাহারে থাকার চেয়ে তবুও তো তথায় দুবার খেতে পাওয়া যাবে, সে ত ভাল কথা।" কথাগুলি এমন স্নেহপূর্ণ বিষাদসূচক নম্রভাবে বলিয়াছিলেন যে থানাদার অপ্রতিভ হইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। নরেন্দ্রনাথ ও জনৈক থানাদার।

এই সময় নরেন্দ্রনাথের কিছুদিন কোন খবর পাওয়া যায় নাই। সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, কিন্তু কোন খোঁজ খবর পাওয়া যাইতেছিল না। গরমকালে একদিন শরৎ মহারাজের নামে বাঙ্গালায় লেখা একখানি পত্র আসিল, খামে জয়পুরের শীল করা, নাম নাই। চিঠিতে লেখা ছিল, "বরাহনগরের হাত কাটা হাবুদের বাড়ীতে একটা ঔষধ আছে সেই ঔষধটা অমুক ঠিকানায় পাঠাইয়া দিও" ইহা ছাড়া আর কোন কথা লেখা ছিল না। কিন্তু চিঠিখানিতে হাতের লেখা ও হাত কাটা হাবুদের নাম শুনিয়া সকলেই নরেন্দ্রনাথের চিঠি মনে করিয়া আনন্দিত হইলেন। শরৎ মহারাজ ঔষধটি তদ্রূপই পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ যখন আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আলোয়ারে যান তখন গুপ্ত মহারাজ সঙ্গে ছিলেন। নরেন্দ্র-

নাথ পরিব্রাজক অবস্থায় যখন আলোয়ারে গিয়াছিলেন তখনকার ঘটনা তিনি রাম সানাইয়ার নিকট শুনিয়াছিলেন। রাম সানাইয়া একটি হিন্দুস্থানি রম্‌তা বৈষ্ণব। তাহার একটি সহস্র তালিমারা ঘটি ছিল আর একটি ছোট নুড়ি ছিল। রাম সানাইয়ার আনন্দ হইলে সেই নুড়িটি দিয়া ঘটিটি বাজাইয়া ভজন গাহিতেন। তিনি মাধুকরী করিয়া কিছু আটা আনিতেন তাহাতে নূন ও লঙ্কা মাখিয়া ধূনিতে জ্বালাইয়া টিক্কর করিয়া লইতেন। নরেন্দ্রনাথ ও রাম সানাইয়া অনেক সময় সেই টিক্কর ও জল খাইয়া দিন কাটাইতেন; আর রাম সানাইয়া যোগাড় করিয়া একটু দা-কাটা তামাক আনিত এবং দু'জনে স্ফূর্ত্তি করিয়া একত্রিত হইয়া তামাক খাইতেন ও ঘটি বাজাইয়া ভজন গাহিতেন। অনাহার, দুঃখ, ক্লেশ ও আনন্দ যুগপৎ বিরাজ করিত।

নরেন্দ্রনাথ ও রাম সানাইয়া।

নরেন্দ্রনাথ একবার গুপ্ত মহারাজকে বলিয়াছিলেন, "ওরে রাম সানাইয়ের সঙ্গে যে কয়দিন ছিলুম বড়ই আনন্দেতে দিন কেটেছে। জগতের প্রতি দিক্‌পাত্ কত্তুম না, দেহটা তুচ্ছ মনে কত্তুম। রাম সানাইয়া বড় সরল প্রাণের লোক, অকপট ভাবে আমায় ভালবাসত।"

নরেন্দ্রনাথকে আলোয়ারে কেহই বিশেষ সেবা বা আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দেয় নাই। একটি বৃদ্ধা স্ত্রী-লোক পাঁচ বাড়ীতে চাকি পিষিয়া বা আটা ভাঙ্গিয়া পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু আটা পাইত। বৃদ্ধা সেই আটা হইতে রুটি করিয়া নিজে ও নরেন্দ্রনাথকে খাওয়াইয়াছিল

এবং নরেন্দ্রনাথকে "লালা" বা বৎস বলিয়া ডাকিত। যখন রাজ অভ্যাগত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ স্বগোষ্ঠী লইয়া আলোয়ারে যান গুপ্ত মহারাজ তখন সঙ্গে ছিলেন। এক-দিন প্রাতে স্বামিজী ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেন, সঙ্গে রাজা, রাজকর্ম্মচারিগণ এবং অন্যান্যরাও ছিলেন। কিয়ৎদূর গমন করিয়া স্বামিজী সহসা একা অন্তর্ধান হইলেন। কেহই আর স্বামিজীকে দেখিতে পাইল না। তখন সকলে স্বামিজীকে খুঁজিতে লাগিল। অবশেষে পাথর কুড়াইয়া ও ডালপালা দিয়া একটা ঝুপড়ি দেখিয়া তাহার ভিতর লোকে উঁকি মারিতে লাগিল। সকলে দেখিল যে সেই ঝুপড়ির ভিতর এক বৃদ্ধা সম্মুখের উনুনেতে একটু আগুন করিয়া বসিয়া থালাতে আটা মাখিতেছে আর স্বামিজী বালকের ন্যায় হাঁটু ছুটি তুলিয়া বৃদ্ধার নিকট বসিয়া আছেন। রাজকর্ম্মচারিদের উঁকি মারিতে দেখিয়া বৃদ্ধা ভীতা হইল কিন্তু স্বামিজী ইঙ্গিত করায় তাহারা সকলে বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। বৃদ্ধা পূর্ব্বভাবে স্বামিজীর সহিত কথা কহিতে লাগিলেন, "আরে লালা, এক বড় সাধু এসেছে শুনেছিস্? রাজার বাড়ীতে থাকে, সঙ্গে অনেক লোক, আর কত লোক তাকে দেখ্তে যায়। তুই তাকে দেখ্তে যাবি? না, তোর ক্ষিদে পেয়েছে, আমি একখানা টিক্কর ক'রে দিই তুই খা তারপর নয় সেই সাধুকে দেখ্তে যাবি। সে সাধু বড় লোক তোকে কি সেখানে ঢুকুতে দেবে?" স্বামিজী বৃদ্ধার সরল অমায়িক

নরেন্দ্রনাথ ও জনৈক বৃদ্ধা।

স্নেহ দেখিয়া একেবারে বিগলিত হইয়া পড়িলেন। তখন হৃদ্‌গত ভাব সম্বরণ করিয়া স্বামিজী বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মায়ি, তুই সেই সাধুকে দেখ্‌তে যাবি ?—আমি সেই সাধু।" বৃদ্ধা মনে করিলেন যে লালা কৌতুক করিতেছে সেইজন্য বৃদ্ধা পুনরায় বলিলেন, "তুই ত মেরা লালা অর্থাৎ আমার ছেলে। তুই ও গরিব আমিও গরিব" এই বলিয়া উনুন থেকে গরম গরম ২টি টিক্কর বাহির করিয়া ছাই ঝাড়িয়া স্বামিজীর হাতে দিলেন এবং স্বামিজীও অতি শুদ্ধ পবিত্র অন্ন বলিয়া বালকের ন্যায় আনন্দ করিয়া খাইতে লাগিলেন। কারণ পরিব্রাজক অবস্থায় যখন কেউ অন্ন দেয় নাই তখন এই বৃদ্ধা স্বামিজীকে নিজের অন্ন থেকে শুক্‌না রুটি দিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। আলোয়ার থেকে প্রত্যাবর্ত্তন কালে স্বামিজী সেই বৃদ্ধার কাছ থেকে বেজার বা পাঁচ মিশেলি আটার টিক্কর লইয়া ট্রেনে আসিলেন এবং নিজে একটু খাইলেন ও অন্যদেরও একটু একটু দিলেন। স্বামিজী পুনরায় বলিয়া দিলেন যে, বেলুড় মঠে যেন তাঁহার ঘরে ইহা রাখিয়া দেওয়া হয় কারণ বৃদ্ধার রুটি অতি শুদ্ধ পবিত্র জিনিষ।

বৃদ্ধার হাতে নরেন্দ্রনাথের টিক্কর খাওয়া।

জয়পুর দেশে ছোট ছোট অনেক রাজ্য আছে। সেখাবতি বিভাগে খেতড়ি নামক একটী ছোট রাজ্য আছে। অজিত সিং নামে রাজা তখন রাজত্ব করিতেন। এই রাজা অজিত সিংহের সহিত কি প্রকারে

নরেন্দ্রনাথের প্রথম আলাপ হয় বর্ত্তমান লেখক তাহা বিদিত নহে। কিন্তু এই খেতড়ির রাজা প্রথম নরেন্দ্রনাথের রাজা শিষ্য হইয়াছিলেন এবং একান্ত অনুগত ছিলেন।

রাজা অজিত সিং।

রাজা অজিত সিং নরেন্দ্রনাথকে অতীব শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন এবং ধর্ম্ম বিষয়ে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতেন। স্বামিজীর অসাধারণ পাণ্ডিত্য আছে বুঝিতে পারিয়া তিনি সর্ব্ব বিষয়ে প্রশ্ন করিতেন; এমন কি রাজনৈতিক বিষয়েতেও আবশ্যক মত উপদেশ লইতেন। মুন্সী জগমোহন লাল রাজা সাহেবের দেওয়ান বা Private Secretary ছিলেন। তিনি রাজা অজিত সিংএর ডানহাত-স্বরূপ। মুন্সীজী ইংরাজী, সংস্কৃত, ফারসী, উর্দ্দু ও আপন রাজস্থানের ভাষা জানিতেন এবং রাজনীতি ও কার্য্য কুশলতায় সুদক্ষ ছিলেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক, এইজন্য তিনি নিরামিষ ভোজী ও রাধাকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন। তিনি আহ্নিক-পূজা নিষ্ঠাভাবে করিতেন। মুন্সী জগমোহন লাল নরেন্দ্রনাথের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বিশেষ অনুগত ভক্ত হইয়া ছিলেন। রাজসভার অল্পবিস্তর সকলেই এই সময় নরেন্দ্রনাথের শিষ্যস্বরূপ হন। যাঁহারা আপনাদিগকে শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতেন না, তাঁহারাও নিতান্ত অনুগত ভক্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময় খেতড়ি রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি হইতে লাগিল এবং রাজসভা সর্ব্বদা খুব গমগমে ও সাধু পণ্ডিতের আদরণীয় হইয়া উঠিল। নরেন্দ্রনাথ এক এক সময়ে এক এক ভাবের

কথা কহিতেন। কখন সাধুর ভাব, খুব্ ত্যাগ বৈরাগ্য সাধনভজনের কথা কহিতেন, তখন সকলের মন সাধনমার্গের দিকে চলিত। আবার অন্য সময় দর্শন শাস্ত্রের কথা হইতেছে। কখন বা সাধারণ ইতিহাস, বিশেষতঃ রাজস্থানের ইতিহাস এমন ভাবে বলিতেছেন যে তাহা শুনিয়া সকলেই গরম হইয়া উঠিতেছে। তাহাদের পূর্ব্বকীর্ত্তি স্মরণ করিয়া ভিতরে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে এবং বাহিরের অবস্থা দেখিয়া আবার বিষাদ আসিতেছে।

খেতরি রাজ্যে নরেন্দ্রনাথ।

কখন কিরূপে রাজ্য চালাইতে হয় সে বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ প্রধান মন্ত্রীর ন্যায় বুঝাইয়া দিতেছেন, কখন বা সাধন ভজন সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ দিতেছেন, আবার কখন বা তিনি হাস্য কৌতুক করিতেছেন। সময় সময় আবার ভজন গাহিতেছেন। খেতড়ী রাজার সহিত অবস্থান সময়ের কথা বর্ত্তমান লেখক মুন্সী জগমোহন লালের কাছ থেকে শুনিয়াছিলেন এবং গঙ্গাধর মহারাজ রাজপুতানা হইতে ফিরিয়া আসিলে তিনিও সামান্য কিছু বলিয়াছিলেন। একদিন রাজবংশের উৎপত্তির কথা আরম্ভ হইলে সকলেই বিশেষ আগ্রহ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। টডের রাজস্থানখানা নরেন্দ্রনাথ যেন মুখস্থ আওড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। সকলেই খুব উৎফুল্ল: কোন্ কোন্ রাজারা চন্দ্রবংশীয়, কোন্ কোন্ রাজারা সূর্য্য বংশীয় ও কোন্ কোন্ রাজারা হরিকুল বংশীয় সেই সব বিষয় নানারকম কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। ক্রমেই

কথাটা গম্ভীর ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়া উঠিল। সকলেই নিজের মতামত প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং আপন আপন বংশ গৌরবে বিশেষ স্ফীত হইতে লাগিলেন। একটী রাজপুত মুসলমান গাইয়ে তথায় বসিয়াছিলেন, তিনি রাজসভায় ধ্রূপদ গাহিতেন এবং স্থানীয় লোক ছিলেন। খাঁ সাহেব নরেন্দ্রনাথের বিশেষ অনুগত ভক্ত ছিলেন। খাঁ সাহেব সহসা বলিয়া উঠিলেন, "স্বামিজী, কেউ ত চন্দ্রবংশ, কেউ ত হ'ল সূর্য্যবংশ; আমি ত রাজপুত, আমি কোন্ বংশ?" নরেন্দ্রনাথ গাম্ভীর্য্য ও হাস্যপূর্ণ মুখে হঠাৎ বলিলেন, 'খাঁ সাহেব চন্দ্রবংশী, সূর্য্যবংশী ত পুরাণ কথা হয়ে গেছে, তুমি হচ্ছ গিয়ে তারা বংশী!' খাঁ সাহেব এবং অন্যান্য সকলে এই তাজা কথা ও ঠাট্টা শুনিয়া মহা আনন্দ করিতে লাগিলেন। খাঁ সাহেব তদবধি আপনাকে সকলের নিকট তারাবংশী বলিয়া পরিচয় দিতেন। কলিকাতায় কটন ষ্ট্রীটে মুন্সী জগমোহন লালের কাছে খাঁ সাহেব কিছু দিন আসিয়াছিলেন। বর্ত্তমান লেখক তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। তাঁহার সহিত বর্ত্তমান লেখকের স্বামিজীর নানাপ্রকার পূর্ব্ব কথা হইতে লাগিল। খাঁ সাহেব গৌরব করিয়া আপনাকে তারাবংশী বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া বলিতে লাগিলেন, "স্বামিজী আমাকে এই নাম দিয়াছেন, এ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ উপাধি।" কিন্তু পরক্ষণেই খাঁ সাহেব একেবারে বিষন্ন হইয়া দেওয়াল ঠেস্ দিয়া হাঁটু দুইটী তুলিয়া

নরেন্দ্রনাথ ও জনৈক মুসলমান।

ভিতরে কি ভাবিতে লাগিলেন। চক্ষুতে জল আসিল, খানিকক্ষণ পরে তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "রাজাসাহেব ত চলিয়া গিয়াছেন, স্বামিজীও চলিয়া গিয়াছেন, আমাদের আর বেঁচে থেকে কি দরকার আছে? সে সব দিনের কথা মনে ক'রলে এক অপূর্ব্ব স্মৃতি আসে। কি সৎ চর্চ্চায়, কি সৎ প্রসঙ্গেই আমাদের দিন কাটতো, রাজা প্রজা ভুলে গিয়ে আমরা সকলে যেন এক হয়ে গিছ্‌লুম, সকলেই স্বামিজীর ভক্ত, সকলেই স্বামিজীর শিষ্য, সেদিন কি আর ফিরে আসবে" এই বলিয়া খাঁ সাহেব বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। মুন্‌সী জগমোহন লাল স্বামিজীর প্রিয় দু'একটি ভজন গাহিতে বলিলেন। খাঁ সাহেবের কণ্ঠস্বর আসিল না, মুখে কথাও ফুটিল না; বরং অধিকতর বিষণ্ণ হইয়া নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিলেন এবং দুই চক্ষু জলে ভিজিয়া গেল। খাঁ সাহেব স্থির হইয়া যাইলে মুন্‌সী সাহেবও এই সময় বড় ব্যথিত হইলেন এবং আক্ষেপ করিয়া কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে মুন্‌সী জগমোহন লাল ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিলেন, "স্বামিজী চাঁদ বারদের (চাঁদ কবির) কবিতা শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন; তাহার মধ্যে এইটি অন্যতম,—এই বলিয়া চাঁদ কবির একটা বর্ণনা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে বৃদ্ধ জরাগ্রস্থ মুন্‌সী জগমোহন লাল যুবা তেজস্বী হইয়া উঠিলেন, কণ্ঠস্বর ক্রমে গম্ভীর হইয়া উঠিল এবং মুখের ভাবভঙ্গী বীর

খাঁ সাহেব ও বর্ত্তমান লেখক।

পুরুষের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। আবৃত্তি সমাপ্ত করিয়া তিনি বর্ত্তমান লেখককে অর্থ বুঝাইয়া দিলেন,—যোদ্ধাগণ অশ্বারোহণে পর্ব্বত শৃঙ্গে এক গড় অধিকার করিতে উঠিতেছে এবং বিপক্ষগণ প্রতিরোধ করিতেছে, বর্ষা ও তলওয়ারের ঝন্ ঝনা শব্দ, অশ্বপদ বিক্ষেপের খট্‌খটা শব্দ এইরূপ সুন্দরভাবে ও ছন্দে বর্ণিত যে যেন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। তৎপরে মুন্‌সী জগমোহন লাল বলিলেন, "স্বামিজী খেতড়িতে অবস্থানকালে ঐরূপ কোন না কোন উচ্চ চর্চ্চা লইয়া মাতোয়ারা হইয়া থাকিতেন।" তিনি পুনরায় বলিলেন, "ইহা হইতে সামান্য একটু মাত্র আভাষ পাওয়া যায় যে স্বামিজী খেতড়িতে কি ভাবে ছিলেন।"

মুন্‌সী জগমোহন লাল আরও বলিলেন যে, "স্বামিজী জাপান ও আমেরিকা হইতে রাজা সাহেবকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন সে সব পত্রগুলি রাজবাড়ীতে বিশেষ-ভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু রাজা সাহেব ও রাণী সাহেবা মরিয়া যাওয়ায় রাজ্য এখন অপরের হস্তগত হইয়াছে, যদি কখন সুবিধা হয় তাহা হইলে পত্রগুলি ও স্বামিজীর ব্যবহৃত দ্রব্যগুলি বাহির করিতে চেষ্টা করিব।"

মুনসী জগমোহন লাল।

নরেন্দ্রনাথ যদিও পূর্ব্ব পরিচিত ব্যক্তির কাছে নরেন্দ্র-নাথ নামে অভিহিত হইতেন ও সেই ভাবেই নাম লিখিতেন, কিন্তু খেতড়ী অবস্থানকাল হইতে তাঁহাকে আলাপী ও ভক্ত-মণ্ডলীরা স্বামিজী বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন।

রাজা অজিত সিংয়ের দুটি মাত্র কন্যা হইয়াছিল কোন পুত্র হয় নাই। স্বয়ং পোষ্যপুত্র এবং তাঁহার পিতা ফতেচাঁদ সিংও পোষ্যপুত্র ছিলেন। এইজন্য রাজা সাহেব বড়ই বিষণ্ণ হইয়া এক সময় স্বামিজীকে "তাঁহার একটি সন্তান হউক" এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিতে অনুরোধ করিলেন। স্বামিজীর আশীর্ব্বাদে রাজা অজিত সিংয়ের একটি পুত্র সন্তান জন্মে। এই কারনবশতঃ রাজা সাহেব ও রাণী সাহেবা স্বামিজীর একান্ত অনুগত ভক্ত হইয়া উঠেন। ইংরাজীতে "খেতড়ি রাজবংশের ইতিহাস" বেলুড় মঠের পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। কথাপ্রসঙ্গে রাজা সাহেব জানিতে পারিলেন যে স্বামিজীর মাতা ও আত্মীয়েরা আছেন। তাঁহাদের সমস্ত বিষয় জানিবার জন্য রাজা সাহেব উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। শরৎ মহারাজ, যোগেন মহারাজ ও সান্ন্যাল মহাশয়কে রাজা সাহেব স্বামিজীর বাড়ীর খবর পাঠাইতে একখানি পত্র লিখেন; এবং তাহাতে এ কথা কাহাকেও প্রকাশ করিতে নিষেধ ছিল। তদবধি রাজা সাহেব স্বামিজীর মাতাকে প্রণামীস্বরূপ মাসিক ১০০৲ টাকা জগমোহন লালের মারফৎ পাঠাইয়া দিতেন। রাজা সাহেব যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন তিনি টাকা সমান ভাবে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। রাজা সাহেবের পুত্রের উৎসব উপলক্ষেও রাজা সাহেব প্রণামীস্বরূপ স্বামিজীর মাতাকে ১০০৲ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। লণ্ডন অবস্থান কালে স্বামিজী কথা প্রসঙ্গে একবার বলিয়াছিলেন,

রাজা অজিত সিংকে স্বামিজীর আশীর্ব্বাদ করা।

"রাখালকে তখন বল্লুম যে খেতড়ির রাজা মঠে মাসিক ১০০৲ টাকা দিতে রাজি হয়েছেন নে, না রাখাল তখন ঘোর বৈরাগ্য দেখাতে লাগ্‌লো, নিলে না—কষ্টে মর্‌তে লাগ্‌লো। তাই ত আমি রাখালের উপর চটে গেলুম।"

রাজা সাহেব নরেন্দ্রনাথের প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে প্রতি মাসে তিনি দুইখানি করিয়া পত্র স্বহস্তে বর্ত্তমান লেখককে লিখিতেন। রাজা বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বলিয়া কোন ভাব থাকিত না; কেবল তিনি যে স্বামিজীর অনুগত ভক্ত সেই ভাবটি পত্রে প্রকাশ পাইত। মুন্‌সী জগমোহন লালও নিজে আত্মীয়বোধে সর্ব্বদাই পত্র লিখিতেন এবং প্রত্যেকের নাম করিয়া খবর লইতেন।

রাজা সাহেবের বর্ত্তমান লেখককে স্বহস্তে পত্র লেখা।

গঙ্গাধর মহারাজ কিছুদিন খেতড়ির রাজার কাছে বাস করিয়াছিলেন এবং বালকের ন্যায় সরল স্বভাব ও হাস্য কৌতুকে বিশেষ নিপুণ থাকিবার জন্য অল্পদিনের মধ্যে সকলের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিলেন। সকলেই বেশ মন খোলসা করিয়া গঙ্গাধর মহারাজের সহিত সরল ভাবে মিশিতেন।

একদিন রাজা সাহেব মন্ত্রীগণ লইয়া কোন এক বিষয় পরামর্শ করিতেছেন এমন সময় এক পাঞ্জাবী সাধু আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা সাহেবের অনুমতি না পাইলে কাহার সম্মুখে আসিবার ক্ষমতা ছিল না কিন্তু সাধু বিবেচনা করায় কেহ প্রতিরোধ করে নাই। সাধুটি রাজা সাহেবের কাছে বসিয়া একেবারে তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করিয়া কথা কহিতে

লাগিল। সাধুর ব্যবহার দেখিয়া অস্ত্রধারি প্রহরীরা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং সাধুকে নিবারণ করিবার জন্য সক্রোধে কথা কহিতে লাগিল।

রাজা সাহেব ও জনৈক পাঞ্জাবী সাধু।

রাজা সাহেব তেজস্বী রাজপুত হইলেও স্বামিজীর কাছে দীক্ষা লইবার পর হইতে এরূপ নম্র হইয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি ভিতরকার ক্রোধ সম্বরণ করিয়া পাঞ্জাবী সাধুটির সহিত কথা কহিতে লাগিলেন এবং ক্রুদ্ধ প্রহরীদিগকে ক্রোধ সম্বরণ করিতে অনুনয় করিলেন। রাজা সাহেব সাধুটিকে ভোজন করিবার জন্য অনুনয় করায় ক্রোধান্বিত সাধুটি বলিল, 'আমি পরিশ্রম না করিয়া কাহার প্রদত্ত আহার ভোজন করি না।' তখন এক বিষম সমস্যা উঠিল যে সাধুটি অভুক্ত থাকিতে তাহাকে কি কাষ দেওয়া যাইতে পারে এবং সেই বিষয় লইয়া সকলে ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে সাধুটি চাক্কি বা জাঁতা চাহিল। ভৃত্যেরা অল্প পরিমাণে গম আনিয়া দিলে সাধুটি বলিল, 'এক পোয়া গম ভাঙ্গিয়া একজন লোকের আহার উপার্জ্জনের মত পরিশ্রম হয় না।' অবশেষে ভৃত্যেরা বিরক্ত হইয়া বেশী পরিমাণে গম আনিয়া দিল। সাধুটি তখন গম ভাঙ্গিয়া পরিতুষ্ট হইয়া ভোজন করিল। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া রাজা সাহেব কেবলমাত্র বলিয়াছিলেন, "পাঞ্জাবী গৃহী ভাল পাঞ্জাবী সাধু ভাল নয়।"

স্বামিজী খেতড়ি হইতে বহির্গত হইয়া রাজপুতানার কয়েকটি স্থানে রমতা সাধুর ন্যায় ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

সেই সকল ভ্রমণের বিষয় কেহই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানে না কারণ তাঁহার মনের ভাব তখন অতি বিষণ্ণ ও বৈরাগ্যপূর্ণ ছিল। কোন প্রকার সম্পর্ক তিনি কাহার সহিত রাখিতেন না। তাঁহার খবর একেবারে গুজরাটে কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছিল। গঙ্গাধর মহারাজ সন্ধান করিয়া খেতড়িতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজা সাহেব ও তাঁহার বাড়ীর লোকেরা গঙ্গাধর মহারাজকে বিশেষ সম্মান করিয়া তাঁহাদের নিকট রাখিলেন। রাজপুতানায় গোল বা গোলাম বলিয়া এক শ্রেণীর লোক আছে তাহারা রাজ পরিবারে প্রতিপালিত হয়। তিনি সহৃদয় ভাবে সেই গরীবদিগের উপকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। গঙ্গাধর মহারাজ তাহাদের জন্য একটি স্কুল স্থাপনা ও তাহাদের মুক্ত করিবার চেষ্টা করায় রাজকর্ম্মচারিরা একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন। লণ্ডনে অবস্থানকালে একবার স্বামিজী বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, "গঙ্গা সন্ন্যাসী, তারা রাজা, তাদের রাজকর্ম্মের politicsএ হাত দিতে গেছ্‌লো কেন? এই জন্যই ত রাজা অজিত সিং একটু বিরক্ত হয়ে ছিল।"

অখণ্ডানন্দ স্বামীর রাজপুতানায় গমন।

এই সময় গঙ্গাধর মহারাজ উদয়পুর প্রভৃতি অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন। গঙ্গাধর মহারাজের নির্ভীক সমালোচনা ও লোকের মুখের উপর উচিৎ কথা বলায় উদয়পুরে তাঁহার একটু গোলমাল হইয়াছিল। রাজ সরকার থেকে সাধুদের বেশ বন্দোবস্ত আছে কিন্তু গরীব প্রজাদের অত্যন্ত কষ্ট দেখিয়া তিনি নির্ভীকভাবে দু' একটি তীব্র কথা

বলিয়াছিলেন। সেই কথা শুনিয়া রাজ কর্ম্মচারিরা একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল।

স্বামিজীর জীবনের সহিত অনেকেরই উপাখ্যান সংমিশ্রিত আছে সেইজন্য সময় সময় তাহাদেরও কথা কিছু কিছু বলিতে হয়। একবার একটি বাঙ্গালী যুবক রাজপুতানায় যায় এবং গঙ্গাধর মহারাজের নিকট আশ্রয় লয়। গঙ্গাধর মহারাজ তাহাকে চাকুরি করিয়া দিবার আশা দিয়াছিলেন। অবশেষে গঙ্গাধর মহারাজ একটি ছোট রাজার নিকট বাঙ্গালী যুবকটীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। ছোট রাজা ত্যাগী গঙ্গাধর মহারাজকে দেখিয়া অতি সম্মান করিয়া গাত্রোত্থান করিয়া আপন স্থানে বসাইলেন। কিন্তু কর্ম্মপ্রার্থী বাঙ্গালী যুবকটী কোন বিবেচনা না করিয়া রাজ আসনের এক পার্শ্বে বসিলে রাজা ও অপর সকলে বিরক্ত হইয়া তাহাকে তৎস্থান হইতে দূরে বসাইয়া দিল। যুবকটী অবিবেচক, সে জানিত না যে সাধু ও কর্ম্মপ্রার্থীতে কত প্রভেদ!

অখণ্ডানন্দ স্বামী ও জনৈক কর্ম্মপ্রার্থী বাঙ্গালী যুবক।

স্বামিজী রাজপুতানা পরিদর্শন করিয়া গুজরাটের দিকে চলিয়া যান এবং তথা হইতে পুনা, বেলগাঁও হইয়া মাদ্রাজের দিকে যান। এদিকে রাজা অজিত সিংয়ের একটী পুত্র সন্তান হইল এবং সন্তানটীর নামকরণ বা শুভকার্য্যের জন্য রাজা সাহেব স্বামিজীর বিশেষ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে রাজা সাহেব মুন্সী জগমোহন লালকে স্বামিজীর অনুসন্ধানে প্রেরণ করেন। মুন্সীজী অনেক অনুসন্ধানের

পর জানিতে পারিলেন যে স্বামিজী মাদ্রাজে অবস্থান করিতেছেন। মুন্‌সীজী মাদ্রাজে গিয়া স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং খেতড়ি রাজ্যে পুনরায় তাঁহাকে একবার যাইবার জন্য অনেক অনুনয় করিতে লাগিলেন। স্বামিজী মুন্‌সীজীর সহিত খেতড়িতে পুনরায় ফিরিয়া আসেন বা আশীর্ব্বাদ করিয়া পাঠান বর্ত্তমান লেখকের তাহা মনে নাই। কারণ মুন্‌সী জগমোহন লালের সহিত বর্ত্তমান লেখকের স্বামিজীর সম্বন্ধে বহু কথাবার্ত্তা হইত। স্বামিজীর কথা বলিতে বলিতে মুন্‌সীজী এত উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন এবং আপন ভাবেতে বিভোর হইয়া যাইতেন যে, এই সমস্ত ছোট কথা তখন আর বড় মনে থাকিত না। স্বামিজী খেতড়িতে পুনরায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন কি আশীর্ব্বাদ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে মুন্‌সীজী কি বলিয়াছিলেন বর্ত্তমান লেখকের তাহা এক্ষণে স্মরণ নাই। যাহা হউক রাজকুমারের নামকরণ বা রাজবংশের প্রথা অনুযায়ী কোন শুভ কর্ম্ম হইয়াছিল।

রাজা সাহেবের প্রথমা কন্যার বিবাহ।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে রাজা সাহেবের প্রথমা কন্যার সহিত শাপুরের রাজার বিবাহ হয়। সেই বিবাহ উপলক্ষ্যে রাজা সাহেব খুব ধূমধাম করিয়াছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথের আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়াছিলেন। যোগেন মহারাজ, শরৎ মহারাজ ও সান্ন্যাল মহাশয় ইঁহারা তিনজনে পরামর্শ করিয়া বাঙ্গালা দেশের উপযোগী ঢাকাই সাড়ী, ধান, দুর্ব্বা ও সিঁদুর আশীর্ব্বাদ যৌতুকস্বরূপ তথায় পাঠাইয়া দিয়া-

ছিলেন। কারণ ইহা বাঙ্গালা দেশের প্রথা, রাজপুতানার প্রথা নয়। মুন্‌সী জগমোহন লাল একবার বর্ত্তমান লেখককে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় বর্ত্তমান লেখক মুন্‌সীজীকে বুঝাইয়া দেন যে, ধান অর্থে লক্ষী বা অন্ন, দুর্ব্বা অর্থে পৃথিবী বা ভূমী ও সিঁদুর সধবার চিহ্ন সেইজন্য বাঙ্গালা দেশে এই সব জিনিষ দিয়া নব-বধূকে আশীর্ব্বাদ করে। মুন্‌সী জগমোহন লাল ইহা শুনিয়া বিশেষ প্রীত হইয়া ছিলেন।

মাদ্রাজে স্বামিজী ও মুন্‌সী জগমোহন লাল।

স্বামিজী আমেরিকা যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন এই খবর শুনিয়া রাজা সাহেব মুন্‌সী জগমোহন লালের সঙ্গে টাকা দিয়া তাঁহাকে স্বামিজীর নিকট মাদ্রাজে পাঠাইয়া দেন। মুন্‌সী জগমোহন লাল স্বামিজীর সহিত বোম্বায়ে আসিয়া তাঁহাকে জাহাজে তুলিয়া দেন। মুন্‌সী জগমোহন লাল টাকা স্বামিজীর সঙ্গে দেন বা পরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান লেখকের জানা নাই। রাজা সাহেব বর্ত্তমান লেখককে স্বামিজীর চিকাগো যাত্রার বিষয় জানাইলেন এবং স্বামিজীর আসল চিঠিগুলি নিজের নিকট রাখিয়া দিয়া জাপান (কোবি) হইতে পত্রগুলির নকল করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। সেই পত্রগুলি শরৎ মহারাজ প্রভৃতিরা পড়িয়া বিশেষ আনন্দ করিতে লাগিলেন।

চিকাগো বক্তৃতার পর স্বামিজীর যশোরাশি যখন সমস্ত ভারতব্যাপী পরিব্যাপ্ত হইল তখন রাজা সাহেব দরবার করিয়া এক অভিনন্দন পত্র স্বামিজীর নিকট প্রেরণ করেন

এবং স্বামিজীও চিকাগো হইতে রাজা সাহেবকে সেইভাবে অভিনন্দন পত্রের সুবিখ্যাত প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন। রাজা সাহেবের ক্রমশঃ স্বামিজীর উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলি দর্শন করিবার জন্য রাজা সাহেব লণ্ডনে গিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কাশ্মীর দর্শন করিতে যান। কিন্তু জয়পুরের মহারাজার সহিত রাজা সাহেবের বিতণ্ডা হওয়ায় রাজা সাহেব বড়ই বিষণ্ণ হইয়া পড়েন। রাজা সাহেব আগ্রায় আকবর বাদসার সমাধি সিকান্দ্রা দর্শন করিবার জন্য তথায় যান, সঙ্গে শাপুরের জামাতা ও মুন্‌সী জগমোহন লাল ছিলেন। রাজা সাহেব যেন একটু পরে যাইবেন এইরূপ ভাণ করিয়া সকলকে সরাইয়া দিয়া একেবারে তিনি উপরকার মিনারে উঠিয়া তোড়নের দিকে বাহিরে লম্ফ প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। এইরূপে স্বামিজীর এক বিশেষ ভক্ত রাজা-শিষ্য স্বর্গলোকে গমন করেন। রাজা সাহেবের পুত্র ১১ বৎসর প্রাপ্ত হইলে তাহারও হঠাৎ দেহত্যাগ হয়। খেতড়ি রাজ্যের উত্তরাধিকারী না থাকায় রাজ্য অপর বংশে চলিয়া যায়। কারণ রাজপুতানায় দৌহিত্র রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয় না। সেই সব কারণের জন্য স্বামিজীর পত্রাদি এবং অন্যান্য দ্রব্যাদিও রাজগৃহে রহিয়া গেল; বোধ হয় তাহা আর পাইবার কোন আশা নাই।

রাজা সাহেবের দেহত্যাগ।

মুন্‌সী জগমোহন লাল এই বিপদেতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া

যান। তিনি গরীবভাবে কলিকাতায় এক মাড়োয়ারির আশ্রয়ে কয়েক বৎসর বাস করেন। তাঁহার উন্নতির সময় যে সমস্ত মাড়োয়ারি সম্মুখে যাইতে সাহস করিত না তাহারা তখন তাঁহাকে আশ্রিত বলিয়া আদেশ করিতে লাগিল। একদিন বর্ত্তমান লেখক সেই মাড়োয়ারির বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন, তখন আদেশ বাক্য শুনিয়া মুন্সী জগমোহন লালের চক্ষে জল আসিল এবং নিজের অদৃষ্টের প্রতি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামিজীর কথা শুনিলে তিনি তাঁহার সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া গিয়া আবার পূর্ব্বেকার মত মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেন। কয়েক বৎসর পর তিনি আলোয়ার মহারাজের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারি হইয়াছিলেন এবং "রাজরতন" বা "রাজরত্ন" উপাধি পাইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি আলোয়ারেই বাস করিতে লাগিলেন।

কলিকাতায় মুন্সী জগমোহন লাল।

একবার তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং "বিবেকানন্দ সমিতির" বাৎসরিক অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া স্বামিজীর বিষয় অতি প্রগল্ভ ভাষায় এমন বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে তাহাতে শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। আলোয়ারে অবস্থানকালে জীবনের শেষ সময় তিনি স্বামিজীর প্রসঙ্গ লইয়া একেবারে মাতিয়া থাকিতেন। সম্ভবতঃ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। স্বামিজীর তিনি একজন পরম ভক্ত ছিলেন সেইজন্য তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইল।

যদিও খেতড়ির রাজা অজিত সিংয়ের সহিত স্বামিজীর

সাক্ষাৎ ও সৌহার্দ্দ হইয়াছিল কিন্তু তাহার পূর্ব্বাপর যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহাতে বেশ বোঝা যায় যে স্বামিজীর মনোভাব এই সময় বড়ই বিষণ্ণ ছিল। গুপ্ত মহারাজ একটি উপাখ্যান বলিয়াছিলেন কিন্তু কোন্ স্থানে হইয়াছিল তাহা ঠিক স্মরণ নাই। স্বামিজী একবার রমতা সাধুর ন্যায় এক ছোট রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হন। অনেক লোক আসিয়া স্বামিজীর সহিত কথা কহিতে লাগিল। সারাদিনই লোক আসিতেছে, সারাদিনই লোক কথা কহিয়া চলিয়া যাইতেছে। দুপুর গেল, বৈকাল গেল, সন্ধ্যা গেল তবুও লোকের ভিড় কমিল না এবং খাবার কথাও কেহ একবার জিজ্ঞাসা করিল না বা কেহ কিছু দিলেও না। এইরূপে দুই এক দিন গেল। স্বামিজী তখন এক-রকম অজগরবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন অর্থাৎ স্বেচ্ছায় কেহ আহার না দিলে তিনি চাহিয়া খাইবেন না। একটি ভাঙ্গি বা মেথর রাস্তা ঝাঁড় দিত আর সমস্ত ব্যাপার সে দেখিত। যদিও জাতিতে সে ভাঙ্গর কিন্তু তাহার ভিতর দয়ার ভাব ছিল। সে দেখিল যে একটা সাধুর কাছে দলে দলে লোক আসে, যায়, কিন্তু সাধুটা খেলে কি না খেলে সে বিষয় ত কেউ একবারও জিজ্ঞাসা করে না। দুই এক দিন এইরূপে যাইল অথচ কাহাকেও কিছু আহার্য্য আনিতে না দেখিয়া একটু অবসর পাইয়া ভাঙ্গি স্বামিজীকে বলিল, "এইত এত লোকজন আস্ছে যাচ্ছে কিন্তু আপনি কিছু খেয়েচেন কি ?"

স্বামিজী ও জনৈক ভাঙ্গি।

স্বামিজী সেই ভাঙ্গিকে স্পষ্ট বলিলেন যে, 'কয় দিন তিনি প্রায় অনাহারে রহেছেন।' সেই কথা শুনিয়া ভাঙ্গি তখন চঞ্চল ও ব্যথিত হইয়া স্বামিজীকে বলিল, "আমি জাতে ভাঙ্গি তা না হলে আপনাকে রুটী আনিয়া দিতাম।" স্বামিজী তাহার দয়ার ভাব শুনিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তুমি আটা নিয়ে এস, রুটী করে নেওয়া যাবে।' ভাঙ্গি তদ্রূপ করিলে স্বামিজী তাহার প্রদত্ত রুটী খাইয়াছিলেন। এই কথা তত্রস্থ রাজার কাছে যাইলে রাজা ভাঙ্গিকে দণ্ড দিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু সেই সময় স্বামিজী তথায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে তীব্রভাবে ভৎর্সনাসূচক কথা মিষ্ট ভাষায় বলিতে লাগিলেন। রাজা সেই সকল কথা শুনিয়া অপ্রতিভ হইয়া স্বামিজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। গুপ্ত মহারাজ এই উপাখ্যানটি বলিবার সময় বলিতেন যে, "জামা-জোড়া পরা লোকের চেয়ে মেথর ভাঙ্গির ভিতর প্রাণ আছে।"

স্বামিজীর রাজপুতানা ভ্রমণ।

রাজপুতানায় ভ্রমণ করিতে করিতে কোন সময় স্বামিজী একস্থানে গিয়া পৌঁছান। তথায় কোন আশ্রয় বা আহারের বন্দোবস্ত না পাইয়া অগত্যা তিনি এক ইঁদারার অনতিদূরে একটী গাছের তলায় গিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা যখন বেশী পাইত তখন কেহ ইঁদারা হইতে জল তুলিলে তাহার নিকট হইতে অল্পমাত্র জল লইয়া খাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। তথায় আহারের কোন বন্দোবস্ত না থাকায় দুই তিন দিন এই ভাবে জল

খাইয়া কাটাইবার পর তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান। সেই খবর তত্রস্থ রাজার নিকট যাইলে রাজা স্বামিজীকে বিশেষ যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজপুতানায় অনেক ছোট ছোট রাজা বা জমীদার আছেন এবং এই ঘটনাটি কোথায় হইয়াছিল তাহা দীন মহারাজ বিশেষ করিয়া বলেন নাই।

এই সময় স্বামিজীর মনের ভাব বড়ই বিষাদপূর্ণ ছিল। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াই বা কি হইল! কেবলমাত্র পথে ঘুরে ঘুরে বেড়ান এই না! কিছুই ত পাইলাম না, দেহরক্ষা বিড়ম্বনা মাত্র। বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে যে উরুবিল্ব বা বুদ্ধগয়ায় শিলাখণ্ডে বসিবার পূর্ব্বে বুদ্ধদেবেরও মন এইরূপ ভীষণ বিষাদপূর্ণ হইয়াছিল। গৃধ্রকূট পর্ব্বত হইতে যখন তিনি উন্মত্তের ন্যায় উরুবিল্ব গ্রামের দিকে প্রস্থান করিয়াছিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "ক্ষুৎ পিপাসা প্রথমশ্চৈব কামশ্চ দ্বিতীয় স্তথা, সংশয় তৃতীয়শ্চৈব অহংকার চতুর্থ চ।" বুদ্ধদেবের বিষাদভাবের সহিত স্বামিজীর এই সময়কার জীবনের বিষাদভাবের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। স্বামিজী এই সময় যে দু' একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাও এইরূপ বিষাদ ও গভীর খেদোক্তি পূর্ণ ছিল। সেই সময় আলমরাজার মঠে শরৎ মহারাজ প্রভৃতিদেরও এইরূপ বিষাদভাব আসয়াছিল, কি হইল! শুধু ভিক্ষা করে খাওয়া! জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল, কিছুই পাওয়া গেল না ইত্যাদি। স্বামিজীর বিষাদভাব।

স্বামিজীর Sturdyকে পরিব্রাজক অবস্থার গল্প বলা।

লণ্ডন অবস্থানকালে একদিন কথা প্রসঙ্গে স্বামিজী তাঁহার পরিব্রাজক অবস্থার কথা E. T. Sturdyকে বলিতে লাগিলেন, "এই সময় তাঁহার মনের ভাব অতি কষ্ট দায়ক হইয়াছিল। জীবন্ত মৃত্যু কাহাকে বলে তাহা তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে অনুভব করিয়াছিলেন। নিজের অনাহার, মাথা গোঁজ্‌বার স্থান নাই, পথে পথে ভিক্ষা করে পাগলের ন্যায় ঘুরে বেড়াতেন। কোন জিনিষ তাঁহার সম্মুখে উদ্ভাষিত হয় নাই এবং তপ জপ করিয়াও কিছু ফল পাইতেছিলেন না। কতকগুলি ছেলেকে বাড়ী থেকে বার ক'রে এনে পথের ভিক্ষারি ক'রেছেন, তারা খেতে পাচ্ছে কি না পাচ্ছে বা তারা কি কচ্ছে সেই এক ভাবনা। পেছনে পুলিশের তাড়া। আবার গ্রামে গ্রামে ঘুড়ে দেখ্‌চেন অন্নাভাবে সকলে হাহাকার কচ্ছে। কি দুঃখ কষ্টেই না তাহারা দিন কাটাচ্ছে। নিজে ভগবান পেলুম না তার উপর লোকেরও কিছু কর্ত্তে পাল্লুম না" ইত্যাদি নানা কথা তিনি বলিতে লাগিলেন। F. T. Sturdyকে পূর্ব্বাবস্থার কথা বলিতে বলিতে তিনি আবার রম্‌তা সাধু হয়ে গেলেন। পরিব্রাজক অবস্থার সেই সকল ভাব ও ছবি যেন তাঁহার চক্ষের সম্মুখে আসিতে লাগিল। তাঁহার তেজঃপূর্ণ গম্ভীর মুখ পরিবর্ত্তিত হইয়া বিষাদপূর্ণ মুখ হইয়া গেল এবং চক্ষের কোনে জল আসিয়া দাঁড়াইল। সিংহকে শিকলে বাঁধিয়া বনের মাঝে একটা গাছে আঁটকাইয়া রাখিলে তাহার যেমন মনের ভাব ও শিকল ছিঁড়িবার চেষ্টা

হইয়া থাকে স্বামিজীরও এই সময় মনের ভাব তদ্রূপ হইয়াছিল। এই সময় অর্থাৎ দুই বা আড়াই বৎসর তাঁহার মনের ভাব অতি কষ্টদায়ক হইয়াছিল।

রাজপুতানায় অনেক স্থান রম্‌তা সাধুর ন্যায় ভ্রমণ করিয়া স্বামিজী কটিয়াওয়াড়ের দিকে চলিলেন। কোন্ কোন্ স্থানে কিরূপ ভাবে গিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান লেখকের বিশেষ জানা নাই তবে তিনি জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারিদাসের বাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন। হরিদাস বিহারিদাসের নড়িয়ার গ্রামে বা নগড়ে স্বামিজী ঘুড়িতে ঘুড়িতে যান এবং অল্পদিন থাকিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় হরিদাস বিহারিদাস থাকিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। সাধু থাকিবে দুবেলা দুমুঠো ভাত খাবে এইরূপ ভাবে প্রথমে অনুমতি দিয়াছিলেন—বিশেষ আলাপ পরিচয় বা শ্রদ্ধা ভক্তি কিছুই দেখান নাই। গুজরাট বা সিন্ধুদেশের আহারাদি বাঙ্গালীর পক্ষে বড়ই কষ্টদায়ক, ডালকে সিদ্ধ ক'রে শীলে বেটে হাঁড়ির জলে মিশিয়ে দেয় ও একটু মসলা ও ঘি দিয়া পাতলা জলের মত ডাল খায়। তরকারি নাম মাত্র। ভাত আর একটু ঘি।

স্বামিজীর জুনাগড়ে গমন।

লণ্ডন অবস্থানকালে জনৈক কাটিয়াওয়াড়ের যুবকের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "সন্ধান করিয়া ঠিক করিলাম কোন্ ব্যক্তি হরিদাস বিহারিদাসের রন্ধন করে, তাহার সহিত ভাব করিয়া তাহাকে মাঝে মাঝে গান শুনাইতাম আর তার কাছে এই যাচ্ঞা করিলাম যে সে

যেন ডালের দানাগুলি একটু আলাদা ক'রে ভাতের সঙ্গে দেয়। তাহলে নূন লঙ্কা দিয়া ডালের বিচিগুলি টাক্‌না দিয়া দু' গরোস্ ভাত খাওয়া যাবে। এই ভাবে ত হরিদাস বিহারিদাসের বাড়ীতে ভাত খাওয়া যেত।" পরবর্ত্তী সময় কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি একবার স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'স্বামিজী আপনি এত লঙ্কা খান কেন?' স্বামিজী গম্ভীর মুখ করিয়া শ্লেষপূর্ণভাবে তাহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, "মশাই, চির জাবনটা পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি আর বুড় আঙ্গুলের টাক্‌না দিয়ে ভাত খেয়েছি। লঙ্কাই ত তখন একমাত্র সম্বল ছিল, ঐ লঙ্কাই ত আমার পুরাণ বন্ধু ও মিত্র। আজকাল নয় দু'চারটে জিনিষ খেতে পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু চিরকালটা ত উপোষ ক'রে মরেছি।"

স্বামিজী ও হরিদাস বিহারিদাস।

হরিদাস বিহারিদাসের ধারনা ছিল যে স্বামিজী এক জন রমতা সাধু পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, কোন যায়গায় আশ্রয় না পাইয়া তাহার বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছে। বড় মানুষের বাড়ী, দুটি খায় দায় তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। হরিদাস বিহারিদাস বোম্বাই সরকার হইতে জুনাগড়ের নবাবের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হরিদাস বিহারিদাস নড়িয়ার গ্রামের একজন ধনাঢ্যবংশীয়। এক সময় হরিদাস বিহারিদাস অতি বিষণ্ণভাবে কয়েক দিন রহিলেন, কাহারও সাথে বিশেষ বাক্যালাপ করিতেন না। স্বামিজী তাঁহার বিমর্ষ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আপনি সাধু, আপনার এ সকল কথা



পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ।

শুনিয়া কি ফল হইবে ? রাজ সরকারের যাহারা চাকরি করে তাহাদের সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হয়।” কিন্তু স্বামিজী আগ্রহ প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন যে, “বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট জুনাগড় দরবারকে এক পত্র লিখিয়াছেন, সেই পত্রের কি উত্তর হইতে পারে সেই বিষয় লইয়া তিনি ভাবিতেছেন কারণ তিনি নবাবের কর্ম্মচারী আবার এদিকে বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট হইতে তিনি নিযুক্ত হইয়াছেন। উভয়-কূল যাহাতে রক্ষা হয় এরূপ কোন উপায় স্থির করিতে পারিতেছেন না সেইজন্য এত বিমর্ষ।”

স্বামিজী হরিদাস বিহারিদাসের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া কোন কথা না বলিয়া সম্মুখ হইতে একখানি কাগজ তুলিয়া লইলেন এবং আপন মনে ইংরাজীতে কি লিখিতে লাগিলেন। লেখা শেষ হইলে তিনি হরিদাস বিহারিদাসকে বলিলেন, “আচ্ছা এটা কেমন হয় দেখুন দেখি?” হরিদাস বিহারিদাস পত্রখানি পড়িয়া অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “ঠিক এই চিঠিইত চাচ্ছিলাম, এই চিঠিতেই কাজ হবে” এই বলিয়া সেই চিঠির আর কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া অবিকল নকল করিয়া এবং নাম স্বাক্ষর করিয়া বোম্বাই সরকারকে পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাতেই তাঁহার কার্য্য সফল হইয়াছিল। হরিদাস বিহারিদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্বামিজী আপনি কি ইংরাজী জানেন্? এযে দেখ্‌ছি খুব পাকা হাতের লেখা এবং রাজনীতি বিশেষ ভাবে না জানিলে এরূপ ভাবে কেহ চিঠি লিখিতে পারে

স্বামিজী হরিদাস বিহারীদাসকে পত্র লিখে দেওয়া।

না।" হরিদাস বিহারিদাসের তদবধি স্বামিজীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি হইতে লাগিল এবং গুরুর মত শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতে স্বামিজীর সহিত হরিদাস বিহারিদাস মন খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন এবং নানা বিষয় প্রশ্ন করিতেন, এমন কি রাজনীতি এবং রাজ্য কিরূপে চালাইতে হয় সে বিষয়েও তিনি প্রশ্ন করিতেন। হরিদাস বিহারিদাসের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং অন্যান্য আত্মীয়রাও স্বামিজীর বিশেষ অনুগত হইয়াছিলেন। গুজরাট কাটিয়াওয়াড় বৈষ্ণব প্রধান দেশ; তথায় মাছ মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। সাধুর পক্ষে ত একেবারেই উচিত নয় সেইজন্য স্বামিজীর এই স্থানে মাছ, মাংস ও তামাকের একটু কষ্ট হইয়াছিল।

স্বামিজীর বোম্বায়ে গমন।

নড়িয়ারে কিছুদিন থাকিয়া গুজরাট কাটিয়াওয়ার ও অন্যান্য কয়েকটি স্থান দর্শন করিয়া স্বামিজী বোম্বায়ের দিকে চলিয়া যান। এই সময় তিনি কাহার সহিত পত্রাদি লিখিতেন না এবং পরিচিত কাহার সহিত সাক্ষাৎও করিতেন না। মহা বৈরাগ্য ও উন্মনা ভাব। সারদা মহারাজ ও গঙ্গাধর মহারাজের সহিত তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন সময় দেখা হইয়াছিল। জীবনের সমস্ত শক্তি একটা কেন্দ্রে আনিয়াছেন—বিজয়ী হইবেন, নয় দেহত্যাগ করিবেন। এইজন্য তাঁহার এই সময়কার খবর বিশেষ কিছু সংগ্রহ করা যায় নাই, অল্পমাত্র নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

১৮৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দে হরিদাস বিহারিদাস Opium Commissionএর সদস্য হইয়া কলিকাতায় আসেন এবং বড়বাজারের একটি বাড়ীতে থাকিতেন। বর্ত্তমান লেখক ও সান্ন্যাল মহাশয় তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন এবং নিতান্ত আপনার লোকের মত তিনি মেলা-মেশা করিতেন। আলমবাজারের মঠে তিনি এক দিন ভাণ্ডারা দিয়াছিলেন এবং স্বামিজীর বিষয় অনেক কথা বলিয়াছিলেন, তবে সকল কথা এক্ষণে স্মরণ নাই। আমেরিকায় স্বামিজীর সহিত তাঁহার পত্রাদি লেখা চলিত। আমেরিকায় তখন স্বামিজী খুব বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছেন সেই সকল বিষয়েই লোকের মন ধাবিত হইয়াছে, পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি কোথায় কি করিয়াছিলেন সে সকল কথা বা বিষয় অতি সামান্য বলিয়া তখন বোধ হইত। সান্ন্যাল মহাশয়ের সহিত তাঁহার বেশ হৃদ্যতা হইয়াছিল। তিনি বিদ্রূপ করিয়া সান্ন্যাল মহাশয়কে বলিতেন, "বৈকণ্ঠ সান্নেল কেন? কথাটা হচ্ছে বৈকুণ্ঠ সান্ন্যাল।"

হরিদাস বিহারিদাসের কলিকাতায় আগমন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে হরিদাস বিহারিদাসের পরলোক গমন হয় এবং তদবধি তৎ পরিবারের আর বিশেষ কোন খবর পাওয়া যায় নাই।

গুজরাট ও অন্যান্য স্থান হইয়া স্বামিজী পুনায় গিয়াছিলেন। কিরূপ ভাবে পুনায় গিয়াছিলেন এবং তথায় কি কি করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ কিছু জানা নাই; তবে পুনাতে যে তিনি খুব সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন সে বিষয় পরে

স্বামিজীর পুনায় গমন ও সংস্কৃত অধ্যয়ন করা।

প্রকাশ পাইয়াছিল। বাবুরাম মহারাজ একবার বলিয়াছিলেন, “স্বামিজী পরিব্রাজক অবস্থায় পুনা সহরে যান। সেই সময় বালগঙ্গাধর তিলক মহারাজের খুব খ্যাতি হইয়াছিল। স্বামিজীর অন্যত্র থাকিবার কোন সুবিধা না হওয়ায় তিলক মহারাজের বাড়ীতে থাকিবার মনস্থ করিলেন এবং গৃহস্বামী সম্মত হইলে স্বামিজী একটি পরিত্যক্ত গৃহে বাস করিতেন ও গৃহস্বামীর নিকট ভোজন করিতেন। সংস্কৃত শাস্ত্র পুনা সহরে বিশেষ ভাবে পাওয়া যায় সেইজন্য স্বামিজী তথায় থাকিতে মনস্থ করিলেন। এই সময় তিনি সংস্কৃত শাস্ত্র বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন ও সামান্য রমতা সাধু বলিয়া গৃহস্বামীর সহিত বিশেষ বাক্যালাপ বা পরিচয় হয় নাই। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ যখন মাদ্রাজে উপস্থিত হইলেন তখন তিলক মহারাজ স্বাগ্রহে আপন বাড়ীতে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া স্বামিজীকে টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন এবং অপরিচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যেরূপ সম্মান করিয়া নিমন্ত্রণ করিতে হয় তিলক মহারাজও সেইভাবে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। স্বামিজী টেলিগ্রাম পাইয়া তিলক মহারাজকে প্রত্যুত্তরে উত্তর দেন যে, “অমুক সময়ে অমুক পরিত্যক্ত গৃহে যে সাধুটি আপনার বাড়ীতে বাস করিত আমি সেই আপনার পূর্ব্ব পরিচিত লোক।” এই উত্তর পাইয়া তিলক মহারাজ বড়ই সম্মান মনে করিয়াছিলেন, কারণ স্বামিজী এক সময় তাঁহার বাড়ীতে ছিলেন এবং সেই পূর্ব্ব ভাব অদ্যাপিও রাখিয়াছেন।

কংগ্রেস্ উপলক্ষে তিলক মহারাজ যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন তখন তিনি বেলুড় মঠে যাইয়া স্বামিজীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন। উভয়ে মঠের মাঠেতে পায়চারি করিতে করিতে নানা কথাবার্ত্তা কহিতেন এবং সে সময় অন্য কাহার তথায় যাইবার অধিকার ছিল না। সেইজন্য তাঁহাদের কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা কেহ জানে না। নিশ্চয়ানন্দ স্বামী বলেন যে, "তিলক মহারাজ অনেক কার্য্যের ভাব ও প্রণালী স্বামিজীর নিকট হইতে পাইয়াছিলেন।"

বেলুড় মঠে স্বামিজী ও বালগঙ্গাধর তিলক।

এক সময় কোন স্থানে স্বামিজী ট্রেনে করিয়া যাইতেছিলেন, গায়ে গৈরিক পরিচ্ছদ ও নির্ব্বাক বিষণ্ণ বদন। সেই গাড়ীতে কতকগুলি ইংরাজী শিক্ষিত তৎদেশীয় ব্যক্তিও যাইতেছিলেন। তাঁহারা স্বামিজীর চেহারা ও বদন দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "এই সব সন্ন্যাসীগুলি দেশের এক মহা কণ্টক। একেই তো দেশে দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্রতা নিত্য লেগে র'য়েছে তাহার উপর এই ষণ্ডা লোকগুলি রোজগার ক'রবে না আর পরের অন্ন ধ্বংসাবে" ইত্যাদি তাঁহারা ইংরাজীতে কহিতেছিলেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে উপস্থিত সন্ন্যাসীটি ইংরাজী জানে না। তাহার পর তাঁহারা সংস্কৃত বই হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার ইংরাজীতে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহাদের উদ্ধৃত শ্লোক ও ব্যাখ্যা উভয়ই ভুল হইতেছিল। তাঁহাদের ভুল উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা

শুনিয়া স্বামিজী আর নীরবে থাকিতে না পারিয়া স্বয়ং উপযুক্ত ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাদিগকে ইংরাজীতে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলেন। স্বামিজীর নিকট ইংরাজীতে ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহারা বড়ই অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, এ লোকটি ভাল রকমই ইংরাজী জানেন এবং তাঁহাদের বিদ্রূপের সমস্ত কথাই বুঝিতে পারিয়াছেন। স্বামিজী তখন তাঁহাদের "সন্ন্যাস ধর্ম্মের উদ্দেশ্য" ও "ভারতের প্রকৃত অবস্থা" বিষদ্‌ভাবে ইংরাজীতে বুঝাইয়া দিলেন। স্বামিজীর পাণ্ডিত্য ও ইংরাজী ভাষার উপর অধিকার দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে, তাঁহারা দিবাকরের কাছে সামান্য প্রদীপ মাত্র। সেই সময় হইতে তাঁহারা স্বামিজীর বিশেষ অনুগত হইয়াছিলেন।

ট্রেনে স্বামিজীর জনৈক ব্যক্তির নিকট শাস্ত্র ব্যাখ্যা করা।

স্বামিজী যদিও এই সময় অতি বিষণ্ণ ও বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ হইয়া রমতা সাধুর ন্যায় নিজের ইচ্ছামত পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছিলেন কিন্তু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হাস্য কৌতুক কখন তিনি বিস্মৃত হন নাই। লণ্ডন অবস্থানকালে একবার স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "এক সময় তিনি ট্রেনে করিয়া যাইতেছিলেন, সঙ্গে এমন একটি পয়সা নেই যে কিছু কিনে খান, পূর্ব্ব দিনেও বড় কিছু আহার জোটে নাই। ট্রেনে কতকগুলি বোম্বাই অঞ্চলের লোক ছিল তাহারা বলিলেন, "ইনি হিমালয়ের অনেক স্থান ঘুরিয়া বেড়ান, নিশ্চয়ই হিমালয়ের নিভৃত স্থানে কুত্‌মিলাল্ মহাত্মার সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে।" তাহারা থিওষ-

ফিস্ট ছিল; সেইজন্য হিমালয়ের অলৌকিক ঘটনা ও মহাত্মাদিগের অনেক আজগুবি গল্প সব কহিতে লাগিল। স্বামিজী হাস্য সম্বরণ করিয়া বেশ গম্ভীর মুখে তাহাদের আজগুবি গল্পের সহিত মিশিয়া যাইলেন এবং হঠাৎ তাহাদের বলিয়া উঠিলেন, "কুত্‌মিলালের কথা বোল্‌চেন্ কি এই কয়দিন আগে কুত্‌মিলালের ভাণ্ডারাতে গেছ্‌লুম। সে কি ব্যাপার! এই এত বড় বড় লাড্ডু (নিজের প্রকাণ্ড হাত দেখাইয়া) আর কত যে সাধু ভোজন ক'রেছে তার ইয়ত্তা নাই, সে যে কি ব্যাপার তা আর আপনাদের কি ব'লবো" এই বলিয়া তিনিও আজগুবি কথা বলিতে স্বরু করিলেন। স্বামিজী যে তাহাদের বিদ্রূপ করিতেছেন তা তাহারা বুঝিতে না পারিয়া স্বামিজীর সহিত মহা উল্লাসে মাতিয়া যাইল এবং আনন্দে স্বামিজীকে ভাল রকম কিছু ভোজন করাইয়া দিল। ভোজনান্তে স্বামিজী একটু সুস্থ হইয়া আবার ভাব পরিবর্তন করিয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাদিগকে খুব ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। লণ্ডন অবস্থানকালে এই উপাখ্যানটি তিনি বিশেষ হাস্য কৌতুক করিয়া বলিতেন।

স্বামিজীর কুত্‌মিলালের গল্প বলা।

স্বামিজী বেলগাঁওয়ে কি ভাবে গিয়াছিলেন সে বিষয় বিশেষ জানা নাই। পরিব্রাজক বা সাধু যে প্রকারে ঘুরিতে ঘুরিতে যাইয়া আশ্রয় লয়, মনে হয় তিনিও সেই প্রকারে যাইয়াছিলেন। তখন কোন পত্রাদি যাতায়াত ছিল না সেইজন্য খবরাখবরও ছিল না। গরমকালে হঠাৎ

একদিন একখানা ফটোগ্রাফ আসিল, কোন ঠিকানা নাই, ছবিওয়ালা সেই ছবিখানি বর্ত্তমান লেখককে পাঠাইয়া দিয়াছেন। লম্বা চেহারা, পা পর্য্যন্ত ডবল-ব্রেষ্ট তুলা-ভরা জামা এবং মাথায় পাগ্‌ড়ি। ছবিটি দেখিয়াই স্বামিজীর চেহারা বুঝিতে পারা যাইল এবং শরীরটা একটু শুধরাইয়াছে বলিয়া মনে হইল। সেই ছবির সহিত পত্রাদি আর কিছু ছিল না।

কলিকাতায় স্বামিজীর ফটোগ্রাফ আনা।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই থেকে একটি যুবক-অধ্যাপক কলিকাতায় আসেন এবং স্বামিজীর তিথিপূজার দিন বেলুড় মঠে যান। তিনি একটি স্বামিজী সম্বন্ধে উপাখ্যান বলিয়াছিলেন। এক সময় স্বামিজী তাহাদের বাড়ীতে থাকিতেন, তখন তিনি বালক ছিলেন সেইজন্য স্বামিজী তাহাকে লইয়া খেলা করিতেন। দুই হাতের বেড় করিয়া তাহার ভিতর দিয়া কেমন করিয়া নিজের শরীর গলাইয়া লইতে হয় এইটি স্বামিজী তাহাকে শিখাইতেন। সংস্কৃতে ইহাকে "হস্ত চংক্রমন" বলে। বালকটি ক্রমে বড় হইয়া কলেজে পড়িতে লাগিল। হঠাৎ একদিন কলেজে দেখিল যে আমেরিকা বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ মাদ্রাজে বক্তৃতা করিতেছেন। যুবকটি ট্রেনে করিয়া অতি সত্বর মাদ্রাজে যাইল এবং স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনেক চেষ্টার পর স্বামিজীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে তাহাদের বাড়ীর সেই পূর্ব্ব পরিচিত সাধুটিই স্বামী

বিবেকানন্দ এবং যুবকটি আত্মপরিচয় দিলে স্বামিজী তাহাকে চিনিতে পারিলেন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের সংবাদ পত্রে স্বামিজীর বেলগাঁওয়ে অবস্থানকালের একটি খবর প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বামিজী যদিও সন্ন্যাসী কিন্তু ইংরাজীতেও কথাবার্ত্তা কহিতেন। দক্ষিণে তামাক সেবন করা হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ বিশেষতঃ সাধুর পক্ষে একেবারেই নয়। কিন্তু স্বামিজী তামাক সেবন ও সুবিধা হইলে আমিষ আহারও করিতেন। লোকটি বড় প্রীতিকর ও ভিতরে অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি ছিল বলিয়া কেহ কিছু আপত্তি করিত না। যদিও রমতা সাধু কিন্তু বসা দাঁড়া যেন কোন বড় ঘরের ছেলের মত ছিল। কেহ তর্ক করিতে গেলে নম্র, হাস্য কৌতুক প্রিয় স্বামিজী হঠাৎ ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া মহা শক্তিশালী পুরুষ হইয়া প্রতিদ্বন্দিকে বিধ্বস্ত করিতেন। স্বামিজীর পড়াশুনা ও খবরাখবর সাধারণ লোকের অপেক্ষা অনেক বেশী দেখিয়া সকলে কোন তেজস্বী নূতন প্রকারের সাধু বলিয়া মনে করিত। বেলগাঁও হইতে স্বামিজী দক্ষিণে গমন করেন।

স্বামিজীর বেলগাঁওয়ে গমন।

বেলগাঁও পরিত্যাগ করিয়া স্বামিজী আপনার ইচ্ছামত দক্ষিণে যাত্রা করেন। মহা বিষণ্ণভাবে নিঃসঙ্গ অবস্থায় আবার একাকী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে কন্যাকুমারী দর্শন করিতে যান। এই সময়কার কথা তাঁহার বক্তৃতা ও চিঠি পত্রেতে কিছু কিছু পাওয়া যায়, এতদ্ব্যতীত বিশেষ কিছু জানা নাই।

স্বামিজীর মাদ্রাজে গমন।

দক্ষিণে অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া স্বামিজী মাদ্রাজে উপস্থিত হইলেন এবং তদানীন্তন সহকারী একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারল্ মন্মথনাথ ভট্টচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। নাম ধাম কিছুই জানা নাই, কোন পরিচয় পত্রও নাই, জিজ্ঞাসা করিবারও কাহার সামর্থ্য নাই, শুধু সাধু ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ ভক্ত এইটি মাত্র বোঝা যাইতেছিল। শ্রীযুত মন্মথনাথ ভট্টচার্য্য মহাশয় তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্যামবাজারের শ্রীযুত মণিন্দ্র ভট্টচার্য্যকে লিখিলেন যে, "একটি বাঙ্গালী সাধু তাহার কাছে আছেন, বয়স আন্দাজ ৩০-৩২ বৎসর, মুখ গোল, কপালে কাটা দাগ, ভাল গাহিতে পারেন, ইংরাজী লেখাপড়া ভাল রকমই জানেন, হাস্য কৌতুক প্রিয় ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ ভক্ত, এ লোকটির বিষয় সন্ধান করিয়া আমায় মাদ্রাজে যেন জানান হয় এবং এ সকল কথা যেন বিশেষ গোপন রাখা হয়।" তদনুযায়ী শ্রীযুত মণিন্দ্র ভট্টচার্য্য ৭নং রামতনু বসুর গলির বাড়ীতে আসিয়া বর্ত্তমান লেখকের কাছে সব বলেন এবং সমস্ত পরিচয় ও লক্ষণ মিলিয়া যাইলে তিনি কাহার নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া ফিরিয়া যাইয়া মাদ্রাজে সংবাদ পাঠান।

স্বামিজী দক্ষিণেরদিকে গিয়াছেন এ কথা পূর্ব্বে আভাষে জানা গিয়াছিল কিন্তু কোন্ স্থানে গিয়াছিলেন তাহার নিশ্চয়তা ছিল না, এক্ষণে হইল। এই সকল কথা শরৎ মহারাজ ও সান্ন্যাল মহাশয়কে জানান হইলে পুনরায় পত্র

লেখালিখি চলিতে লাগিল কিন্তু স্বামিজীর পত্রের ভাব স্বতন্ত্র হইল। রাজপুতানার পত্রতে যেমন শোকের ও বিষাদের ভাব ছিল, কখন বা কেবল রাগারাগি বা গালাগালির কথা ছিল তেমনি মাদ্রাজের প্রত্যেক পত্রাদিতে গাম্ভীর্য্য, সাহস, ভালবাসা ও উৎসাহপূর্ণ বাক্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। পত্রাদি লিখিবার ধাঁজধরণও অন্য প্রকারের ছিল—যেন কোন উচ্চ শ্রেণীর লোক সকলকে আদেশ পত্র লিখিতেছেন। প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করিয়া খোঁজ খবরও থাকিত এবং শাস্তীর ভাব ও সম্মুখে যেন কোন মহৎ উদ্দেশ্য রহেছে এই সকল কথাবার্ত্তা পত্রের প্রত্যেক পংক্তিতেই ছিল। গুপ্ত মহারাজ একবার হাস্য কৌতুক করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি ত কিছুই পাইনি, স্বামিজীও কিছু পান নাই তবে ভালবাসার জন্য একসঙ্গে থাক্‌তুম, আর ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম ও গুরু ব'লে সেবা কত্তুম।" কিন্তু এই সকল পত্রাদির একটু আধুটু যাহা তিনি শুনিতেন তাহাতেই চমকিত ও হর্ষিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আরে বাবা এখন আর ঠাট্টা তামাসা নয় যে, এখন যে দেখ্‌চি কিছু পেয়েছে। এখন সম্মান ক'রে কথা কইতে হবে, আর হাসি তামাসা নয়! আরে তা না হ'লে কি আমার গুরু হ'তে পারে? আমার মতন বেয়াড়া লোককে শায়েস্তা ক'রতে না পার্‌লে সে কি কখন আমার গুরু হয়?" গুপ্ত মহারাজ অতি সরল লোক, কথার মারপ্যাঁচ কিছু জানিতেন না, তাই স্পষ্টভাবেই প্রাণের

মাদ্রাজ হইতে স্বামিজীর পত্র লেখা।

কথা কহিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া সকলেই বড় খুসী হইয়াছিল।

শ্রীযুত মন্মথনাথ ভট্টচার্য্যের বাড়ীতে অবস্থানকালে আলাসিঙ্গার মুখে যে সকল কথা শুনিয়াছিলাম তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল।* প্রথমে একটি দু'টি করিয়া লোক স্বামিজীকে দেখিতে আসিল। ক্রমশঃ সংখ্যা বাড়িতে লাগিল এবং অল্পদিনের ভিতরেই জন সংখ্যা অত্যাধিক হইয়া উঠিল। রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত বহু লোক বসিয়া নানা কথাবার্ত্তা কহিত,—বিশ্রাম নাই, শ্রান্তি নাই। স্বামিজীর সহিত কথা কহিয়া সকলেই বড় আকৃষ্ট হইয়া পড়িল এবং তাহাদের ভিতর অনেকগুলি আত্মগোষ্ঠীর ভিতরও হইল। স্বামিজী একটু সময় পাইলে শ্রীযুত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্যের ছোট কন্যাটিকে গান শিখাইতেন এবং মাঝে মাঝে হারমোনিয়ম বাজাইয়া ছোট মেয়েটিকে সন্তুষ্ট করিতেন।

আলাসিঙ্গা।

Mandam Chakravarty Alasingha Parumal নামক জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক পাচাই আপ্‌পাস কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি স্বামিজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া শিষ্য হইলেন। মহা উদ্যোগী ও সর্ব্ববিষয়ে উৎসাহী হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। আলাসিঙ্গাকে কৌতুহলচ্ছলে সকলে "মাদ্রাজের হরমোহন" বলিয়া ডাকিত। এই সময় স্বামিজী এক দুঃস্বপ্ন দেখেন যে তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে। এই দুঃস্বপ্নে তাঁহার মনটা একেবারে দুঃখিত

হইয়া উঠিল এবং এ সকল কথা কাহাকেও না ফুটিয়া কেবল তিনি আলাসিঙ্গকে বলিলেন। সন্ন্যাসী হইয়া গৃহে আর পত্র লিখিবেন না কিন্তু প্রাণটি বড় ব্যথিত হইয়া উঠিল এবং স্বপ্নটি সত্য স্থির করিয়া তিনি শ্রাদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। শ্রাদ্ধের কথা শুনিয়া আলাসিঙ্গা স্বামিজীকে বলিলেন, "আপনি সন্ন্যাসী হইয়া কি করিয়া মাতার শ্রাদ্ধ করিবেন ?" স্বামিজী গম্ভীর হইয়া শঙ্করাচার্য্য যে স্বীয় মাতার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন সেই সকল বিষয় তাহাকে বলিলেন, কিন্তু কলিকাতার সংবাদ কেহই লইলেন না। অবশেষে আলাসিঙ্গা বলিলেন, "স্বামিজী, কয়েক মাইল দূরে রেল ক'রে যাইলে এক পিশাচসিদ্ধ আছে সে সমস্ত অতীত ভবিষ্যৎ ঘটনা বলিতে পারে। পারিশ্রমিক স্বরূপ ১০৲ টাকা লয় এবং কেহ "কারণ" লইয়া যাইলে বড়ই সন্তুষ্ট হয়। লোকটি অতিশয় কারণপ্রিয় ও শ্মশানে একটি খোড়ো ঘরে বাস করে।"

স্বামিজীর মাতার শ্রাদ্ধ করিবার ইচ্ছা।

চার পাঁচ জন মিলিয়া একদিন স্বামিজী সেই পিশাচ-সিদ্ধর কাছে যাইলেন। স্থানটি শ্মশান, চারিদিকে হাড়, ছাই, ভস্ম ইত্যাদি ছড়ান রহিয়াছে। একটা বড় গাছ আছে তার কাছে একটা মেটে ঘর বেঁধে সেই পিশাচসিদ্ধ বাস

আলাসিঙ্গা সঙ্গে ক'রে এক বোতল মদ ও ১০৲ টাকা লইয়া যাইয়াছিল, সেই দুটি দিলে সেই পিশাচসিদ্ধ তাড়াতাড়ি সেই মদ ও টাকা নিয়ে তাহার মেটে ঘরটিতে ঢুকিয়া দোর বন্ধ করিল ও চীৎকার করিয়া কাতরস্বরে নিজের

ভাষায় কি বলিতে লাগিল। স্বামিজী সেই চীৎকার শুনিয়া আলাসিঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও কি বোল্‌ছে? ও চিৎকার করে কেন?' আলাসিঙ্গা ইংরাজীতে স্বামিজীকে বুঝাইয়া দিলেন যে ও বোল্‌ছে ঐ লোকটিকে এখান থেকে চলে যেতে বল, ওর গা থেকে বড় তেজ বেরুচ্ছে তাতে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে, আমি ওর সব কথা বলে দিচ্ছি কিন্তু ওকে এ শ্মশানভূমি থেকে চলে যেতে বল, ও যেন দূরে চলে যায় আমি ওর তেজ সহ্য কর্ত্তে পাচ্ছিনি।" তাহা শুনিয়া স্বামিজী হাস্য করিয়া আলাসিঙ্গাকে বলিলেন, 'দূঃ শ্যালা, মাতাল মাতালস্য নানা ভঙ্গী' এই বলিয়া স্বামিজী সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া দূরে চলিয়া যাইলেন এবং একটা ফুল গাছ থেকে ফুল তুলিয়া কখন বা শুঁকিতে লাগিলেন কখন বা চট্‌কাইতে লাগিলেন ও আপন মনে বাঙ্গালা গান গাহিতে লাগিলেন। কিন্তু আলাসিঙ্গা প্রভৃতিরা শ্মশানে সেই ঘরটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন পিশাচসিদ্ধ কতকগুলি কাগজ লইয়া নিজের ভাষায় অনবরত লিখিতে লাগিল। এক তাড়া কাগজ লেখা হইলে সেই কাগজগুলি আলাসিঙ্গার হাতে দিয়া পিশাচসিদ্ধ বলিল যে, প্রত্যেক কাগজে, প্রত্যেক পাতায় উহার নাম সহি করিতে বল। আলাসিঙ্গা সেই কাগজ-গুলি আনিয়া স্বামিজীকে নাম সহি করিতে বলিলে তিনি তদ্রূপই করিয়াছিলেন।

জনৈক পিশাচ সিদ্ধ।

আলাসিঙ্গা সেই কাগজগুলি পড়িয়া স্বামিজীকে

ইংরাজীতে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। তাহাতে লেখা ছিল যে, "আগেকার নাম নরেন্দ্রনাথ। পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত, মাতার নাম ভুবনেশ্বরী। মাতা এখন জীবিতা আছেন, কোন অসুখ হয় নাই। স্বামিজীর জন্ম ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে। ২১ বৎসরে পিতৃ বিয়োগ হয় তাহার পর সংসারে অনেক কষ্ট হয়। তদন্তর গুরুর বিশেষ আশ্রয় পান ও অনেক শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন। মনে একটা আতঙ্ক হইয়াছে যে গুরু তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু গুরু অলক্ষিতভাবে সর্ব্বদাই কাছে আছেন ও রক্ষা করিতেছেন। বিপদের দিন কাটিয়া যাইল ওমুক মাস থেকে শুভ দিন আসিবে। বহুদূরে সমুদ্র যাত্রা করিতে হইবে। তাহার পর বিশ্ব-বিজয়ী ও জগত বিখ্যাত হইবেন এবং অনেক হিতকর কার্য্য করিবেন" এইরূপ অনেক কথা লেখা ছিল। এই কাগজ লিখিত কথা যে সত্য ইহার প্রমাণস্বরূপ স্বামিজী অমুক ফুল তুলিয়া লইয়া শুঁকিবেন এবং গুন্ গুন্ করিয়া নিজের ভাষায় একটি গান করিবেন। স্বামিজী ও আলাসিঙ্গা প্রভৃতিরা সকলে সেই কাগজগুলি পড়িয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিলেন কারণ নাম, ধাম ও পূর্ব্ব ঘটনা সমস্তই ঠিক মিলিয়া গিয়াছিল।

পিশাচসিদ্ধের স্বামিজীর বিষয় বলা।

তাহার পর স্বামিজী আলাসিঙ্গার মারফৎ পিশাচসিদ্ধকে অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তখন সে কারণের বোতলটী অনেকটা খাইয়াছে ও একটু প্রফুল্ল হইয়াছে। সঙ্গে তার একটি স্ত্রীলোক ছিল তখন সে সরিয়া যাইল।

পিশাচসিদ্ধর পূর্ব্বজীবন বলা।

পিশাচসিদ্ধটি বলিতে লাগিল, 'সে পূর্ব্বে নিম্ন শ্রেণীর লোক ছিল এবং বালক অবস্থায় একদল সাধুর সহিত মিশিয়াছিল। একজন সাধুর বিশেষ সেবা করায় তিনি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে জপ ধ্যানের কতকগুলি প্রক্রিয়া শিখাইয়া দিয়াছিলেন। কিছুকাল সেইভাবে জপ করিবার পর তাহার ভিতর একটা শক্তি উৎপন্ন হইল কিন্তু পূর্ব্বের নিষ্ঠা তখন চলিয়া যায়। কেউ কিছু প্রশ্ন করিলে কারণপ্রিয় ও বামাচারি পথ অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব শিক্ষিত ভাবে ধ্যান করিতে থাকিলে সম্মুখে একটি মূর্ত্তি দেখিতে পায়। সেই মূর্ত্তিটি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর বলিয়া যায় আর সে সেইগুলি কাগজে লিখিয়া লয়। কখন কখন দুষ্ট মূর্ত্তিটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় না, তখন সে একটি শ্লেটে অঙ্কের তেরিজ কষিতে আরম্ভ করে। তখন তাহাতেই তাহার মন নিবিষ্ট হইয়া যায় এবং মূর্ত্তিটি তখন স্পষ্ট হইয়া প্রতীয়মান হয় এবং সমস্ত কথা বলিয়া দেয়। ইহা ছাড়া সে বিশেষ কিছু জানে না। সেই সমস্ত কথা শুনিয়া স্বামিজী আবার ফিরিয়া আসিলেন।

মুন্‌সী জগমোহন লালের সহিত বর্ত্তমান লেখকের সাক্ষাৎ কালে সেই পিশাচসিদ্ধর কথা বর্ত্তমান লেখক মুন্‌সী জগমোহন লালকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। মুন্‌সী জগমোহন লাল বলিলেন, "তাহাকে ১০৲ টাকা ও এক বোতল মদ দিতে হয়। কিন্তু মুন্‌সী জগমোহন লালের বিষয় সে যে সকল কথা বলিয়াছিল তাহা সকলগুলি ঠিক

হয় নাই। অতীত ও ভবিষ্যতের কথার ভিতর কিছু মিলিয়াছিল বটে কিন্তু অনেক স্থলেই মিল হয় নাই। এই জন্য মুন্সী জগমোহন লাল সেই পিশাচসিদ্ধটির উপর বিশেষ আস্থা প্রকাশ করিলেন না।

স্বামিজীর মন এতদিন ধরিয়া বড়ই বিষণ্ণ ছিল। তাঁহার জীবন যে ব্যর্থ হইয়াছে এইটি তাঁহার ধারণা হইয়াছিল কিন্তু পিশাচসিদ্ধর কথা শুনিয়া তাঁহার প্রাণে আবার আশার সঞ্চার হইতে লাগিল ও মনে প্রবলশক্তি আসিতে লাগিল। চিকাগোর ধর্ম্ম সভায় যাইতে তাঁহার মনে এক নূতন ভাব উঠিল এবং ক্রমেই তাঁহার ভিতরে গাম্ভীর্য্য ও সিংহবল আসিতে লাগিল।

পি, সিঙ্গারাভেলু মুদালীয়ার।

পি, সিঙ্গারাভেলু মুদালীয়ার খৃষ্টান কলেজের একজন বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। আলাসিঙ্গার পরম বন্ধু এই জন্য স্বামিজীর কাছে আসিতে লাগিলেন ও স্বামিজীর অন্তরঙ্গ শিষ্য হইলেন। তিনি কিছুদিন ফল ও দুগ্ধ খাইয়াছিলেন সেইজন্য সকলে তাহাকে "কিড়ি" বা টিয়া পাখী বলিত এবং তিনি সেই নামেই বন্ধু বান্ধবের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। কিড়ি অত্যন্ত বালক স্বভাব ও ভাবপ্রবণ ছিলেন। কথা বলিতে বলিতে অনেক সময় কাঁদিয়া ফেলিতেন। প্রগাঢ় ভক্তি এবং কি করিয়া লোকের সেবা করিবেন এইটি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল; কর্ম্ম ও জ্ঞানভাবের চেয়ে সেবা ভাবটা তাঁহার ভিতর বেশী ছিল। তিনি বর্ত্তমান লেখককে যে সব পত্র লিখিয়াছিলেন

তাহাতে কি ভালবাসাপূর্ণ অমায়িক ভাব ছিল! যেন স্বামিজীর প্রতি তাহার প্রাণটা গলিয়া গিয়াছে এবং প্রাণের গভীর স্থান থেকে সে ভাব উঠিতেছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে পত্রগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমান লেখক ও কিড়ি।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে বর্ত্তমান লেখক মাদ্রাজে যাইয়া দুই ঘণ্টা ছিল। কিড়ি আধ ঘণ্টার ভিতর স্বামিজী সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল। কিড়ি বলিয়াছিলেন, স্বামিজীর ভাব সর্ব্বতোমুখি। একবার কথা উঠিল যে কি ক'রে হরিণ শিকার করা হয়। স্বামিজী বলিলেন, 'মনটাকে একাগ্র করিয়া যদি বন্দুক হরিণের দিকে রাখা যায় তা'হলে গুলি অব্যর্থ ভাবে হরিণকে লাগ্‌বে।' এইরূপ কথার পর স্বামিজীর একদিন শিকার করিবার ইচ্ছা হইল। কোন একস্থানে তাহারা কয়জন মিলিয়া হরিণ শিকার করিতে যাইলেন। স্বামিজী প্রথম যৌবনকালে কুস্তি, জিবনাষ্টিক্, তরোয়াল ও লাঠি খেলা শিখিয়াছিলেন কিন্তু সন্ন্যাসী হইয়া কখন সে বিষয়ের চর্চ্চা করেন নাই। স্বামিজী যখন মাঠে যাইয়া বন্দুক হাতে ক'রে দাঁড়া'লেন তখন স্বতন্ত্র ব্যক্তি! তাঁহার সাধু ভাব যাইয়া ক্ষত্রিয় ভাব দাঁড়াইল; হাতের বন্দুক একবারও কাঁপিল না, দৃষ্টি ঠিক করিয়া লইলেন এবং এমন ভাবে গুলিটি ছুঁড়িলেন যে হরিণটির পায়ে গিয়া বিঁধিল ও হরিণটি পড়িয়া গেল। কিড়ি আহ্লাদ করিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, Swamiji was a dead shot অর্থাৎ

স্বামিজীর অব্যর্থ সন্ধান ছিল। পাকা শিকারি যেরূপ ভাবে শিকার করে তিনিও সেইরূপ ভাবে শিকার করা সেইদিন দেখাইয়া দিলেন।

কিড়ি আর একটি গল্প বলিয়াছিলেন। একদিন স্বামিজী সন্ধ্যার সময় বসিয়া নৃত্য গীতের কথা বলিতে-ছিলেন। নৃত্য বা হস্তপদাদি সঞ্চালনে যে মানসিক নানা প্রকার ভাব প্রকাশ করা যায় তাহাই তিনি উপস্থিত সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন। সেই সমস্ত বিষয় বুঝাইতে বুঝাইতে তিনি উত্তেজিত হইয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, 'একখানা সাড়ী কাপড় নিয়ে এসোতো?' কাপড়খানি আনা হইলে তিনি নিজ গৈরিক বসনের উপর সেই সাড়ী-খানি স্ত্রীলোকের ন্যায় পড়িয়া লইলেন। তখন তিনি যে সাধু বা পুরুষ মানুষ সেইটি ভুলিয়া গিয়াছেন এবং নিজে স্ত্রীলোক এইটি ধারণা হইল। অবিলম্বে বাইজীর ন্যায় হস্তাদি সঞ্চালন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নানারূপ ভাবভঙ্গি ও অঙ্গাদি পরিচালন করিয়া বাইজীর ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলে স্বামিজীর সেই ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল। বাদ্যের সহিত কোন যায়গায় তাল কাটিয়া যাইল না। গৃহমধ্যে যেন কোন শিক্ষিত বাইজী আসিয়া গান করিতেছে সেইটি সকলে অনুভব করিতে লাগিল। কিড়ি বলিয়াছিলেন, "ভাবের সহিত সহসা শরীরকে পরিবর্তন করা স্বামিজী অদ্ভুতরূপে দেখাইয়াছিলেন।"

স্বামিজীর সাড়ী কাপড় পরিধান করিয়া নৃত্য করা।

তাহার পর কিছি সাধারণ লোকদিগের প্রতি ভালবাসা, কি করিয়া তাহাদের কল্যাণ ও উন্নতি হইবে সেই সমস্ত বিষয়ে কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। পুনরায় কিছি বলিতে লাগিলেন, গরিব দুঃখীর কোন কষ্ট দেখিলে স্বামিজীর মুখ রূপান্তরিত হইয়া যাইত, অনেক সময় তিনি বিমর্ষ হইয়া থাকিতেন ও তাঁহার চক্ষুতে জল দেখা যাইত।

এই সময় মুন্সী জগমোহন লাল মাদ্রাজে স্বামিজীর সহিত দেখা করিতে আসেন এবং সান্যাল মহাশয়ের নিকট স্বামিজীর পত্রাদি আসিতে লাগিল। প্রত্যেক পত্রখানি ভালবাসা ও উৎসাহে পরিপূর্ণ। প্রত্যেকের নাম করিয়া খবরাখবর লওয়া এবং তিনি যে এইবার একটা বিশেষ কিছু কায করিবেন তাহারই পূর্ব্ব সূচনা দেখা যাইতেছিল।

মাদ্রাজ হইতে স্বামিজীর পত্র লেখা।

একবার একখানি পত্র আসিল যে তিনি হাইদ্রাবাদে যাইতেছেন, পাঁচ ছয় দিন বাদে পুনরায় মাদ্রাজে ফিরিবেন। খেতড়ির রাজা অজিত সিংয়ের দয়া-দাক্ষিণ্য, সেবা ও গুরুভক্তি প্রভৃতির নানা সুখ্যাতিপূর্ণ পত্র আসিতে লাগিল। রাসমণির জামাতা মথুরচন্দ্র বিশ্বাস যেমন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবা করিয়াছিলেন রাজা অজিত সিংও স্বামিজীকে সেইরূপ ভাবে ভক্তি করিতেন।

এই সময় মাদ্রাজ থেকে একখানি পত্র আসিল যে স্বামিজী আমেরিকায় চিকাগো মহাসভায় যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যাওয়া কতদূর সম্ভব হইবে এবং যাইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন কি না সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ

সন্দেহ ছিল সেইজন্য শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আশীর্ব্বাদ চাহিয়াছিলেন। স্বামিজী কথাটি অতি গোপন রাখিতে বলিয়াছিলেন বলিয়া এই সকল কথা শরৎ মহারাজ, যোগেন মহারাজ, সান্ন্যাল মহাশয় ও বর্ত্তমান লেখক ব্যতীত আর কেহই জানিত না। অপরের কাছেও এ বিষয় উল্লেখ করা হইত না। যাহা হউক এই সময় ত স্বামিজীর আমেরিকা যাইবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ চলিতে লাগিল।

লণ্ডন অবস্থানকালে কৃষ্ণ মেনন্ নামক জনৈক মাদ্রাজী যুবক স্বামিজীর নিকট যাইত। একদিন স্বামিজী বলিতে লাগিলেন, "দেখ আমি এই মেননের দেশে গেছ্‌লুম। সেই সেতুবন্ধ রামেশ্বরের দিকে গিয়ে দেখি যে এক বীভৎস কাণ্ড! মেয়েদের কোমর পর্য্যন্ত কাপড় পরা আর উপরকার অঙ্গটা একেবারে খোলা। আরে ছি! ছি!! দেখে লজ্জা কর্ত্তে লাগ্‌লো।" মেনন বলিত, "স্বামিজী যখন মাদ্রাজের দিকে ছিলেন তখন আমি তাঁহার কোল্কেতে তামাক ভোরে দিতুম, এইটাই ছিল আমার প্রধান কায।" মেনন্ কথাটি এমন বুক ফুলিয়া গর্ব্ব করিয়া বলিল যে বর্ত্তমান লেখক তাহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। মেননের ভক্তিপূর্ণ কথাটি শুনিয়া বুঝা যাইল যে, স্বামিজীকে তামাক সেজে খাওয়ানই তাহার সর্ব্ব কার্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য, এবং তাহার সৌভাগ্য যে সে সেই কাজ করিবার অধিকার পাইয়াছিল। স্বামিজী ও কৃষ্ণ মেনন।

একদিন স্বামিজী কর্ণেল অল্‌কটের সহিত সাক্ষাৎ

করিতে যান, সঙ্গে মেনন ও জনকতক লোক ছিল। স্বামিজীর মুণ্ডিত মস্তক ও মাথায় পাগড়ি। অল্‌কটের সহিত নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে স্বামিজী মৃদুভাব হইতে ক্রমশঃ তীব্রভাব ধারণ করিলেন, অবশেষে অল্‌কটকে ধম্‌কাইতে সুরু করিলেন। স্বামিজী নির্ভীক ভাবে বলিতে লাগিলেন, "তুমি কতকগুলি ভূতুড়ে ধর্ম্ম চালাচ্ছ কেন? তোমার মহাত্মারা উড়ে যাচ্ছে, উড়ে আস্‌ছে, মাথার পাগড়ি রেখে যাচ্ছে, এ সব কি কচ্ছ? আর যত আহাম্মক মাদ্রাজী ছোঁড়াদের মাথা খাচ্ছ। তুমি হিন্দু ধর্ম্মের কি জান? যত বাজে ধূয়ো তুলেছ" এইরূপ ভাবে তীব্র ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। মেনন ও তাহার সঙ্গীরা স্বামিজীর ভৎর্সনা শুনিয়া স্তম্ভিত ও চমকিত হইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পর স্বামিজী ক্রোধ সম্বরণ করিয়া শান্ত ও গম্ভীর হইয়া তাঁহার আমেরিকা যাওয়ার বিষয় অল্‌কটকে জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন, "তোমার তো আমেরিকায় অনেক বন্ধু-বান্ধব আছেন তাঁহাদের নিকট পরিচয় পত্র দাও না?" অল্‌কট একটু মৌন হইয়া থাকিয়া পরিচয় পত্র দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন স্বামিজী পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের মস্তকোস্থিত পাগড়ি উন্মোচন করিয়া অল্‌কটকে বলিলেন, "এই একটা নেড়া মাথার কাছে তোমার বিশ হাজার থিওযফিষ্ট দাঁড়াতে পারে না। এই গেরুয়া পড়া নেড়া মাথাগুলি রাজাদের উপর কথা চালায়, আর সমস্ত ভারতবর্ষে যেখানে যত হিন্দু আছে তাদের

স্বামিজ ও অলকট্।

গুরু হ'য়ে আদেশ চালাচ্ছে।" মেনন বলিতে লাগিল, "স্বামিজী যখন এই কথাগুলি অল্‌কটকে বলিতেছিলেন তখন তাঁহার চক্ষু থেকে অগ্নিশিখা বাহির হইতে লাগিল। সমস্ত উপস্থিত লোকই হতভম্ব হইয়া রহিল এবং সন্ন্যাসীর কি উচ্চ আদর্শ ও অদ্ভুত শক্তি তাহাই সকলে সেদিন নূতন ভাবে দেখিতে লাগিল। সন্ন্যাসী ভিক্ষুক নয়,—জগৎ গুরু এই ভাবটি তিনি যেন সেদিন সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। অবশেষে স্বামিজী একটু হাসিতে হাসিতে অল্‌কটকে বলিলেন, "অনেকক্ষণ বকিয়েছ, দাও গোটা কতক চুরুট্ দাও টানি" এই বলিয়া গোটা পাঁচ ছয় চুরুট্ লইয়া হাসিতে হাসিতে সঙ্গের লোকগুলিকে লইয়া চলিয়া আসিলেন এবং রাস্তায় আসিয়া অনেক কৌতুক ও ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন।

স্বামিজী ও মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ

মেনন জাতিতে অব্রাহ্মণ ছিলেন সেইজন্য মাদ্রাজ দেশের ব্রাহ্মণেরা মেননের জাতিকে শূদ্র বা তদনুরূপ মনে করিয়া তাহাদের সাথে আহারাদি করিতেন না। একবার কতকগুলি মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ আসিয়া স্বামিজীর সহিত নানা বিষয় কথা কহিতে লাগিলেন। কথা প্রসঙ্গে তাহারা স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামিজী আপনি কি জাতি?" স্বামিজী গম্ভীর হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "I belong to king maker caste" অর্থাৎ যে জাত রাজা সৃষ্টি করে আমি সেই জাতের লোক। সন্ন্যাসীর আদেশে রাজা সিংহাসনে বসেন, সন্ন্যাসী উপস্থিত থাকিলে রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন

এবং সন্ন্যাসীকে অবজ্ঞা করিলে রাজা সিংহাসনচ্যুত হন এই ভাবের কথা বলিলেন। স্বামিজীর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন পুনরায় আর কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিলেন না।

স্বামিজীর প্রতি ব্রাহ্মণদিগের বিদ্বেষ।

স্বামিজী আমেরিকায় যাইবেন মাদ্রাজে এই খবর প্রচারিত হইলে ব্রাহ্মণদিগের ভিতর অনেকেই বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইলেন এবং নানা প্রকার আপত্তি তুলিতে লাগিলেন। একবার স্বামিজী কয়েকজন অন্তরঙ্গ লইয়া মাদ্রাজের বন্দরের উপর বসিয়া বৈকালবেলা বায়ু সেবন করিতেছিলেন সেই সময় কতকগুলি মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ আসিয়া স্বামিজীকে অনেক কটূক্তি করিয়াছিল।

স্বামিজী আলাসিঙ্গা নামটি সংক্ষিপ্ত করিয়া কখন কখন আচিঙ্গা বলিতেন এবং আলাসিঙ্গার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল তাহাকে আহ্লাদ করিয়া আচিঙ্গার ভাই চিচিঙ্গা বলিয়া ডাকিতেন। সেই ব্যক্তি চিচিঙ্গা নামে সকলের নিকট পরিচিত ছিল। এই সময় আলাসিঙ্গা, কিড়ি, রঞ্জন রাও, আর, এ, কৃষ্ণচারিয়া প্রভৃতি অনেকেই স্বামিজীর অন্তরঙ্গের ভিতর হইয়াছিল। বেলগিরি আয়েঙ্গারও স্বামিজীকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। মাদ্রাজের অনেক শিক্ষিত যুবক স্বামিজীর একান্ত ভক্ত হইয়া উঠিল। এই সময় হইতেই তাঁহার যেন একটা মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন হইল এবং সাহস ও জগত-বিজয়ী শক্তি যেন সহসা তাঁহার ভিতর উদ্ভূত হইল।

স্বামিজী মহীশূরে গমন করেন। মহীশূরের মহারাজা স্বামিজীকে বিশেষ সম্মান ও আদর করিয়াছিলেন। মহারাজার অভ্যাগত এইজন্য সমস্ত বিষয় স্বতন্ত্রভাবে বন্দোবস্ত করা হইল। স্বামিজী কোন্ বস্তু পছন্দ করিবেন বা লইবেন তাহার কিছু নিশ্চয়তা না থাকায় মহারাজা আপনার এক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিকে সঙ্গে দিয়া এক বড় গাড়ীতে স্বামিজীকে বসাইয়া বাজারে পাঠাইয়া দিলেন। যে কোন দোকানেই হউক বা যে রকমের মূল্যবান দ্রব্যই হউক না কেন স্বামিজী পছন্দ করিয়া লইলেই সঙ্গের কর্ম্মচারিটি তৎক্ষণাৎ দাম বুঝাইয়া দিবেন এইরূপ রাজাজ্ঞা ছিল। কর্ম্মচারিটি বুঝিয়াছিল যে এইরূপ ক্রয়কার্য্যে তাহার বিশেষ কিছু অর্থলাভ হইবে, কারণ বোকা সন্ন্যাসী তো কোন জিনিষের দাম জানে না আর মহারাজও জিনিষের কত দাম তাহাও জিজ্ঞাসা করিবেন না। স্বামিজীকে সঙ্গে লইয়া গাড়ী করিয়া কর্ম্মচারিটী বাজারে জিনিষ কিনিতে বাহির হইল। গাড়ীখানি বড় বড় দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং সঙ্গিটি স্বামিজীকে লইয়া দোকানের ভাল ভাল জিনিষ দেখাইতে লাগিল। স্বামিজী দ্রব্যগুলি দেখিয়া বেশ পরিতুষ্ট হইয়া ফেরৎ দিলেন এবং পুনরায় গাড়ীতে আসিয়া বসিলেন। এইরূপে অনেক দোকানের জিনিষ স্বামিজীর দেখা হইল। কিন্তু স্বামিজী কোন ...ই কিনিলেন না এবং সঙ্গিটিরও কিছু প্রাপ্য হইল না। অবশেষে একটী দোকানের সাম্নে আসিয়া সঙ্গিটি বিনীত-

স্বামিজীর মহীশূরে গমন।

ভাবে স্বামিজীকে বলিল, "স্বামিজী আপনার কোন জিনিষ লওয়া উচিত কারণ তা না হ'লে আমি মহারাজকে কি বলিব ?" তাহার কথা শুনিয়া স্বামিজী একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ঠিক্ তো, চল এইবার গিয়া কিছু কিনিব" এই বলিয়া একটা বড় চুরুটের দোকানে ঢুকিলেন। দোকানে ঢুকিয়া দোকানদারকে চুরুট দেখাইতে বলিলেন এবং চার পয়সা দামের একটা চুরুট লইয়া ধরাইয়া টানিতে টানিতে হাসিতে লাগিলেন এবং সঙ্গিটিকে বলিলেন, "এ লোকটীর দাম দিয়া দাও।" তাহার পর তিনি গাড়ীতে আসিয়া বসিয়া আবাসস্থানের দিকে গাড়ী চালাইতে বলিলেন। তখন সঙ্গিটিকে স্বামিজী বলিলেন, "দ্যাখ তোমাদের মহীশূরের সমস্ত বাজারটা আমি দেখে নিয়েছি, আমার নূতন দেখ্‌বার আর কিছু আবশ্যক নাই।" লোকটীর কিছু প্রাপ্য হইল না সেইজন্য বিষণ্নমনে ফিরিয়া আসিল। স্বামিজী শুধু দেখিয়া লইলেন যে মহীশূরের শিল্প কার্য্য কেমন হয়। স্বামিজী একভাবে সমস্ত দোকানগুলি দেখিলেন আর সঙ্গিটী আর একভাবে দোকানগুলি দেখিল। এই উপাখ্যানটী কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছিলাম।

স্বামিজী ও জনৈক রাজকর্ম্মচারি।

মহীশূর থেকে ফিরিয়া আসিয়া স্বামিজী আমেরিকা যাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। শ্রীযুত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য রাজা বা জমীদারদিগকে অর্থের জন্য তার করিতে লাগিলেন এবং স্বামিজীর অন্তরঙ্গ যুবকেরা প্রত্যেকেই একমাস

হইতে তিন মাসের বেতন দিতে সুরু করিলেন। রামনাদের (সেতুবন্ধ রামেশ্বর) মহারাজা অনেক অর্থ দিয়াছিলেন এবং খেতড়ির মহারাজের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এইরূপে অর্থের বন্দোবস্ত হইলে স্বামিজী, সান্ন্যাল মহাশয়, শরৎ মহারাজ ও যোগেন মহারাজকে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আশীর্ব্বাদ লইবার জন্য পত্র লিখিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী আশীর্ব্বাদ করিলে স্বামিজী আমেরিকায় যাইতে স্থির হইলেন এবং এ সকল কথা তখন আর কাহার নিকট প্রকাশ করা হয় নাই। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তখন বেলুড়ে নিলাম্বর মুখুজ্জ্যের বাগানে থাকিতেন। স্বামিজীর শ্রীশ্রী-মাতাঠাকুরাণীর আশীর্ব্বাদ লওয়া।

আলাসিঙ্গাকে সঙ্গে লইয়া স্বামিজী বোম্বায়ে আসিয়া জাহাজের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এদিকে মুন্সী জগমোহন লালও বোম্বায়ে আসিয়া স্বামিজীর নিকট উপস্থিত হইলেন। বোম্বায়ে তখন কালীপদ ঘোষ, পাঠক মহাশয় ও হালদার মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। বর্ত্তমান লেখক বোম্বায়ে অবস্থানকালে পাঠক মহাশয়ের নিকট নিম্নলিখিত গল্পটি শুনিয়াছিলেন। স্বামিজীর একদিন ইচ্ছা হইল যে তিনি স্বহস্তে পলোয়া রাঁধিয়া সকলকে খাওয়াইবেন। মাংস, চাল, খোয়া-ক্ষীর ইত্যাদি সকল প্রকার উপকরণ যোগার হইল। এদিকে আখনির জল তৈয়ারী হইতে লাগিল। স্বামিজী আখনির জল থেকে সামান্য কিছু মাংস তুলিয়া লইয়া খাইলেন। পলোয়াও তৈয়ারী হইল। স্বামিজী মাংস কয়েকখানি খাইয়া অপর একটী ঘরে চলিয়া স্বামিজীর বোম্বায়ে গমন।

যাইয়া স্থির হইয়া ধ্যান করিতে বসিলেন—রান্নার কথা কিছু স্মরণ রহিল না। আহারের সময় স্বামিজীকে আহার করিবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামিজী বলিলেন, "আমার খাইতে কোন ইচ্ছা নাই তোমাদের একটা রেঁধে খাওয়ান উদ্দেশ্য ছিল সেইজন্য ১৪৲ টাকা খরচ ক'রে এক হাঁড়ি পলোয়া রেঁধেচি; খাওগে, যাও।" এই বলিয়া তিনি আবার স্থির হইয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন।

হালদার মহাশয়। হালদার মহাশয়ের বাড়ী গিরিশ বাবুর বাড়ীর নিকট ছিল এবং স্বামিজীর সহিত পূর্ব্বে বেশ ঘনিষ্ঠতাও ছিল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বোম্বায়ে কালীপদ ঘোষের বাসায় থাকিতেন। সেই সময় তাঁহার সাংসারিক অবস্থার স্বচ্ছলতা না থাকায় তিনি বোম্বায়ে আর্থিক উন্নতির জন্য গমন করেন। এক বৎসর পর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া গিরিশ বাবুর বাড়ীতে গিরিশ বাবু, অতুল বাবু ও বর্ত্তমান লেখকের সম্মুখে তিনি এই গল্পটি বলিয়াছিলেন। স্বামিজী আলাসিঙ্গাকে লইয়া বোম্বায়ে আসিলেন। সকলেই মহা আনন্দিত। স্বামিজী আমেরিকায় যাইবেন, কেউ বা তাঁহার পরিচ্ছদাদির জন্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কেউ বা সঙ্গে লইয়া যাইবার দ্রব্যাদির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কেউ বা জাহাজের বন্দোবস্ত করিতে উদ্যোগী হইলেন। সকলেই স্বামিজীর সহিত কথাবার্ত্তায় বড় পরিতুষ্ট হইলেন এবং সমস্ত জিনিষ

পত্তরের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। স্বামিজীর যাহাতে জাহাজে কোন অসুবিধা না হয় সেইজন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। চারিদিকে একটা আনন্দের সোরগোল পড়িয়া গেল। হঠাৎ একদিন স্বামিজীর কই মাছ খাইতে ইচ্ছা হইল। বাজারে কিন্তু কই মাছ পাওয়া যায় না। কালীপদ বাবু সন্ধান করিয়া রেলে করিয়া লোক পাঠাইয়া কোন স্থান হইতে গোটা কতক কই মাছ আনাইলেন। সকলেই মহা আহ্লাদিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইল, কারণ ঐ সব দেশে কই মাছ দুষ্প্রাপ্য। বর্ত্তমান লেখক হালদার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই মাছ কিরূপ করিয়া পাইলেন ?" তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "সে একটা যোগাযোগে কিরূপ হইয়াছিল।" তাহার পর হালদার মহাশয় নিজের অবস্থা অকপটভাবে বলিতে লাগিলেন, "তাঁহার অবস্থা সে সময় বড়ই কৃশ ছিল, একদিন স্বামিজীকে একাকী পাইয়া তাঁহার সমস্ত অবস্থা জানাইলেন। স্বামিজী বড়ই ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে খুব আশীর্ব্বাদ করিলেন। স্বামিজী হস্তস্থিত সরু বেত (যাহা তিনি ছড়ির ন্যায় ব্যবহার করিতেন) সেইটি হালদার মহাশয়ের হাতে দিয়া বলিলেন, "এইটি তুমি রাখিয়া দিও, ইহাতেই তোমার লক্ষ্মী হইবে।" হালদার মহাশয় গিরিশ বাবুর ঘরে বসিয়া তাঁহার হস্তস্থিত সেই বেতটিকে দুই তিনবার প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন যে, সেই সময় হইতে তাঁহার অবস্থা পরিবর্ত্তন হইল এবং

বোম্বায়ে স্বামিজীর কইমাছ খাইবার ইচ্ছা।

বেশ অর্থাগম হইতে লাগিল। স্বামিজীর প্রদত্ত এই ছড়িটিই তাঁহার লক্ষ্মী।

স্বামিজীর জাপানে যাইবার জন্য P. & O. Co.র S. S. Peninsula ষ্টীমারে first classএর টিকিট লওয়া হইল। মুন্সী জগমোহন, আলাসিঙ্গা এবং আরও কয়েকজন ব্যক্তি জাহাজে তুলিয়া দিতে সঙ্গে যাইলেন।

জাহাজে স্বামিজী ও মুনসী জগমোহন লাল।

স্বামিজীর আর গৈরিক বসন, লগ্ন পদ নাই; জুতা বা বুট পরিয়াছেন, ইজের পরিয়াছেন এবং একটি লম্বা কোটও পরিধান করিয়াছেন। স্বতন্ত্র ব্যক্তি, স্বতন্ত্র ভাব। স্বামিজী উন্মনা ও দ্বিমনা হইয়া জাহাজের ডেকেতে পাইচারি করিতেছেন এবং একবার ভারতবর্ষ ও একবার আমেরিকা তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে আসিতেছে। কখন বা তিনি ধীরে ধীরে পাইচারি করিতেছেন, কখন বা স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছেন, মাঝে মাঝে একটা চুরুট লইয়া টানিতেছেন কিন্তু কাহার সহিত কথা কহিতেছেন না। মুন্সী জগমোহন লাল স্বামিজীকে পূর্ব্বে সন্ন্যাসীর বেশে দেখিয়াছিলেন এখন কিন্তু অন্য বেশে দেখিলেন। মুন্সী জগমোহন লালের ধারণা ছিল যে তিনি নিজে রাজ তরফ হইতে অনেক ইংরাজের সহিত মিশিয়াছেন সেইজন্য ইজের, জামা, বুট পরা প্রভৃতি প্রথা তাহার বেশ ভাল রকম জানা আছে। সেইজন্য স্বামিজীকে সতর্ক করিয়া ইজের পরিবার প্রথা শিখাইয়া দিতে লাগিলেন। স্বামিজীর ইজেরের পায়ের শেষটা জুতার গোড়ালিতে ঠেকিয়াছিল। মুন্সী জগমোহন

লালের ধারণা ছিল যে ইজেরের শেষটা জুতা থেকে দু'তিন আঙ্গুল উঁচুতে থাকিবে কারণ তা না হ'লে ভিতরকার মোজা দেখিতে পাওয়া যায় না সেইজন্য স্বামিজীকে অনবরত সতর্ক করিয়া দিতে লাগিলেন, "স্বামিজী, ইজেরটা ঐ গোড়ালিতে ঠেকিল, একটু উঁচু করে পরুন ?" স্বামিজী কিন্তু আপন মনে পায়চারি করিতে লাগিলেন, কথাটা তত কানে যায় নাই। মুন্সী জগমোহন লাল বারংবার বলিবার পর কথাটা স্বামিজীর কানে যাইল এবং একটু যেন তাঁহার হুঁস্ হইল। তখন স্বামিজী মুন্সী জগমোহন লালের কথা শুনিয়া নিজের পায়ের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুন্সী জগমোহন লালের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি বাল্যাবস্থাতেই এইরূপ পোষাকে অভ্যস্ত এ বিষয় আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার তোমার কোন আবশ্যক নেই।" কথাটি এমন তীক্ষ্ণস্বরে বলিয়া ছিলেন যে মুন্সী জগমোহন লাল একটু অপ্রস্তুত ও ভীত হইয়া পশ্চাৎ দিকে হাটিয়া আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল আর একটিও কথা কহিল না। অবশেষে নির্দ্দিষ্ট সময়ে জাহাজ বন্দর ছাড়িয়া চলিয়া যাইল। এই গল্পটী আলাসিঙ্গা বলিয়াছিল।

স্বামিজীর ভারত বর্ষ পরিত্যাগ।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত।